# ডিরোজিও

রমাপ্রসাদ দে

সম্পাদিত

শশধর প্রকাশনী
৩২ পণ্ডিতিয়া টেরেস
কলকাতা ২৯

প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই ১৯৮৩

স্বত্ব ঃ শ্রীমতী জয়ন্তী দে

প্রকাশক ঃ রমা বন্দ্যোপাধ্যায়
শশধর প্রকাশনী
৩২, পণ্ডিতিয়া টেরেস, কলকাতা - ৭০০০২৯

প্রাপ্তিস্থান ঃ মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১২

দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০০৭৩

শৈব্যা পুস্তকালয়
৮/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০০৭৩

নাথ ব্রাদার্স
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০০৭৩

সুপ্রীম ডিস্ট্রিবিউটার্স
১১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ ও নামাঙ্কন ঃ মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

মুদ্রণ ঃ অমল বন্দ্যোপাধ্যায়
মৌ প্রেস
১৯এ, কেদার বসু লেন, ভবানীপুর
কলকাতা - ৭০০০২৫

প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ ইম্প্রেশন হাউস
৬৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা - ৯

# উৎসর্গ

ডিবোজিও স্মৃতি বিদ্যালয়ের
ছাত্রছাত্রীদের হাতে দিলাম।

# ঋণ স্বীকার

সূর্য দেখাতে কেউ দেশলাই জ্বালে না। ডিরোজিওকে চেনাতেও আমার ভূমিকার প্রয়োজন নেই। অগ্নিময় সে প্রতিভার মূল্যায়ন এখানে কয়েকটি উজ্জ্বল প্রবন্ধে গ্রন্থিত। আমার যেটুকু বলার তা শুধুই কৃতজ্ঞতার উচ্চারণ।

বইটির পরিকল্পনা প্রথম পেশ করেছিলাম শ্রদ্ধেয় চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। তাঁর নির্দেশনা মান্য করে লেখকসূচীতে পেলাম শ্রীপান্থকে। শ্রীপান্থ তাঁর মূল্যবান প্রবন্ধে কলকাতা হাইকোর্টের রেকর্ড থেকে সম্প্রতি-পাওয়া ডিরোজিওর উইলের ওপর প্রথম আলোকপাত করেছেন। এ গ্রন্থের দীর্ঘ প্রবন্ধ অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র মৈত্রের। তাঁর কাছে আমি নানাভাবে ঋণী। আমার নিজের লেখাও অংশত তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অনুলিখন। কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কাছে চেয়েছিলাম ডিরোজিওর কবিতা বিষয়ে একটি আলোচনা। যথাসময়ে জার্মান থেকে চিঠি এল এবং তাঁর প্রবন্ধটিও। গৌতম চট্টোপাধ্যায়কে সময় দিয়েছিলাম মাত্র তিন সপ্তাহ। নির্ধারিত সময়ে লেখা শেষ করে তিনি চিঠি পাঠালেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করে আরও একটি লাভ হল—ক্যালেইডোস্কোপ পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রথম পাতার একটি ছবিও তুলে নিলাম তাঁর সংগ্রহ থেকে। যোগেশচন্দ্র বাগলের লেখা প্রকাশের অনুমতি দিয়ে নবব্যারাকপুর থেকে চিঠি দিলেন পুত্র প্রশান্তকুমার বাগল : 'আমি আমার মাতৃদেবীর সঙ্গে আলোচনা করেছি। আপনার সম্পাদনায় যে গ্রন্থটি প্রকাশ পেতে চলেছে তাতে আপনি আমার পিতৃদেবের লিখিত গ্রন্থ থেকে ডিরোজিওর শিক্ষাসংক্রান্ত অংশটি সংকলন করতে পারেন।' চিঠির তারিখ ১৩ই জানুয়ারি ১৯৮৩। অবশ্য এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা প্রকাশন সংস্থার শ্রীশকুমার কুণ্ডু মহাশয়ের সহযোগিতাও সকৃতজ্ঞ স্মরণীয়। বিনয় ঘোষের বই থেকে নির্বাচিত অংশটি প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন শ্রীমতী ঘোষ। তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই গোটা গোটা অক্ষরে আমার আবেদনপত্রের ওপর লিখে দিলেন— অনুমোদিত। তপোবিজয় ঘোষের লেখা আনতে গিয়ে তাঁর কাছে যে উষ্ণ ব্যবহার পেয়েছিলাম, তাও মনে

রাখার মতো। সুশোভন সরকারের 'ডিরোজিও অ্যাণ্ড ইয়ং বেঙ্গল' প্রবন্ধটি অনূদিত হয়েছিল 'পরিচয়' পত্রিকার ১৩৬৬ নববর্ষ সংখ্যায়। অনূদিত প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রণের জন্য আমি 'পরিচয়'-পরিচালনগোষ্ঠীর কাছে কৃতজ্ঞ। নাকতলায় শ্রীমতী সরকারের সঙ্গেও আমি দেখা করি। শ্রীমতী সরকার এবং কন্যা শিপ্রা সরকার সানন্দে সম্মতি দেন।

শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা নিয়ে এ গ্রন্থের সূচনা। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'-এর একটি প্রাচীন সংস্করণ দেখতে দিয়ে আমাকে অনুগৃহীত করেছেন ভবানীপুর বুক ব্যুরোর প্রবোধ কুমার ঘোষ। শ্যামাপ্রসাদ কলেজ লাইব্রেরির অর্ধেন্দুশেখর রায়চৌধুরী এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির দীপক রায়ের সহযোগিতাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মনে রাখার মতো 'কলকাতা পুরশ্রী'র সম্পাদক সমরেশ চট্টোপাধ্যায়ের সপ্রাণ সহযোগিতা। ডিরোজিওর জন্মতারিখ সম্পর্কে গির্জার যে প্রমাণচিত্র এখানে উপস্থিত করেছি, সেটা তাঁর সৌজন্যেই সম্ভব হয়েছে। ন্যাশনাল লাইব্রেরির কর্মিবৃন্দ ডিরোজিও সম্পর্কে একাধিক দুর্লভ তথ্য সংগ্রহে আমাকে যেভাবে সাহায্য করেছেন, এই সুযোগে তাঁদেরও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে জানাই, আদ্যন্ত যাঁর অনুপ্রাণিত প্রচেষ্টায় এ বইটি দিনের আলোর মুখ দেখল, তিনি অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা অশেষ।

অসাবধানে কিছু ভুলত্রুটি রয়ে গেল। পরবর্তী মুদ্রণে সেগুলো শুধরে দেবার সুযোগ পাব আশা রাখি।

রমাপ্রসাদ দে

শম্পা মির্জানগর

সরকারী আবাসন

দিনাঙ্ক

২৮ জুলাই, ১৯৮৩

# সূচীপত্র



**পরিশিষ্ট ॥**

The teacher who chiefly influenced the young men was Mr. Derozio, who, though branded by the clergy as an infidel, and as a devil of the Thomas Paine school, was worshipped by his pupils as the incarnation of goodness and kindness.

—Max Muller



# হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও

## শিবনাথ শাস্ত্রী

ডিরোজিও ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা ইটালী পদ্মপুকুরের সন্নিহিত মামলালীর দরগা নামক এক ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে পোর্ত্তুগীজ বংশোৎপন্ন ফিরিঙ্গী। ইহার পিতা জে. স্কট কোম্পানির সওদাগরী আফিসে একটি বড় কর্ম্ম করিতেন। ইহার আর দুই ভ্রাতা ও দুই ভগিনী ছিলেন। ডিরোজিওর পিতা সচ্ছল অবস্থাতে ফিরিঙ্গীসমাজে সম্ভ্রমের সহিত বাস করিতেন। কিন্তু সে সময়ে ফিরিঙ্গীসমাজে বালকগণ সৎশিক্ষার অভাবে প্রায় বিকৃত হইয়া উঠিত। ডিরোজিওর জ্যেষ্ঠ সহোদর ফ্রাংক কুসংগে পড়িয়া বিপথে পদার্পন করে; এবং সকল কর্ম্মের বাহির হইয়া যায়। দ্বিতীয় ক্লাডিয়সকে পিতা শিক্ষার্থ স্কট্‌লণ্ডে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার পরের সংবাদ জানি না। প্রথমা ভগিনী সোফিয়া ১৭ বৎসর বয়সে গতাসু হন। সর্ব্বকনিষ্ঠা এমিলিয়া ডিরোজিওর প্রতি বিশেষ অনুরক্তা ও সকল বিষয়ে তাঁহার উৎসাহদায়িনী ছিলেন।

সে সময়ে ডেবিড ড্রমণ্ড নামে একজন স্কট্‌লণ্ড দেশীয় লোক কলিকাতায় ধর্ম্মতলাতে একটি স্কুল খুলিয়াছিলেন। এই ড্রমণ্ড সেই সময়ে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার রচিত কবিতা সকল সে সময়ে

অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তদ্ভিন্ন তিনি ইংরাজী সাহিত্য এবং দর্শনশাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। এরূপ শুনা যায় যে, ধর্ম্মবিষয়ে আত্মীয় স্বজনের সহিত মতভেদ উপস্থিত হওয়াতে তিনি চিরদিনের মত জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া এদেশে আসিয়াছিলেন। যে স্বাধীন চিন্তার প্রভাবে ফরাসী বিপ্লবের অভ্যুদয়, সেই স্বাধীন চিন্তা পূর্ণ মাত্রায় তাঁহার অন্তরে কার্য্য করিতেছিল। ড্রমণ্ড বিদ্যালয়ের দ্বার উদঘাটন করিলে কলিকাতাবাসী ইংরাজগণ বলিতে লাগিলেন, সেখানে পড়িলে বালকগণ নাস্তিকতাতে বর্দ্ধিত হইবে। এই ভয়ে অনেকে স্বীয় স্বীয় বালককে তাঁহার বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতেন না। ডিরোজিওর পিতামাতা সে ভয় করিলেন না। বালক ডিরোজিও সেই স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন।

ড্রমণ্ডের প্রতিভার এক প্রকার জ্যোতি ছিল যাহাতে তিনি বালকদিগের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিতেন এবং স্বীয় হৃদয়ের ভাব তাহাদের হৃদয়ে ঢালিয়া দিতে পারিতেন। তাঁহার সংস্রবে আসিয়া বালক ডিরোজিওর প্রতিভা ফুটিয়া উঠিল। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি পাঠ সাঙ্গ করিয়া বাহির হইলেন। বাহির হইয়া কিছুদিন তাঁহার পিতার অফিসে কেরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলেন। তৎপরে কিছুদিন ভাগলপুরে তাঁহার এক মাসীর ভবনে বাস করেন। তাঁহার মাসী উইলসন নামক একজন নীলকর ইংরাজকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ভাগলপুরে থাকিবার সময় বালক ডিরোজিও একাকী গঙ্গাতীরে বেড়াইতেন; এবং কবিতা রচনা করিতেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা এমনই প্রবল ছিল যে, সেই অল্প বয়সে ইংরাজী সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট সমুদয় গ্রন্থাবলী আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন।

সে সময় ডাক্তার গ্রাণ্ট ( D. Grant ) নামে একজন ইংরাজ 'ইণ্ডিয়া গেজেট' ( India Gazette ) নামে একখানি সংবাদ পত্র বাহির করিতেন। ঐ পত্রে ডিরোজিওর লিখিত কবিতা ও প্রবন্ধ সকল বাহির হইত। শুনিতে পাওয়া যায় সুবিখ্যাত জার্ম্মান দার্শনিক ইমানুয়েল ক্যাণ্টের গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে ডিরোজিও তাহার এক সমালোচনা বাহির করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া সে সময়কার পণ্ডিতগণ বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন। তাহাতে এমন প্রখর ধীশক্তি ও স্বাধীন চিন্তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল যে, সকলেই

অনুভব করিয়াছিলেন যে, লেখক একজন সামান্য ব্যক্তি নহেন। ভাগলপুরে বাস কালে ডিরোজিও যে সকল কবিতা লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে Fakir of Jhungeera নামক কবিতাই সুপ্রসিদ্ধ। ভাগলপুরের সন্নিকটে নদীগর্ভস্থিত ঝঙ্গীরা নামক এক অরণ্যময় আশ্রমে এক ফকীর বাস করিতেন। তাঁহার আশ্রমকে উদ্দেশ করিয়াই ডিরোজিও উক্ত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। এই কবিতা প্রকাশিত হইলে, তদানীন্তন শিক্ষিত ইংরাজ ও বাঙালী সমাজে ডিরোজিওর কবিত্ব-খ্যাতি প্রচার হইয়া গেল। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ডিরোজিও তাঁহার কবিতাপুস্তক মুদ্রিত করিবার জন্য কলিকাতাতে আসেন। সেই সময়ে হিন্দুকালেজে একটি শিক্ষকের পদ খালি হয়, স্কুল কমিটী সেই পদে ডিরোজিওকে নিযুক্ত করেন। ১৮২৮ সালের মার্চ্চ মাসে তিনি ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

ডিরোজিও চতুর্থ শ্রেণীর সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষক হইলেন বটে কিন্তু চুম্বকে যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে তেমনি তিনিও অপরাপর শ্রেণীর বালকদিগকে আকৃষ্ট করিলেন। তিনি স্কুলে পদার্পণ করিবামাত্র বালকগণ তাঁহার চারিদিকে ঘিরিত। তিনি তাহাদিগের সহিত কথা কহিতে ভালবাসিতেন। স্কুলের ছুটী হইয়া গেলেও অনেকক্ষণ বসিয়া তাহাদিগের পাঠে সাহায্য করিতেন, এবং নানা বিষয়ে তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতেন। তাঁহার কথোপকথনের এই রীতি ছিল যে, তিনি এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া বালকদিগকে অপর পক্ষ অবলম্বন করিতে উৎসাহিত করিতেন; এবং স্বাধীন ভাবে তর্ক বিতর্ক করিতে দিতেন। এইরূপে বালকগণের স্বাধীন চিন্তা শক্তি বিকাশ হইতে লাগিল। তিনি কেবল স্কুলের ছুটীর পর বালকদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া তৃপ্ত হইতেন না; তাহাদিগকে আপনার বাড়িতে যাইতে বলিতেন। সেখানে তাহাদিগের সহিত বয়স্য ভাবে মিশিতেন, নিজের জননী ও ভগিনী এমিলিয়ার সহিত তাহাদিগের পরিচয় করিয়া দিতেন এবং বিধিমতে আতিথ্য করিতেন। রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি কতিপয় বালক ডিরোজিওর ভবনে সর্ব্বদা যাতায়াত করিত। এক দিনের ঘটনা লাহিড়ী মহাশয়ের মুখে শোনা গিয়াছে। একবার তিনি রামগোপাল ও দক্ষিণারঞ্জনের সহিত ডিরোজিওর ভবনে গিয়াছিলেন। সেখানে

পূর্ব্বোক্ত দুই জনে তাঁহাকে চা খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন। তিনি কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান। ফিরিঙ্গী বাড়ীতে চা খাইবেন, ইহা কি হইতে পাবে? সুতরাং তিনি অস্বীকৃত হইলেন। দক্ষিণারঞ্জন অনুরোধ করিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া বলপ্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন লাহিড়ী মহাশয় চীৎকার করিবার উপক্রম করাতে সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। সকলে বুঝিতেই পারিতেছেন ডিবোজিওর ভবনে হিন্দুকালেজের অগ্রসর বালক দিগেব হিন্দুসমাজ-নিষিদ্ধ পান ভোজনের অভ্যাস হইয়াছিল। ……

ডিরোজিও হিন্দুকালেজে পদার্পণ করিযাই চুম্বকে যেমন লৌহকে টানে সেইরূপ কালেজের প্রথম চারিশ্রেণীর বালককে কিরূপ আকৃষ্ট করিয়া লইলেন তাহা অগ্রেই বলিয়াছি। এরূপ অদ্ভুত আকর্ষণ, শিক্ষক ছাত্রে এরূপ সম্বন্ধ, কেহ কখনও দেখে নাই। ডিরোজিও তিন বৎসর মাত্র* হিন্দুকালেজে ছিলেন, কিন্তু এই তিন বৎসরেব মধ্যে তাঁহাব শিষ্যদলের মনে এমন কিছু বোপণ করিয়া দিলেন যাহা তাঁহাদের অন্তরে আমরণ বিদ্যমান ছিল। তাঁহাদেব অনেকেই উত্তবকালে এক এক বিভাগে প্রসিদ্ধ হইয়া ছিলেন। কিন্তু যিনি যে বিভাগেই গিয়াছিলেন, কেহই ডিরোজিওব শিক্ষাকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে পারেন নাই। …

ডিরোজিওব কার্য্য গ্রহণেব পর এক বৎসর যাইতে না যাইতে তাঁহার শিষ্যগণ এক ঘননিবিষ্ট দলে পরিণত হইয়া পড়িলেন। এই ১৮২৮ সালের মধ্যেই শিষ্যদলের মনের উপর ডিরোজিওর কি প্রভাব জন্মিয়াছিল, তাহার বিবরণ তৎকালীন কালেজের কেরাণী হরমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে ডিরোজিওর জীবনচরিত লেখক মিঃ এডোয়ার্ডস কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়;—

"The students of the first, second and third classes had the advantage of attending a conversazione established in the school by Mr. Derozio, where readings in poetry, and literature, and moral philosophy were carried on. The meetings were held almost daily after or before school hours.

* প্রকৃতপক্ষে ডিরোজিও হিন্দুকলেজে ছিলেন পাঁচ বৎসর। —স.

Though they were without the knowledge or sanction of the authorities yet Mr. Derozio's disinterested zeal and devotion in bringing up the students in these subjects was unbounded, and characterised by a love and philanthropy which, up to this day, has not been equalled by any teacher either in or out of the service. The students in their turn loved him most tenderly; and were ever ready to be guided by his counsels and imitate him in all their daily actions in life. In fact, Mr. Derozio acquired such an ascendancy over the minds of his pupils that they would not move even in their private concerns without his counsel and advice. On the other hand, he fostered their taste in literature; taught the evil effects of idolatry and superstition, and so far formed their moral conceptions and feelings, as to place them completely above the antiquated ideas and aspirations of the age. Such was the force of his instructions, that the conduct of the students out of the College was most exemplary and gained them the applause of the outside world, not only in a literary or scientific point of view, but what was of still greater importance, they were all considered men of *truth*. Indeeed, the *College boy* was a synonym for truth, and it was a general belief and saying amongst our countrymen, which, those that remember the time, must acknowledge, that 'such a boy is incapable of falsehood because he is a college boy'.

ডিরোজিও এইরূপ উপাদান লইয়া তাঁহার ( Academic Association ) একাডেমিক এসোসিএশনের কার্য্য আরম্ভ করিলেন। প্রথমে কিছুদিন অন্য কোনও স্থানে উক্ত সভার অধিবেশন হইয়া, শেষে মানিকতলার একটি বাটীতে অধিবেশন হইত। ডিরোজিও নিজে উক্ত সভার সভাপতি ও উমাচরণ বসু নামক একজন যুবক প্রথম সম্পাদক ছিলেন। রসিককৃষ্ণ

মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি উক্ত সভায় প্রধান বক্তা, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র, প্রভৃতি অপরাপর উৎসাহী সভ্য শ্রোতারূপে উপস্থিত থাকিতেন। এই সভা, অল্পদিনের মধ্যে লোকের দৃষ্টিকে এতদূর আকর্ষণ করিয়াছিল যে, উহার অধিবেশনে এক এক দিন ডেবিড হেয়ার, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের প্রাইভেট সেক্রেটারি Col. Benson, পরবর্ত্তী সময়ের এডজুটাণ্ট জেনেরাল Col. Beatson, বিশপ কালেজের অধ্যক্ষ Dr. Mills প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিতেন এবং সভ্যগণের বক্তৃতা শুনিয়া বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করিতেন।

এই সভার অধিবেশনে সমুদয় নৈতিক ও সামাজিক বিষয় স্বাধীন ও অসংকুচিত ভাবে বিচার করা হইত। তাহার ফলস্বরূপ ডিরোজিওর শিষ্যদিগের মনে স্বাধীন চিন্তার স্পৃহা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; এবং তাঁহারা অসংকোচে দেশের প্রাচীন রীতি নীতির আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তাহার ফল কিরূপ দাঁড়াইল তাহা পূর্ব্বোক্ত হরমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"The principles and practices of Hindu religion were openly ridiculed and condemned, and angry disputes were *held on moral subjects, the sentiments of Hume had been* widely diffused and warmly patronised * * . The most glowing harangues were made at Debating Clubs which were then numerous. The Hindu religion was denounced as vile and corrupt and unworthy of the regard of rational beings. The degraded state of the Hindus formed the topic of many debates; thier ignorance and superstition were declared to be the causes of such a state, and it was then resolved that nothing but a liberal education could enfranchise the minds of the people. The degradation of the female mind was viewed with indignatian; the question at a very large meeting was carried unanimously

that Hindu women should be taught; and we are assured of the fact that the wife of one of the leaders of this movement was a most accomplished lady, who included amongst the subjects, with which she was acquainted, moral philosophy and mathematics".

হিন্দুকালেজের অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক বালকদিগের এই সকল ভাব ক্রমে অপরাপর বালকদিগের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ঘরে ঘরে বৃদ্ধাদিগেব সহিত বালকদিগের বিবাদ, কলহ ও তাহাদিগের প্রতি অভিভাবকগণের তাড়না চলিতে লাগিল। ডেবিড হেয়ারের চরিতাখ্যায়ক স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র বলেন,—"ছেলেরা উপনয়নকালে উপবীত লইতে চাহিত না; অনেকে উপবীত ত্যাগ করিতে চাহিত; অনেকে সন্ধ্যা-আহ্নিক পবিত্যাগ কবিয়াছিল; তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক ঠাকুরঘরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে তাহাবা বসিয়া সন্ধ্যা-আহ্নিকের পবিবর্ত্তে হোমবের ইলিয়ড গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশ সকল আবৃত্তি করিত।" আবার সেকালের লোকের মুখে শুনিয়াছি যে, অনেক বালক ইহা অপেক্ষাও অতিরিক্ত সীমাতে যাইত; তাহাবা বাজপথে যাইবাব সময়, মুণ্ডিত-মস্তক ফোঁটাধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখলেই তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিবার জন্য "আমরা গরু খাইগো, আমরা গরু খাইগো" বলিয়া চীৎকার করিত। কেহ কেহ স্বীয় স্বীয় ভবনে ছাদের উপর উঠিয়া প্রতিবেশিগণকে ডাকিয়া বলিত, "এই দেখ মুসলমানের জল মুখে দিতেছি" এই বলিয়া পিতা পিতৃব্য প্রভৃতির তামাক খাইবার টিকা মুখে দিত।

তখন সহরে বৃন্দাবন ঘোষাল নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিল। সে ব্রাহ্মণের কাজকর্ম্ম কিছু ছিল না, প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া কোশাকুশি হস্তে ধনীদের বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিত এবং এই সকল সংবাদ ঘরে ঘরে দিয়া আসিত। সে বলিয়া বেড়াইত যে ডিরোজিও ছেলেদিগকে বলেন, ঈশ্বর নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, পিতামাতাকে মান্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য নয়, ভাই বোনে বিবাহ হওয়াতে দোষ নাই; দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সহিত ডিরোজিওর ভগিনীর বিবাহ হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ক্রমে সহরে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। হিন্দু কালেজের কমিটী প্রথমে হেড মাস্টার ডি.

আন্সলেম সাহেবকে সতর্ক করিয়া দিলেন, যেন মাষ্টারেরা স্কুলের সময় বা অপর সময়ে বালকদিগের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে কথোপকথন না করেন। হেড মাস্টার ডিরোজিওর উপরে চটিয়া গেলেন। একদিন ডিরোজিও তাঁহার কার্য্যের বিররণ দিবার জন্য হেড মাস্টারের নিকট গেলেন, তখন মহাত্মা হেয়াঁর সেখানে দণ্ডায়মান। আন্সলেম সাহেব উক্ত কার্য্য বিবরণের মধ্যে কিঞ্চিৎ খুঁত ধরিয়া ডিরোজিওকে মারিতে গেলেন। ডিরোজিও সরিয়া দাঁড়াইলেন। তখন আন্সলেম রাগিয়া হেয়ারকে খোসামুদে বলিয়া গালি দিলেন। হেয়ার হাসিয়া বলিলেন—"কার খোসামুদে?" হেয়ারের অপরাধ এই যে, তিনি ডিরোজিওর শিক্ষাপ্রণালী অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহাকে ভালবাসিতেন। হিন্দস্কুল কমিটী আবার আদেশ করিলেন যে, শিক্ষকেরা বালকদিগের সহিত ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা করিতে পারিবেন না এবং স্কুলঘরে খাবার আনিয়া খাইতে পারিবেন না। .........

অবশেষে ১৮৩১ সালের এপ্রেল মাসে কালেজ কমিটীর হিন্দুসভ্যগণ ডিরোজিওকে তাড়াইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইলেন। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পিতামহ সুপ্রসিদ্ধ রামকমল সেন মহাশয় হিন্দু সভ্যগণের মুখ-পাত্র স্বরূপ হইয়া এক বিশেষ অনুরোধপত্র প্রেরণ করিয়া সভা ডাকিলেন। ঐ সভায় এই প্রশ্ন উঠিল—ডিরোজিওর স্বভাব চরিত্র এরূপ কি না এবং তাঁহার সংসর্গে বালকদিগের এরূপ অপকার হইতেছে কি না, যাহাতে তাঁহাকে আর শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত রাখা উচিত বোধ হয় না? ডাক্তার উইলসন ও মহামতি হেয়ার ডিরোজিওর সপক্ষে মত দিলেন, এবং হিন্দুসভ্যগণের অনেকেও এতটা বলিতে প্রস্তুত হইলেন না। অবশেষে এই প্রস্তাব ত্যাগ করিয়া আর একভাবে প্রস্তাব উপস্থিত করা হইল যে, দেশীয় সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে ডিরোজিও শিক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে কালেজের অনিষ্ট হইবে কি না? উইলসন ও হেয়ার দেশীয় সমাজের অবস্থা বিষয়ে নিজে অনভিজ্ঞ বলিয়া এ বিষয়ে সাহসের সহিত কিছু বলিতে পারিলেন না; সুতরাং কোনও পক্ষেই মত প্রকাশ করিলেন না। অধিকাংশের মতে ডিরোজিওকে পদচ্যুত করা স্থির হইল।

ডাক্তার উইলসন ডিরোজিওকে এই সংবাদ দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ

পদত্যাগ করিয়া পত্র লিখিলেন। তাঁহার প্রতি যে যে দোষারোপ করা হইয়াছিল তিনি সে সমুদয় দৃঢ়তার সহিত অস্বীকাব করিলেন। বলিলেন তিনি কখনই নাস্তিকতা প্রচার করেন নাই, তবে ঈশ্বরের সপক্ষ বিপক্ষ দুই যুক্তি তুলিয়া বালকদিগকে বিচার করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন বটে; ভ্রাতা ভগিনীর বিবাহ যুক্তিসিদ্ধ এরূপ অদ্ভুত মত তিনি কখনও প্রচার করেন নাই; এবং পিতামাতার প্রতি অবাধ্যতা শিক্ষা দেওয়া দূরে থাক, সেরূপ ব্যবহার কোনও বালকে দেখিলে তাহাকে সাজা দিয়াছেন।

ডিরোজিও কালেজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইষ্ট ইণ্ডিয়ান নামক একখানি দৈনিক সংবাদ পত্র বাহির কবিয়া তাহার সম্পাদনে নিযুক্ত হইলেন। ঐ কাগজ ত্বরায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। ডিরোজিও কলিকাতায় ফিরিংগী-দলের এক জন নেতা বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তৎপবে যে কয়েকমাস তিনি জীবিত ছিলেন, সে সময়েব মধ্যে ফিরিংগীসমাজেব উন্নতির জন্য যে কিছু অনুষ্ঠান হইত তন্মধ্যে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি থাকিতেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া কোনও কাজ হইত না। এইরূপে খাটিতে খাটিতে ১৮৩১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর শনিবার তিনি দুরারোগ্য ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইলেন। ছয় দিন তিনি রোগশয্যায় শয়ান ছিলেন। তাঁহার পীড়ার সংবাদ পাইবামাত্র, মহেশচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যদল আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং দিন রাত্রি পড়িয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার জীবন রক্ষা হইল না। ২৪শে ডিসেম্বর* প্রাণবায়ু তাঁহার দেহকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। ইহার পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কাগজ একজন অপদার্থ ইংরাজের হস্তে গেল। সে ব্যক্তি ডিরোজিওর মাতা ও ভগিনীকে ধনে প্রাণে সারা করিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহারা জন্মের মত সমাজসাগরবক্ষে চিববিস্মৃতির তলে ডুবিয়া গেলেন। ডিরোজিও অন্তর্হিত হইলে কিছুদিন তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের প্রস্তাব চলিয়াছিল এবং তদর্থ একটি কমিটীও গঠিত হইয়াছিল; কিন্তু কালাবর্ত্তে সকলি মিলাইয়া গেল! নব্যবঙ্গের একজন প্রধান শিক্ষক ও দীক্ষা-গুরুর চিহ্নমাত্রও রহিল না।

* ডিরোজিওর মৃত্যুদিন ২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৩১। —স.

# ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গল

## সুশোভন সরকার

ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের সূচনা ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষাশেষি আর এই আন্দোলনে ভাটার টান লাগে পঞ্চম দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে। এই গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮৭৭ সালে এই আন্দোলনের নাম দিয়েছিলেন 'ইয়ং ক্যালকাটা'। সুদক্ষ মনীষী প্রতিভাবান লেখক চরমপন্থী চিন্তাধারার এবং তৎকালীন নব্য শিক্ষাধারার সবচেয়ে খ্যাতিমান শিক্ষক ডিরোজিও (১৮০৯-৩১) ছিলেন এই আন্দোলনেব প্রবর্তক। ইয়ং বেঙ্গলের সংগে ডেভিড হেয়ারের (১৭৭৫-১৮৪২) নাম যুক্ত করা একটু অস্বাভাবিক হবে। নানা দিক দিয়েই ডিরোজিওর সংগে তাঁর যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। হেয়ার পেশাদার শিক্ষক অথবা বুদ্ধিজীবী ছিলেন না। উঁচুদরের জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিতও তিনি ছিলেন না। ডিরোজিওর মতো কর্মপ্রতিভা অথবা একগুঁয়েমিও তাঁর ছিল না। খানাপিনা আচার ব্যবহারে তিনি প্রায় আধা-হিন্দু হয়ে উঠেছিলেন কিন্তু ডিরোজিও তা হননি। তা সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে তাঁদের দুজনের মধ্যে যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় সেটাই ইয়ং বেঙ্গলের মূল্যায়নের মূল সূত্র।

তাঁরা দুজনেই সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতেন যে 'ইউরোপীয় শিক্ষা জনগণের মধ্যে প্রচার করাব' চেয়ে জরুরী কাজ ভাবতে আর কিছু নেই। তাঁবা দুজনেই চিন্তা ও আলোচনার স্বাধীনতায় উৎসাহ দিতেন। 'অন্ধ কুসংস্কাবেব বন্ধন থেকে দেশের মানুষকে মুক্ত' করার জন্য তাঁরা তাঁদের অনুপ্রাণিত করতেন। তখনকাব দিনে অন্যান্য নেতারা ছিলেন ধর্মবিশ্বাসী কিন্তু ডিবোজিও এবং ডেভিড হেয়ার ছিলেন অনাধ্যাত্মিক এবং ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। ধর্মশিক্ষায় তাঁদের কোনও আস্থা ছিল না কিন্তু তা সত্ত্বেও আদর্শবাদের প্রতি ছিল তাঁদের অবিচল নিষ্ঠা। এ-কথাও কেউ বিস্মৃত হতে পাবেন না যে ডিরোজিও এবং তাঁর বহু নিন্দিত ছাত্রদের অগ্নিপরীক্ষাব সময় হেয়ার তাদেব পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে সেই ছাত্রদের সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'আপনাদের দেশবাসী আপনাদের সংস্কাবক এবং শিক্ষক বলে গণ্য কবে।' ডিরোজিওপন্থীরাই সর্বপ্রথম হেয়ারকে প্রকাশ্যে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন কবেন এবং তাঁব মৃত্যুব পব তাঁব স্মৃতিকে অক্ষয় কবে রাখবার জন্য প্রতি বছব পয়লা জুন তাবিখে তাঁর স্মৃতিবার্ষিকী উদ্‌যাপন করতেন। এক নাগাড়ে পঁচিশ বছর ধরে এই স্মৃতি বার্ষিকী উদ্‌যাপন করে তাঁরা এক নূতন ইতিহাস রচনা কবেছিলেন।

॥ দুই ॥

হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ছিলেন কলকাতার পর্তুগীজ ভারতীয় কুলজাত একজন ইউরেশিয়ান। তাঁর বাবা ছিলেন এক ব্রিটিশ সওদাগবী অফিসের অফিসার। (হিন্দু কলেজের ১৮৩১ সালের নথিপত্রে তাঁর নাম লেখা আছে এই বানানে—De Rozio; ম্যাক্সমুলার তাঁর নাম লিখেছিলেন—D. Rozario)। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংরেজী শিক্ষাদানের জন্যে যে সমস্ত প্রাইভেট স্কুল স্থাপিত হয়েছিল, এমনি এক স্কুলে তিনি শিক্ষালাভ করেন। স্কটল্যাণ্ডের ড্রামণ্ড ধর্মতলা এলাকায় এই স্কুলটি পরিচালনা করতেন। ড্রামণ্ড ছিলেন সুপণ্ডিত ও কবি। স্বাধীন চিন্তার দুঃসাহসী সমর্থক বলে নিজের দেশ থেকে তিনি নির্বাসিত হয়েছিলেন। সহজেই অনুমান করা যায় যে ডিরোজিওর সাহিত্য এবং দর্শন প্রীতি, ফরাসী বিপ্লবের প্রতি আস্থা এবং ইংরাজ চরমপন্থার প্রতি

শ্রদ্ধা—এসবের পেছনে ছিল ড্রামণ্ডের প্রেরণা। ডিরোজিও যে বার্নসের কবিতার একজন অন্ধ ভক্ত ছিলেন, তারও মূলে আছেন ডামণ্ড।

স্কুলের পাঠক্রম শেষ করে ডিরোজিও কিছুকাল তাঁর বাবার অফিসে কেরানীগিরি করেন। পরে তরুণ ডিরোজিও ভাগলপুরে পিসিমা, মিসেস উইলসনের বাড়িতে গিয়ে কিছুকাল বাস করেন। সেখানে লেখক হিসেবে তাঁর প্রতিভার বিকাশ হয়। তিনি ইণ্ডিয়া গেজেটে লেখা পাঠাতে এবং কবিতা রচনা করতে শুরু করেন। (ফকির অব ঝাহিরা কবিতাটাও এখানে বসে লেখা। স্থানীয় একটি উপকথায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ঐ কবিতা রচনা করেন।) কাশীপ্রসাদ ঘোষের অনেক আগেই তিনি দেশাত্মবোধক কবিতা রচনা করেছিলেন। ঘটনাটা তাঁর সম্প্রদায়ের লেখকের পক্ষে খুবই অস্বাভাবিক। তিনি লিখেছিলেন:

My country! in thy days of glory past
A beautious halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast.
Where is that glory, where that reverence now?

ডিরোজিও কাণ্টের উপর যৌবনেই যে সন্দর্ভ রচনা করেছিলেন তা 'যে কোনো প্রতিভাবান দার্শনিকের পক্ষেও লজ্জার বিষয় হত না' বলে বিবেচিত হয়েছিল। নীতি-দর্শন সম্পর্কে তিনি একটি ফরাসী প্রবন্ধ অনুবাদ করেছিলেন। সেটি তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। বিশ বছর বয়সে পদার্পণের আগেই তিনি এত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন যে ১৮২৮ সালের গোড়ার দিকে হিন্দু কলেজের উঁচু ক্লাসগুলোয় পড়াবার জন্য তিনি শিক্ষক নিযুক্ত হন। (কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেন ১৮২৭ সালে। কেউ কেউ বলেন ১৮২৬ সালে।) কলকাতায় ফিরে ডিরোজিও নাকি 'হেসপিরাস' এবং 'ক্যালকাটা লিটারারী গেজেটে'র সম্পাদনা করেন, 'রাজনীতিতে অতি চরমপন্থী' ইণ্ডিয়া গেজেটে সহকারী সম্পাদকের কাজ করেন, এবং ক্যালকাটা ম্যাগাজিন, ইণ্ডিয়ান ম্যাগাজিন, বেঙ্গল এ্যানুয়াল ও কেলিডোস্কোপ পত্রিকায় নিয়মিত লিখতে থাকেন। তাঁর একটি কবিতায় নেভারিনোর সংগ্রামে গ্রীসের মুক্তিলাভকে স্বাগত জানান হয়। আর একটি

কবিতায় সতীদাহ নিবারণী আইনকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়।

কলেজের ইতিহাসে ডিরোজিওর ব্যক্তিত্ব 'এক নতুন যুগের সূচনা করে।' এই তরুণ শিক্ষক 'চুম্বকের মতো' বয়স্ক ছাত্রদের নিজের চারপাশে টেনে আনতে লাগলেন; তাঁর জীবনীকার লিখেছেন, 'এর আগে এবং পরে অপর কোনও শিক্ষক ভারতের কোনও দেশী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের চার দেওয়ালের মধ্যে ছাত্রদের উপর এতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি।' শুধু ক্লাসের মধ্যেই নয়, বাইরেও মুক্তি এবং মাদকতার নতুন উৎস পশ্চিমী ভাবধারা এবং সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি তাঁর ছাত্রদের 'জ্ঞান সম্প্রসারণের' চেষ্টা করতেন এবং তাতে তিনি সফলও হয়েছিলেন। কলেজের ছাত্ররা সব সময় তাঁকে ঘিরে থাকত। তাদের মনে তিনি যে ছাপ এঁকে দিয়েছিলেন, অনেকের মনেই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেই ছাপ অমলিন ছিল। এই যোগসূত্রই ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করে রেখেছিল। শিক্ষকের স্মৃতি তাদের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যকে পরবর্তী-কালেও অটুট করে তুলেছিল। ডিরোজিও তাঁর ভক্ত তরুণদল সম্বন্ধে কি ভাবতেন তা তাঁর একটি কবিতার নিচের কটা লাইনেই প্রকাশ পাচ্ছে ঃ

Expanding like the petals of young flowers
I watch the gentle opening of your minds
And the sweet loosening of the spell that binds
Your intellectual energies and powers,

* *

What joyance rains upon me, when I see
Fame in the mirror of futurity,
Weaving the chaplets you have yet to gain,
And then I feel I have not lived in vain.

এখনও ডিরোজিওর কলেজে এই লাইনগুলো সানন্দে আবৃত্তি করা হয়।

ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের স্বাধীন বিতর্কে প্রবৃত্ত হতে উৎসাহ দিতেন। প্রাধিকারের ন্যায়-অন্যায় নিয়ে প্রশ্ন তোলার জন্য তিনি ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি বলতেন, 'নিজেরা চিন্তা কর। বেকনের উল্লেখিত

কোন দেবতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ো না। সত্যকেই জীবন এবং মৃত্যুর অবলম্বন ধরে নাও।' তাঁর ছাত্র রাধানাথ সিকদার গুরু সম্বন্ধে বলেছেন, 'তিনি সত্যানুসন্ধান চেতনার একমাত্র স্রষ্টা। পাপ ও অন্যায়ের প্রতি ছিল তাঁর প্রচণ্ড ঘৃণা। তাতে ভারতের মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল হতে পারে না।' রামগোপাল ঘোষ এই নীতিবাক্য গ্রহণ করেছিলেন ঃ 'যে তর্ক করে না, সে অন্ধ গোঁড়ামীতে ভুগছে। যে তর্ক করতে পারে না, সে নির্বোধ এবং যে তর্ক করে না, সে ক্রীতদাস।'

ডিরোজিওর প্রিয় ছাত্ররা তাঁর এণ্টালীর বাসায় অবাধে যাতায়াত করতেন। সেখানে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নিষিদ্ধ খাদ্য এবং পানীয় গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। বয়সের গুণে এ ব্যাপারে তাঁরা যে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলেন তা দেখে কেউ যেন মনে করবেন না যে গতানুগতিক বিধি বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে তাদের আন্তরিকতা অথবা সাহসের অভাব ছিল। আর একথাও সত্য যে ইয়ং বেঙ্গলের কোনও কোনও সদস্য অকরুণ বিদ্রুপের দ্বারা পাড়াপড়শীর সংবেদনশীল মনে নির্মম আঘাত হেনেছেন। উত্তরকালের বিদ্রোহী ব্রাহ্মণ যুবকেরা এ ব্যাপারে অনেক সংযম অবলম্বন করেছিলেন। ইয়ং বেঙ্গলের লোকেরা হিন্দু সমাজের অকথ্য কুৎসা গাইতেন কেন তা বোঝা যায় কিন্তু তাঁদের কুৎসায় সব সময় যুক্তি থাকত না। মাধবচন্দ্র মল্লিক এক কলেজ ম্যাগাজিনে লিখেছিলেন—'অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমরা হিন্দু ধর্মকে ঘৃণা করি''। এটা অপরিণত অশ্রদ্ধার বেপরোয়া উচ্ছ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু প্রকাশ্য আদালতে গঙ্গার জল ছুঁয়ে শপথ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এ ব্যাপারে রসিককৃষ্ণ মল্লিক যথেষ্ট চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমি গঙ্গার পবিত্রতায় বিশ্বাস করি না।" ডিরোজিওপন্থীদের এক বড় অংশের মধ্যে যে সুরাসক্তি ছিল, সেটা তাদের দুর্বলতার পরিচায়ক। তবে হরমোহন চট্টোপাধ্যায়ের তৎকালীন ভক্তিও বিস্মৃত হওয়া যায় না। তিনি বলেছিলেন, 'ওরা সকলেই সত্যের উপাসক বিবেচিত হয়। সত্যিই কলেজ-বর যেন সত্যেরই প্রতিশব্দ।'

ডিরোজিও এবং ছাত্ররা ১৮২৮ সালে আমাদের প্রথম বিতর্ক ক্লাব

একাডেমিক এ্যাসোশিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে স্বাধীন চিন্তা, ভবিতব্য, পাপপুণ্য, দেশাত্মবোধ, ঈশ্বরের অস্তিতত্ব, গোঁড়ামী এবং পুরোহিততন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে তর্কবিতর্ক হত। দীর্ঘ সাপ্তাহিক সভায় পৌরোহিত্য করতেন ডিরোজিও। তাঁর পরামর্শ এবং উপদেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হত। তরুণ সদস্যদের বিতর্ক-প্রতিভা শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এই উত্তেজনাপূর্ণ বিতর্কসভায় টেনে আনত। হিন্দু কলেজের ছেলেরা 'পার্থেনন' ম্যাগাজিন (শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে এথেনিয়াম) প্রকাশ করেন ১৮৩০ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে। তাতে স্ত্রীশিক্ষা, শস্তায় বিচারব্যবস্থা, কুসংস্কারের অভিশাপ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা স্থান পায়। পত্রিকার দুটি সংখ্যা বেরুবার পর কলেজ ভিজিটর ডাঃ এইচ-এইচ উইলসনের আদেশে 'জন্মে হিন্দু, শিক্ষায় ইউরোপীয়'দের এই মুখপত্রটি বন্ধ হয়ে যায়। ডেভিড হেয়ারের সহযোগিতায় ডিরোজিও অধিবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁর স্কুলে কয়েকটি বক্তৃতা করেন। 'প্রায় চারশো যুবক' সেই বক্তৃতা শুনতে যেতেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বেকন, লক, হিউম, স্মিথ, পেইন এবং বেন্থামের নূতন ভাবধারায় গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

এই আবহাওয়ার মধ্যে চরমপন্থী ভাবধারার উত্তাল তরঙ্গ উঠতে শুরু করে। ১৮৩০ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী হিন্দু কলেজের জনৈক ছাত্র অতীত এবং বর্তমান ইতিহাসের নজির তুলে তৎকালীন ঔপনিবেশিক পরিকল্পনার বিরুদ্ধে এক প্রবন্ধ লেখেন। ১৮৩০ সালের ১০ই ডিসেম্বর টাউন হলে জুলাই-বিপ্লব উদ্‌যাপনের জন্য দুইশত লোক এক জনসভায় সমবেত হন। সেই বছরের খ্রীষ্টমাস দিবসে 'অজ্ঞাতনামা' কয়েকজন লোক মনুমেণ্টে ফরাসী-বিপ্লবের তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উত্তোলন করেন।

এই সব ব্যাপারে প্রাচীনপন্থী সমাজ গভীর উদ্বেগ বোধ করছিলেন। গুজব রটেছিল যে হিন্দু কলেজের কয়েকজন ছাত্র প্রার্থনার সময় মন্ত্রোচ্চারণের বদলে ইলিয়াডের লাইন আবৃত্তি করেন। একটি ছাত্র কালী ঠাকুরকে মাথা নিচু করে প্রণাম করার বদলে 'গুড্ মর্নিং, ম্যাডাম' বলে কালীকে নমস্কার জানান। বৃন্দাবন ঘোষাল নামে জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ সমাজের

নেতাদের কাছে গিয়ে ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রদের সম্বন্ধে বেশ রঙ চড়িয়ে নানা রকমের গালগল্প এবং কুৎসা প্রচার করতেন। সংবাদ প্রভাকর এবং সমাচারচন্দ্রিকা প্রচণ্ড চিৎকার তুললেন যে "বেকার-ফিরিঙ্গিদের" অনুকরণপ্রিয় "ঈশ্বরে অবিশ্বাসী পশুরা" ধর্মকে বিপন্ন করে তুলেছে। ১৮৩১ সালে সংবাদ-প্রভাকরে প্রকাশিত এক পত্রে "অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় ভাষায় হিন্দু কলেজের শিক্ষকদের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করা হয়।" কলেজ কমিটি সেই পত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে বাধ্য হন। বেশ বোঝা যায় যে উস্কানিটি শুধু ডিরোজিওর দিক থেকেই আসেনি। অপর পক্ষও বেশ সক্রিয় ছিলেন।

সংবাদপত্রে আন্দোলন দানা বাঁধবার আগেই হিন্দু কলেজেব ম্যানেজিং কমিটি চঞ্চল হয়ে উঠছিলেন। ১৮৩১ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী কমিটি ডিরোজিওর সংগে হেডমাষ্টার ডি' এ্যানসেলমের (D' Anselme) এক ঝগড়া মিটিয়ে দেন। ডিরোজিও প্রগ্রেস রিপোর্ট নিয়ে হেডমাস্টারের কাছে গেলে তিনি তাঁকে "মাববার জন্য হাত তোলেন।" ডেভিড হেয়াব তাঁর হাত চেপে ধরেন। তখন হেডমাস্টাব ডেভিড হেয়ারকে 'ঘৃণ্য মোসাহেব' বলে গাল দেন। এই ব্যাপারে শিক্ষক মহলে যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয় তাতে হেডমাস্টার হতবুদ্ধি হয়ে যান বলেই মনে হয়। যথারীতি পরস্পরের কাছে দুঃখ প্রকাশের মধ্য দিয়ে এই ঘটনাব যবনিকা পড়ে। তবে "জাতীয় ধর্মেব মহান নীতি সম্বন্ধে ছাত্রদের মনে সন্দেহ সৃষ্টিকারী সকল প্রকার আলোচনা যতদূর সম্ভব ঠেকিয়ে রাখবার জন্য কমিটি অবিলম্বেই প্রস্তাব গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন" (প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখা থেকে জানা যায়)। "যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ হিন্দু ন্যায়-অন্যায় বোধের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়," তাঁরা সেই সমস্ত ক্রিয়াকলাপের নিন্দা করেন। "যে সমস্ত সভাসমিতির ধর্ম এবং রাজনীতি বিষয়ক আলোচনার ব্যবস্থা ছিল, সেখানে ছাত্রদের যোগদান" নিষিদ্ধ করা হয়। এমন কি কমিটির সদস্য রামকমল সেন ডিরোজিওকে অপসারণ করবার জন্য কমিটির এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বানেও উদ্যোগী হয়েছিলেন।

কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ( ১৮৫৫ সালে হিন্দু কলেজের ঐ নামকরণ হয় ) ১৮৩১ সালের ২৩শে এপ্রিল তারিখে অনুষ্ঠিত হিন্দু কলেজের ডিরেক্টর বোর্ডের সেই বিশেষ অধিবেশনের কার্যবিবরণী সংবলিত একখানি হাতে লেখা দলিল এখনও রক্ষা করা হচ্ছে। সেই অধিবেশনে আলোচনার জন্য উত্থাপিত এক স্মারকলিপিতে বলা হয়েছিল, "যেহেতু ডিরোজিও যত নষ্টের গোড়া এবং জনগণের পক্ষে ভীতিস্বরূপ, সেইহেতু তাঁকে কলেজ থেকে বরখাস্ত করা হোক। যে সমস্ত ছাত্র প্রকাশ্যে হিন্দুধর্ম এবং দেশের প্রচলিত রীতিনীতির বিরোধিতা করে তাদেরও তাড়িয়ে দেওয়া হোক। যদি কোনও ছাত্র সভা-সমিতিতে বক্তৃতা শুনতে যায়, তাহলে তাকেও তাড়িয়ে দেওয়া হবে। ক্লাসে পাঠ্যপুস্তক পড়াতে হবে এবং কোন ক্লাসের মেয়াদ কতক্ষণ, তাও নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।" আরও বলা হয়েছিল যে ডিরোজিওর অসদাচরণের ফলে ছাত্ররা কলেজ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তবে কলেজ কমিটির ১৮৩১ সালের ৭ই মে এবং ১১ই জুন তারিখের কার্যবিবরণী থেকে আমরা জানতে পারি যে ডিরোজিওর পদচ্যুতির পরও কলেজের ছাত্র সংখ্যা হ্রাস পাওয়া বন্ধ হয়নি।

ডিরোজিও যে "তরুণদেব শিক্ষাদানের ভার গ্রহণের অনুপযুক্ত"—সে কথা স্বীকার করতে কমিটি ৬-৩ ভোটে অস্বীকার করেন। তবে "হিন্দু সম্প্রদায়েব মনে তাঁর সমবন্ধে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ায়" তাঁরা তাঁকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়বার ভোট গ্রহণের সময় উইলসন এবং হেয়ার ভোটদানে বিরত থাকেন, কারণ হিন্দু সমাজের পক্ষে কিছু বলবার অধিকার তাঁদের ছিল না। রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চন্দ্রকুমার ঠাকুর রায় দেন যে ডিরোজিওকে বরখাস্ত করার "প্রয়োজন" আছে। রসময় দত্ত ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মত ছিল, বরখস্ত করা "যুক্তিযুক্ত"। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ সিংহ বলেছিলেন যে বরখাস্তের কোনও "প্রয়োজন নেই।"

উইলসনের প্রস্তাব অনুযায়ী ২৫শে এপ্রিল ডিরোজিও পদত্যাগপত্র পেশ করেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, "আমাকে জিজ্ঞাসা না করে

আমার বক্তব্য না শুনে এমনকি একটা বিচারের প্রহসনও না করে আপনারা আমাকে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।''

তাঁর সম্বন্ধে লোকপরম্পরায় যে সমস্ত অভিযোগ উঠেছিল, সে সম্বন্ধে উইলসনের এক প্রশ্নের জবাবে ২৬শে এপ্রিল ডিরোজিও একটি পত্র লেখেন। তিনি ছাত্রদের ভগবৎ বিশ্বাসকে হেয় করার চেষ্টা করেছিলেন কি-না সেই প্রশ্নের উত্তরে যা লিখেছিলেন, তা বাঙলার রেনেসাঁসের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে ঃ

যদি ঐ বিষয়ের উপর কথা বলা অন্যায় হয় তাহলে আমি অপরাধী। কারণ একথা ঘোষণা করতে আমার কোনও ভয় অথবা লজ্জা নেই যে, এ ব্যাপারে অমি দার্শনিকদের সন্দেহের কথা প্রকাশ করেছি এবং সেই সন্দেহ নিরসনের পন্থাও আমি ব্যক্ত করেছি। এমন একটি প্রশ্নের উপর তর্কবিতর্ক করা কি কোথাও নিষিদ্ধ? যদি তাই হয় তাহলে বিবদমান কোনও পক্ষে যুক্তি তোলাই অন্যায়। এত বড় একটা বিষয়ের উপর একটি মাত্র ধারণাকে আঁকড়ে ধরে তার বিরোধী সমস্ত ধ্যানধারণার দিকে চোখকান বুঁজে থাকা কি জ্ঞানদীপ্ত সত্যের ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

...বিশেষ অবস্থার মধ্যে আমি কিছুকালের জন্য তরুণদের শিক্ষাদানের ভার পেয়েছিলাম। তাদের কি আমি প্রগলভ এবং নির্বোধ অন্ধবিশ্বাসী তৈরী করতে পারি?...সেইজন্য আমি কলেজের কয়েকজন ছাত্রকে হিউমের লেখা ক্লিনথেস এবং কিলোর বিখ্যাত কথোপকথনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। তাতে আস্তিকতার বিরুদ্ধে অতি সূক্ষ্ম এবং চতুরতাপূর্ণ যুক্তিতর্ক আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ রীড এবং ডুগাল্ড স্টুয়ার্ট হিউমের যুক্তিতর্কের যেসব জবাব দিয়েছেন, সেগুলোও আমি ছাত্রদের পড়তে দিয়েছি। সে জবাব আজও কেউ খণ্ডন করতে পারেনি। আমার অপরাধ কি তা এবার বুঝে দেখুন।...আমি যে নাস্তিক এবং অবিশ্বাসী বিশেষণ লাভ করব তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ধর্মের ব্যাপার নিয়ে যারা স্বাধীন চিন্তা করে, তারা চিরকালই ঐ বিশেষণে ভূষিত হয়।...

ডিরোজিও কলেজ ছাড়তে বাধ্য হন। কিন্তু ছাত্রদের উপর তিনি

যে প্রভাব রেখে এসেছিলেন, সেটা অটুট থাকে। কয়েকজন বন্ধুর উচ্ছৃংখলতায় ১৮৩১ সালের আগষ্ট মাসে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহ থেকে বিতাড়িত হন। তিনি ইনক্যুইরার নামে একখানি পত্রিকা বার করেন। তাতে নির্যাতিত ( Persecuted ) নামক একটি লেখায় তিনি প্রাচীনপন্থীদের গোঁড়ামীর মুখোশ খুলে দেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিকের আত্মীয়স্বজন একবার তাকে ওষুধের সাহায্যে ঘুম পাড়িয়ে হাত পা বেঁধে নিরাপদ স্থানে নিয়ে তোলেন। কিন্তু তিনি বাবার কাছ থেকে পালিয়ে এসে জ্ঞানান্বেষণ নামে আর একটি পত্রিকা বার করেন। কলেজ কমিটির ১৮৩১ সালের ১১ই জুনের কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে রসিককৃষ্ণ মল্লিক পত্রিকা প্রকাশের এবং চাঁদা সংগ্রহের অনুমতি চেয়ে কমিটির কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন। কমিটি সেই প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

ডিরোজিও চুপচাপ বসে থাকেন নি। ইস্ট ইণ্ডিয়ান নাম দিয়ে তিনিও একটি দৈনিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আদর্শবাদ এবং আপোসহীনতার পথ থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিচ্যুত হননি। তাঁর এই গুণ দেখে সত্যিই অভিভূত হয়ে যেতে হয়। নতুন পত্রিকা বার করে তাঁর কাজ হল অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্যান্য ভারতীয়দের সৌহাদ্য স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা প্রচার করা। প্রসন্নকুমার ঠাকুর নিজেকে নাস্তিক রামমোহনের অনুগামী বলে প্রচার করতেন। তাঁকে দুর্গাপূজা করতে দেখে ডিরোজিও তাঁর পত্রিকায় কঠোর সমালোচনা করেন।

১৮৩১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর ডিরোজিও কলেরায় আক্রান্ত হন। প্রিয় শিষ্যরা তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হয়ে এক সপ্তাহ যাবৎ কলেরার সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করেন। ক্রিস্টমাস ইভে আমাদের রেনেসাঁসের এই ঝোড়ো পাখির জীবনাবসান হয়।

॥ তিন ॥

সংসারের চাপে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে ডিরোজিও-গোষ্ঠীর সদস্যরা ক্রমে ক্রমে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ইয়ং

বেঙ্গল অনুরূপ নামধারী বিভিন্ন ইউরোপীয় আন্দোলনের সঙ্গে তুলনীয় নয় কারণ ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন তেমনভাবে দানা বাঁধতে পারেনি। তবে ডিরোজিওর মর্মান্তিক অকাল মৃত্যুর পরও ১০।১২ বছর যাবত তাঁর অসাধারণ প্রভাব সর্বত্র পরিলক্ষিত হতে থাকে।

বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে যখনতখন চরমপন্থী মতবাদ প্রকাশ হয়ে পড়ত। ১৮৩২ সালে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা টম পেইনের "এজ অফ রিজন" বইয়ের জন্য আট টাকা দাম দিতে রাজী ছিলেন এবং এক প্রকাশক পাঁচ টাকা দরে ঐ বই ১০০ কপি বিক্রি করেন। ১৮৩৬ সালে ইংলিশম্যান লিখেছিলেন যে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা "সকলেই চরমপন্থী এবং বেন্হাম নীতির অনুগামী। 'টোরি' শব্দটা তাদের কাছে অপমানজনক।...... তারা সকলেই অ্যাডাম স্মিথের মতবাদে বিশ্বাসী।" "১৮৪৩ সালে" গুরুতর ব্যবসাবাণিজ্যের কাজে লিপ্ত জনৈক "প্রাচীন হিন্দু" ভারতীয় অভাব-অভিযোগের উপর কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে বিপ্লবের জন্য আফসোস প্রকাশ করেন।

ডিরোজিওপন্থীরা আরও সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক চিন্তায় মগ্ন হতে থাকেন। ১৮৩১ সালে রসিককৃষ্ণ মল্লিক পুলিশী দুর্নীতির সমালোচনা করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কৃষকদের অসহায় অবস্থার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সওদাগরী কোম্পানীগুলির হাতে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল, তিনি তার অবসান দাবি করেন। ১৮৩৪-৩৫ সালে কোম্পানীর সনদ সংশোধন এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর মর্মগ্রাহী বক্তৃতা করেন। ১৮৪২ সালে তারাচাঁদ চক্রবর্তী দাবি করেন যে ওরলিনিস্ট ফ্রান্সের মতো এদেশেও কারিগরী শিক্ষার সরকারী ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ক্রীতদাস-প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে খ্যাত জর্জ টমসন ১৮৪২ সালে ভারতে আসেন। রামগোপাল ঘোষ তাঁর সঙ্গে ফৌজদারী বালাখানায় গিয়ে বজ্র নির্ঘোষে বক্তৃতা করেন। জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে তিনি নাম পেলেন, "ভারতীয় ডিমস্থেনেস।" আগে ইউরোপীয়রা ভারতের সাধারণ আইনের আওতায় পড়তেন না। ১৮৪৯ সালে এই ব্যবস্থা রহিতের জন্য একটি বিল আসে। ইউরোপীয়রা তার নাম দেয় "কালা বিল"। রামগোপাল এই তথাকথিত কালা বিলের সমর্থন করেন।

১৮৪৩ সালে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁর "বিচার ও পুলিশ" নামক বিখ্যাত প্রবন্ধে প্রচলিত ব্যবস্থাকে "অবৈধ জুলুমবাজী এবং দুর্নীতিপরায়ণ" বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন যে "প্রভুত্বকামী পুরোহিততন্ত্র" আমাদের মৌলিক সাম্য উচ্ছেদ করেছে। ১৮৪৬ সালে প্যারীচাঁদ মিত্র রায়তকে রক্ষা করার দাবী জানিয়ে বলেছিলেন, "ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে গভর্নমেণ্টের জন্ম হয়। গভর্নমেণ্ট থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্ম হয় না" (ডিরোজিও প্রবর্তিত লকের ভাবধারার প্রতিধ্বনি)। তিনি আরও বলেছিলেন "গরীব এবং অসহায়দের যেমন সব সময় চোখে চোখে রাখতে হয়, ধনী এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের তেমনভাবে রাখবার প্রয়োজন হয় না।"

হিন্দু কলেজের ছেলেবা নিজেদের বক্তব্য প্রচাবেব জন্য কয়েকটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করতেন। ডিরোজিওর মৃত্যুব বছব হিন্দু অজ্ঞানতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইনক্যুইরার পত্রিকা প্রকাশ করেন। রসিকমোহন মল্লিকের জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকা বাঙলা এবং ইংরাজী দুই ভাষায় প্রকাশিত হত। ১৮৪৪ সাল পর্যন্ত বেঁচে ছিল এই পত্রিকা। এর মূল লক্ষ ছিল "গভর্নমেণ্ট এবং ব্যবহারতত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষাদান করা।" ১৮৩৮ সালে হিন্দু পাইওনিয়ারে "ভারত ও বিদেশী" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। জনগণকে গভর্নমেণ্টে অংশ নিতে দেওয়া হয় না বলে তাতে অভিযোগ করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল, গভর্নমেণ্ট "যে বিপুল কর ধার্য করেছেন" তা অযৌক্তিক। তারাচাদ চক্রবর্তী "ক্যুইল" নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাতে সরকারী নীতির অবাধ সমালোচনা করা হত। ১৮৪২ সালে "বেঙ্গল স্পেক্টেটর" পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। তাতে প্রতিযোগিতামূলক সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার দাবি করে নিয়মিত প্রবন্ধ লেখা হতে থাকে। সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার কুলিদের দিয়ে সরকারী অফিসাররা নিজেদের ঘরোয়া কাজ করিয়ে নিতেন। রাধানাথ শিকদার তার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন তার বিবরণ ১৮৪৩ সালে এই পত্রিকায় ছাপা হয়। নীতিগত ভাবে এই পত্রিকা বিধবা বিবাহের সমর্থক ছিল।

সমাজে তখনও ডিরোজিও ভাবের জোয়ার চলছে। পথিকৃৎ সংস্থা

একাডেমিক অ্যাসোশিয়েশন ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিল। ডিরোজিওর পর ডেভিড হেয়ার ঐ সংস্থার প্রেসিডেণ্ট হন। সভার শেষে তিনি অনেক সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে সদস্যদের সঙ্গে আলাপআলোচনা করতেন। ইতিমধ্যে এপিস্টোলাবী এ্যাসোশিয়েশন নামে একটি অনুপূরক সংস্থা গড়ে ওঠে। সেখানে ডিরোজিওপন্থীরা খাঁটি বেনেসাঁস মানবতাবাদের ধরণে নিজেদের মতামত বিনিময় করতেন। রামগোপাল ঘোষ এবং রাধানাথ শিকদার তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং চিন্তাপ্রবাহ রোজনামচার আকারে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। এই বন্ধুমহলে সদর দপ্তর হয়ে উঠেছিল রামগোপাল ঘোষের বাড়ি। ১৮৩৮ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী ডিবোজিওপন্থীদের নেতৃত্বে সোসাইটি ফর দি একুইজিশন অফ জেনারেল নলেজ (জ্ঞানান্বেষণ সমিতি) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সভাপতি হন তারাচাঁদ চক্রবর্তী, সহকারী সভাপতি রামগোপাল ঘোষ, সেক্রেটারীদ্বয়—প্যারীচাঁদ মিত্র ও রামতনু লাহিড়ী। ১৮৩৮ সালের ১২ই মার্চ এই সোসাইটির কাজ আরম্ভ হয়। ডেভিড হেয়ারকে তাঁরা তাঁদের অনারারী পরিদর্শক নির্বাচিত করেন। ১৮৪০ ও ১৮৪৩ সালের মধ্যে এই সোসাইটি-পঠিত প্রবন্ধগুলো তিনখানি গ্রন্থে প্রকাশ করা হয়। তার মধ্যে এই প্রবন্ধগুলো আছে: "সিভিল অ্যাণ্ড সোশ্যাল রিফর্ম" এবং "নেচার অফ হিস্টোরিকাল স্টাডিজ" (কৃষ্ণমোহন); "ইন্টারেস্ট অফ দি ফিমেল সেক্স" এবং পাঁচখণ্ডে "স্টেট অফ হিন্দুস্থান" (প্যারীচাঁদ); "স্কেচ অফ বাঁকুড়া" (হরচন্দ্র ঘোষ); "নোটিশ অফ টিপারা"; "নিউ স্পেলিংবুক" এবং চারখণ্ডে 'নোটিসেস অফ চিটাগঙ' (গোবিন্দচন্দ্র বসাক)। ১৮৩৯ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী হিন্দু কলেজ হলে যখন এই সোসাইটির সভা হচ্ছিল, তখন প্রিন্সিপাল রাজদ্রোহিতার অভিযোগ এনে সেই সভা ভেঙে দেবার চেষ্টা করেন। তখন প্রেসিডেণ্ট তারাচাঁদ চক্রবর্তী তাকে ভর্ৎসনা করে নীরব থাকতে বলেন। সে কাহিনী আজও বিখ্যাত হয়ে আছে। ১৮৩৯ সালের গোড়ার দিকে স্বল্পায়ু মেকানিকাল ইনস্টিটিউট গঠিত হয়। ১৮৪৪ সালে কিশোরীচাঁদ মিত্র হিন্দু থিওফিলানথ্রফিক সোসাইটি গঠন করেন (সম্ভবত এটি ভলানির প্রতিধ্বনি)।

ডিরোজিওপন্থীদের সমিতিগুলি ছিল সাংস্কৃতিক সংগঠন, কিন্তু সেগুলি ক্রমেই রাজনীতির দিকে ঘেঁষতে শুরু করে। জর্জ টমসন বাঙালীদের উপদেশ দিয়েছিলেন, তারা যেন 'সুবিধাবাদ' ত্যাগ করে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলে। সংবাদপত্রের চেয়ে সেটা বেশি ফলপ্রসূ হবে। তাঁর বক্তৃতা ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। ঐ সময় ইয়ং বেংগলের প্রবীনতম সদস্য তারাচাঁদের নাম অনুসারে সকলে ইয়ং বেঙ্গলের নাম দিয়েছিল চক্রবর্ত্তীর দল। ১৮৪৩ সালের ২০শে এপ্রিল বেংগল 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' গঠিত হয়। 'ল্যাণ্ড হোল্ডার্স অ্যাসোশিয়েশন' নাম দিয়ে যে "ধনসম্পদের আভিজাত্য" প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার সঙ্গে সোসাইটির "বিদ্যাবত্তার আভিজাত্যে"র প্রভেদ লক্ষনীয়। ১৮৫১ সালের ৩১শে অক্টোবর 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশন' গঠিত হলে সোসাইটি তার অন্ত-র্ভুক্ত হয়ে যায়। রাজনৈতিক চিন্তাধারার শিক্ষিত ভারতীয়গণ সেই প্রথম একটি সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠন করেন। ইয়ং বেংগলের পৃথক সত্তা তখন প্রায় বিলুপ্ত হতে বসেছে।

শিবনাথ শাস্ত্রী বর্ণিত এক বিস্ময়কর ঘটনা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বহু বছর বাদে শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর বোমবাইয়ের বন্ধুদের কাছ থেকে জানতে পারেন যে কাথিয়াওয়াড়ে এক ডিরোজিওপন্থী সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি সব সময়ই তাঁর মহান শিক্ষকের গুণগান করতেন। একবার তিনি "কাথিয়াওয়াড়ে কুশাসন" শিরোনামায় সংবাদপত্রে কয়েকটি চিঠি লিখে দেশীয় রাজ্যে কুশাসনের কথা জনগণের কাছে প্রচার করেছিলেন। তিনি এক বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে এমন আন্দোলন শুরু হয়ে যায় যে উক্ত রাজ্যের নৃপতি তাঁকে মুক্তি দিয়ে শাসনকার্য পরিচালনায় নিযুক্ত করতে বাধ্য হন। এমন কি নিজের সহকারী বেছে নেওয়ার ক্ষমতাও তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। শাসনসংস্কার কিছুদূর অগ্রসর হবার পর প্রতিক্রিয়াশীলরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং সন্ন্যাসীকে তাঁর কার্যক্ষেত্র থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই অজ্ঞাত ডিরোজিওপন্থী এখনও আমাদের কাছে অজ্ঞাতই আছেন।

॥ চার ॥

ডেভিড হেয়ার ভারতে এসেছিলেন ১৮০০ সালে এবং ১৮১৬ সালে ঘড়ির ব্যবসা থেকে অবসর গ্রহণ করে জীবনের বাকী ২৫ বছর তাঁর নূতন মাতৃভূমির জনগণের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য নিজের সমস্ত সময়, শক্তি এবং সম্পদ নিয়োগ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ১৮১৭ সালের হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এবং স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭) ও স্কুল সোসাইটির (১৮১৮) সংগঠক। হিন্দু কলেজের শৈশবে সমস্ত বাধাবিঘ্ন থেকে কলেজটিকে তিনি রক্ষা করেছেন এবং নিজের স্কুলের সবচেয়ে ভাল ছেলেদের এই কলেজে পাঠিয়েছেন। প্রতিদিন তিনি কলেজের কার্যাবলী পরিদর্শন করে যেতেন। জীবনের শেষ দিকে তিনি আমাদের প্রথম মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের (১৮৩৫) ঐতিহাসিক কাজে সাহায্য করেছিলেন। তখনকার দিনে লাশকাটার কাজ সম্বন্ধে সাধারণের মনে যথেষ্ট কুসংস্কার ছিল, কিন্তু ডেভিড হেয়ার তাঁর ব্যাপক পরিচিতির মাধ্যমে ভারতীয় সমাজের এই কুসংস্কার দূর করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

চতুর্থ দশকে ইয়ং বেঙ্গলের মিত্র হিসাবে হেয়ার টাউন হলের সভায় বক্তৃতা করতেন। প্রেস আইনের বিরুদ্ধে তিনি ১৮৩৫ সালের ৫ই জানুয়ারী বক্তৃতা করেন। জুরী-প্রথার সম্প্রসারণের অনুকূলে বক্তৃতা করেন ১৮৩৫ সালের ৮ই জুলাই, মরিসাসে কুলি চালানের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন ১৮৩৮ সালের ৮ই জুলাই। পটলডাংগার এক বাড়ি থেকে তিনি প্রায় শতাধিক কুলিকে উদ্ধার করেছিলেন। মরিসাসে চালান দেবার জন্য তাঁদের ঐ বাড়ীতে এনে রাখা হয়েছিল।

ডিরোজিওপন্থীরা ১৮৩০-৩১ সালে মাধবচন্দ্র মল্লিকের বাড়ীতে প্রকাশ্যে হেয়ারকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সেখানে তাঁকে শুকতারা নামে অভিহিত করা হয় এবং তাঁর চলমান পাল্কিটিকে বলা হয় গরীবের দাওয়াখানা। সত্যিই তিনি সে-যুগের মানুষের মঙ্গলাকারী পথিকৃৎ এবং সুহৃদ ছিলেন।

ডিরোজিওর মৃত্যুর দশ বছর বাদে ডেভিড হেয়ার ১৮৪১ সালের ১লা জুন ডিরোজিওর মতো কলেরা রোগেই মারা যান। ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া তাঁকে খ্রীষ্টীয় সুসমাচারের আজন্ম শত্রু বলে বর্ণনা করেছিলেন। তাই তাঁব মৃতদেহ কলেজ স্কোয়ারে অবস্থিত তাঁবই কেনা জমিতে সমাধিস্থ করা হয়। সেই বৃষ্টিবাদলেব দিনে পাঁচ হাজার লোক শোকযাত্রা কবে হেয়াবের মৃতদেহ তাঁর বাসভবন (বর্তমানে হেয়ার স্ট্রীট) থেকে কলেজ স্কোযারে নিয়ে আসেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রাঙ্গণে তাঁর যে মর্মর মূর্তি আছে সেটি ডিরোজিওপন্থীদের উদ্যোগেই স্থাপিত হয়। শহবেব বুকের উপর মাথা তুলে দাঁড়ানো বিদেশীর এই মর্মব মূর্তি অপসাবণেব কথা কোনও অন্ধ জাতীয়তাবাদী স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।

॥ পাঁচ ॥

ইয়ং বেঙ্গলের অন্যান্য প্রতিনিধিদেব জীবনকাহিনী লিখতে গেলে অনেক জায়গা লেগে যাবে। এখানে লাইফ অফ ডেভিড হেয়ার বই থেকে ইয়ং বেঙ্গলের ভিতর মহলের কয়েকজনের নাম ও আয়ুষ্কাল দেওয়া হচ্ছে: রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০ ৫৮), দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১২ ৮৭), কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩ ৮৫) এবং রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-৬৮) এই চারজনকে তাঁদের কলেজে আগুণের ফুলকি বলে অভিহিত করা হত। এঁদের পরের সারিতে ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩), হরচন্দ্র ঘোষ (১৮০৮-৬৮), শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-৯০), রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-৯৮) এবং রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-৯০)। তার পরের সারিতে ছিলেন মাধবচন্দ্র মল্লিক, মহেশচন্দ্র ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র বসাক এবং অমৃতলাল মিত্র। এঁদের সঙ্গে প্রবীণ তারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮০৪-৫৫) এবং তরুণ কিশোরীচাঁদ মিত্রের নামও যোগ করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালার এই নামগুলি সুপ্রসিদ্ধ। এছাড়া আরও অনেকে নিশ্চয়ই মাত্র তেইশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণকারী শিক্ষকের যাদুকরী প্রভাবে পড়েছিলেন।

দেশে ধর্মোন্মত্ততার ফলে ডিরোজিওপন্থীরা তাঁদের প্রথম জীবনে

নিন্দিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত গুণাবলী সমাজে স্বীকৃত হলেও ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনকে হেয় করা প্রায় ঐতিহ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ১৮৭৫ সালে রাজনারায়ণ বসু মন্তব্য করেছিলেন, "পশ্চিমের আশায় তাদের মাথা ঘুরে গিয়েছিল।" এই মন্তব্যই সে যুগে সাধারণ বিচারের রায়। এই রায় যে বিকৃত সেকথা দৃঢ়কণ্ঠেই বলা চলে। তবে ঐতিহাসিক মূল্যায়নে এও একটা দৃষ্টিভঙ্গি।

নিষিদ্ধ খাদ্য এবং পানীয়ের প্রতি ডিরোজিওপন্থীদের অতিরিক্ত আসক্তি, "শূকর এবং গোমাংসের পথে তাঁদের অগ্রগতি এবং বিয়ারের বোতলের পথ ভেঙে তাদের উদারনীতিতে পৌঁছবার" ব্যাপারগুলোকে তৎকালীন লোকেরা অত্যন্ত খারাপ চোখে দেখেছিলেন। কিন্তু এ সবের মূলে ছিল প্রচলিত রীতিনীতি সম্পর্কে ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা। দেশের অগ্রগতির কোন সঙ্কট-মুহূর্তে এমন জিনিস ঘটা অস্বাভাবিক নয়।

সাহেবীয়ানার প্রতি ডিরোজিওপন্থীদের ভয়ানক মোহ ছিল বলে যে অভিযোগ ওঠে তাতেও যথেষ্ট মাত্রাধিক্য আছে। পরবর্তীকালে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের কাছে দেশ ও দেশবাসীকে হেয় করা এক ফ্যাশানে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ডিরোজিওপন্থীরা আকস্মিকভাবে পশ্চিমী ভাবধারার অপ্রত্যাশিত সম্পদের সম্মুখীন হয়ে কিছুটা দিশেহারা হলেও দেশ এবং দেশবাসীকে কখনও বিস্মৃত হননি। ডিরোজিওর সময় এবং তৎ-পরবর্তীকাল থেকে ইয়ং বেঙ্গলের মনে দেশাত্মবোধের আলোড়ন উঠতে থাকে। ১৮৩৭ সাল থেকে কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্টান মিশনারীত্ব গ্রহণ করলেও হিন্দু দর্শন শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেছিলেন। তারাচাঁদ মনুর তর্জমা করেন। জ্ঞানান্বেষণ আংশিকভাবে বাঙলা ভাষায় ছাপা হত। রামগোপাল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বাংলা গদ্যকে স্বাগত জানান। প্যারীচাঁদ আর রাধানাথ দুই বন্ধুতে মিলে সরল চলতি ভাষায় একখানি মাসিকপত্রিকা প্রকাশ করেন। অল্পশিক্ষিত গৃহস্থ বধূদের কাছেও সেই ভাষা অবোধগম্য ছিল না। বাংলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদের (টেকচাঁদ ঠাকুর) দান কিরকম গুরুত্বপূর্ণ তা সকলেই অবগত আছেন।

ডিরোজিওপন্থীরা অধার্মিক ছিলেন—এ অভিযোগও ঠিক নয়। তাঁদের লক্ষ্য ছিল "হিন্দু ধর্মকে তাঁদের যুক্তিবিচারের আদালতে হাজির করা।" ১৮৩২ সালে মহেশচন্দ্র এবং কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্টান হয়ে যান। পরবর্তীকালে শিবচন্দ্র হন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রেসিডেন্ট। রামতনুও ব্রাহ্ম সমাজের কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন। ব্রাহ্ম ধর্মের গোড়ার দিকে ডিরোজিওপন্থীরা তাঁর যে সমালোচনা করতেন তা অযৌক্তিক নয়। কৃষ্ণমোহন মন্তব্য করেছিলেন, ব্রাহ্ম ধর্ম "রাজনীতি আর ধর্মের মাঝপথে এসে পেঁাছেছে।" রামগোপাল অভিযোগ করেছিলেন, এর ধর্মান্তরকরণ-বিরোধী অভিযানে ভণ্ডামী আছে। রামগোপাল ঘোষ অন্তর্ভেদী মন্তব্য করে বলেছিলেন, "বেদান্তের অনুগামীরা সুযোগসন্ধানী সুবিধাবাদী... মূর্তিপূজার অবসান একান্তভাবে বাঞ্ছনীয় কিন্তু সেটা ভ্রান্ত পদ্ধতিতে করা আমার কাম্য নয়।...ব্রাহ্মসমাজ খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে শত্রুতার ভাব পোষণ করেন। সেটা মোটেই সৎ কাজ নয়। ...প্রত্যেক ধর্মের সেবকরা তাঁদের সহগামীদের যুক্তির কাছে নিজেদের আবেদন নিয়ে যাক।" ডিরোজিওপন্থীদের মধ্যে অনেকেই যেরকম ব্যক্তিগত চরিত্রে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন, তাও ভোলবার নয়। হরচন্দ্র এবং রসিককৃষ্ণের গভীর সাধুতা, শিবচন্দ্রের সেবাপরায়ণতা, ১৮৫১ সালে সন্ন্যাসীতুল্য রামতনুর গৌরবময় পৈতা ত্যাগের কথা কে ভুলতে পারে। সমাজে একঘরে হবার হুমকি পেয়েও রামগোপাল নিজের মতবাদ ত্যাগ করেননি, এবং পরিবারের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও রাধানাথ নাবালিকা বিবাহ করতে অস্বীকার করেন। এ ঘটনাগুলিও ভুলবার নয়।

ইয়ং বেঙ্গলের সীমাবদ্ধতার মধ্যে অনেকগুলোই আমাদের সমগ্র রেনেসাঁসেরই সীমাবদ্ধতা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সম্প্রদায় বুঝতে পারেন নি যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মূল উদ্দেশ্য ছিল শোষণ। তাঁরা এই শাসনের আশু লাভালাভের দিকেই প্রধানতঃ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছিলেন: আমাদের নবজাগরণের হোতাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ পৃথক জগতের অধিবাসী শ্রমজীবী জনসাধারণের কোনও যোগাযোগ ছিল না। হিন্দু ঐতিহ্য ও জীবনের দ্বারা তাঁরা এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন যে তার ফলে মুসলমান সম্প্রদায় তাদের থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল।

রেনেসাঁসের এই ঐতিহ্য দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রগতির পথে যথেষ্ট বাধা সৃষ্টি করেছে।

ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের প্রকৃত ব্যর্থতার কারণ এই যে তাঁরা কোনও ক্রমবর্ধমান আন্দোলন এবং কোনও সুনির্দিষ্ট আদর্শবাদ গড়ে তুলতে পারেননি। সম্ভবতঃ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় সেটা অবশ্যম্ভাবী ছিল। এই আন্দোলনের সবচেয়ে স্মরণীয় দান হচ্ছে নির্ভীক জাতীয়তাবাদ এবং নবাগত পশ্চিমী ভাবধারার পুনরুজ্জীবনে অকপট স্বাগত সম্ভাষণ। শতাব্দীর শেষাশেষি এর অনেক কিছুই ঐতিহ্যবাদ, আধ্যাত্মিক রহস্যবাদ, ধর্মান্ধতাবাদ ইত্যাদির স্রোতে ভেসে গিয়েছিল। সেই পরিবর্তন আমাদের জাতীয় জীবনে কোনও মঙ্গল এনেছে কিনা এ সন্দেহ পোষণ করা অন্যায় হবে না।

১৮৬১ সালে কিশোরীমোহন মিত্র বলেছিলেন: "যে তরুণ সংস্কারকামী গোষ্ঠী হিন্দু কলেজে বিদ্যার্জন করেছিলেন, কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ার মতো তাঁরাই প্রথম প্রত্যূষের স্পর্শ লাভ করেন। ...প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করলে বিপদ আপদের সম্মুখীন না হয়ে উপায় নেই। আমাদের বন্ধুরা সমাজচ্যুত হয়ে তার সমস্ত পরিণাম ভুগতে বাধ্য হয়েছিলেন।...মূর্তিপূজার রীতিনীতি মেনে নেওয়ার অর্থ নিজের নীতি বিসর্জন দেওয়া। অন্যদিকে বিবেকের কাছে আমাদের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে মূর্তিপূজার রীতিনীতি মেনে না নেওয়া।"

# ডিরোজিও / সামাজিক পরিবেশ

## বিনয় ঘোষ

ডিরোজিও যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন আঠার শতকের কলকাতার নাগরিক সমাজের মন্দগতি রূপান্তর সবেমাত্র শুরু হয়েছে। ক্লাইভ-হলওয়েল-ভ্যান্সিটার্ট-হেস্টিংস-কর্নওয়ালিসের যুগ অস্তাচলে গেছে, এবং তার সঙ্গে কালা জমিদার গোবিন্দরাম মিত্র, মুন্সী মহারাজা নবকৃষ্ণ, গোকুল ঘোষাল, অক্রূর দত্ত, রামদুলাল দে সরকার, মদন দত্ত, বারাণসী ঘোষ, হৃদয়রাম ব্যানার্জি প্রভৃতি বেনিয়ান মুচ্ছুদ্দি ব্যবসায়ীদের প্রতাপ-প্রতিপত্তির স্বর্ণযুগও কিছুটা নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। মনে হয় সমগ্র আঠার শতকটা যেন কলকাতার মতো উদীয়মান মহানগরের আকাশে বিলীয়মান সামন্তযুগের বর্ণচ্ছটা ছড়িয়ে দিয়েছিল। তারই গোধূলিতে সমাজের রঙ্গমঞ্চে দৌরাত্ম্য করেছিলেন, ব্রিটিশের কলের পুতুল সেজে, সেকালের বাঙ্গালী মুন্সী-মহারাজ, দালাল-গোমস্তা, ইজারাদার-বেনিয়ানের দল। উনিশ শতকের গোড়া থেকে তাঁদের গতিবিধি মন্থর হয়ে এল, অনেকে মঞ্চ থেকে প্রস্থানও করলেন। বংশানুক্রমে তাঁদের পুত্র-পৌত্ররা এলেন, সঞ্চিত পৈতৃক বিত্তের অপচয় করে এক বিচিত্র শহুরে বাবুসমাজ গড়ে তুললেন তাঁরা।

ডিরোজিও যখন মৌলালি অঞ্চলে জন্মালেন, তখন প্রধানত উত্তর-কলকাতার দু-এক পুরুষের ধনিক পরিবারের বংশলোচনরা বাবুরূপ বীজ থেকে কচি কচি চারাগাছে অংকুরিত হযে উঠছেন। ডিরোজিও তাঁর যৌবনকালের মধ্যে এইসব চারাগাছকে বাবুবৃক্ষে পরিণত হতে দেখেছেন।

১৮০৯ থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত ডিরোজিওর স্কুলপূর্ব বাল্যকাল, এবং ১৮১৫ থেকে ১৮২৩ সাল পর্যন্ত তাঁর শিক্ষাকাল। ১৮২৬ সালে সতের বছর বয়সে তিনি হিন্দুকলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন, মধ্যে দু এক বছর অন্য কাজ করেন। ১৮২৬ থেকে ১৮৩১ সালে মৃত্যু পর্যন্ত কয়েক বছরের সামাজিক অবস্থা হিন্দুকলেজে তাঁর কর্মজীবনের প্রসংগ। তাঁর ব্যক্তিচরিত্রের গঠন কাল হিসেবে প্রথম ষোল বছরের সামাজিক পরিবেশই প্রথম আলোচ্য। বাল্যকাল ও কৈশোরের পরিবেশ যে কোন মানুষের চরিত্র রূপায়ণে প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে বেশি, ডিরোজিওর জীবনেও করেছিল। যৌবনে যখন সেই পরিবেশের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হয়, তখন ব্যক্তি ও সমাজের সংঘাতের ভিতর দিয়ে সচেতেন ব্যক্তি চেষ্টা করে সমাজের রূপ বদলাতে। ডিরোজিও নবযৌবনকালে তাই করেছিলেন। তখন তিনিও ছিলেন স্রষ্টা ও নির্মাতা, সমাজই কেবল সর্বশক্তিমান ছিল না। কিন্তু জীবনের প্রথম পনের-ষোল বছর মানুষের জীবনের নিয়ন্তা থাকে পরিবার ও সমাজ। পরিবার যেহেতু সমাজের প্রতিচ্ছবি, তাই নিয়ন্তা কেবল সমাজকে বললেও অত্যুক্তি হয় না। কী সেই সমাজ যা বালক ও কিশোর ডিরোজিওর চরিত্রকে বিদ্রোহের বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে গড়ে তুলেছিল?

কলকাতা শহরের অর্ধগ্রাম্য রাস্তায় তখন হাতী চলে-ফিরে বেড়াচ্ছিল, কারণ সমাজে তখনও হাতীর প্রভুরা ছিলেন। মধ্যযুগের স্থূলতা মন্থরতা ও অচলতার প্রতাপ তখনও অখণ্ড না থাকলেও, একেবারে লোপ পেয়ে যায়নি। ধীরে হলেও তার প্রতিপত্তি খর্বিত হচ্ছিল নিশ্চয়। ডিরোজিও জন্মেছিলেন, গোড়াতেই বলেছি, বাবু সমাজের অংকুরোদ্‌গমকালে। বাবুরা ছিলেন গতায়ু সমাজের ভুক্তাবশেষ, নবকলেবরে সুসজ্জিত হয়ে সমাজ প্রাংগণে কিছুকালের জন্য তাঁদের সশব্দ সমাগম হয়েছিল ইতিহাসের গতিপথের প্রতিবন্ধকরূপে। ফিরিংগিসমাজে জন্মেও এবং ড্রামণ্ডের স্কুলে

শিক্ষা পেয়েও, ডিরোজিও তদানীন্তন বাবুবৃক্ষের সুপরিপক্ব ফল হয়ে পথের ধুলোয় ঝরে পড়তে পারতেন। কিন্তু জীর্ণপত্রের মতো ঝরে না পড়ে তিনি প্রচণ্ড ঝড় তুলেছিলেন সমাজে। কারণ ঝড়ের প্রত্যাশা সমাজমানসে তখন সঞ্চারিত হয়েছিল।

সামন্তযুগের সবচেয়ে কুৎসিত প্রথা গোলামির প্রাদুর্ভাব তখন পর্যন্ত কলকাতা শহরে যা ছিল তা বিস্ময়কর। সুপ্রিমকোর্টের একটি মামলার রায় প্রসঙ্গে কলকাতায় দাসগোলামের বাণিজ্য সম্বন্ধে ১৭৮৫ সালে উইলিয়ম জোন্স বলেন: এখানকার গোলামদের দুরবস্থার কথা যা আমি জানি তা এত মর্মান্তিক যে বলতে সংকোচ হয়। প্রতিদিন গোলামদের উপর যে-সব নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাহিনী আমার কানে পৌঁছয় তা শোনাও মহাপাপ বলে আমি মনে করি। এই জনবহুল কলকাতা শহরে শুনেছি এমন পুরুষ বা স্ত্রীলোক খুব কমই আছেন যাঁর ঘরে অন্তত একটি ছেলে বা মেয়ে ক্রীতদাস নেই। খোঁজ করলে দেখা যাবে হয়ত নিদারুণ অন্নাভাবের জন্য গোলামটি এই অভিশপ্ত জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছে। এদেশে দারিদ্র্যই দাসত্বের অন্যতম কারণ। সম্প্রতি কলকাতা শহর গোলাম কেনাবেচার একটা বড় আড়ৎ হয়ে উঠেছে। অনেকেই জানেন গঙ্গার উপর দিয়ে নৌকা-বোঝাই গোলাম দূর গ্রামাঞ্চল থেকে কলকাতার বাজারে নিয়ে আসা হয় বিক্রি করার জন্য। এইসব গোলাম ছেলে-মেয়েদের অধিকাংশকেই তাদের বাপ-মায়ের কাছ থেকে চুরি করে আনা হয়। আবার দুর্ভিক্ষ অন্নকষ্টের সময় অনেক বাপ-মাও ছেলে-মেয়েদের পণ্যের মতো গোলাম হিসেবে অন্যের কাছে বিক্রি করে দেন।'

উইলিয়ম জোন্স এই মন্তব্য করেছিলেন আঠার শতকের শেষে। বাংলার বাইরে গোলাম রপ্তানি বন্ধ করার জন্য ১৭৯৩ সালে কোম্পানির ডিরেক্টররা একটি আদেশ জারী করেন। তা সত্ত্বেও উনিশ শতকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত এদেশে গোলাম কেনাবেচা নির্বিবাদে চলতে থাকে। বিধিনিষেধের বহু ছিদ্রপথে মধ্যযুগের এই অভিশপ্ত প্রথা দীর্ঘকাল আত্মগোপন করে থাকার সুযোগ পায়। উনিশ শতকের দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ দশক পর্যন্ত 'ক্যালকাটা গেজেট', 'সমাচার দর্পণ' প্রভৃতি পত্রিকার

কলকাতা শহরের গোলামদের সম্বন্ধে নানারকমের খবর প্রকাশিত হয়। শহরের নতুন মনিবদের অত্যাচারের কাহিনী, অত্যাচারের ভয়ে ভৃত্য ও গোলামদের পলায়নের সংবাদ, পণ্যদ্রব্যের মতো গোলাম বেচাকেনার বিজ্ঞপ্তি, অসহায় ও দরিদ্র ব্যক্তির সামান্য মূল্যে পুত্রকন্যা বিক্রয়, অথবা ধর্মীয় অনুশাসনের দায়ে পুত্রকন্যাকে নৈবেদ্যের মতো উপঢৌকন, এ সব প্রায় নিত্যসংবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ডিরোজিও তাঁর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই গোলামিপ্রথার বিষাক্ত পরিবেশের মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন। ১৮২৭ সালে আঠার বছর বয়সে ক্রীতদাসদের বন্দীজীবনের গভীর মর্মবেদনা তিনি কাব্যে প্রকাশ করেছিলেন এবং তাদের মুক্তির করুণ কাকুতি তাঁর কবিতার অক্ষরে-অক্ষরে ঝংকৃত হয়ে উঠেছিল। কবি ক্যাম্পবেলের অবিস্মরণীয় উক্তি 'And as the Slave departs, the Man returns' উদ্‌ধৃত করে তিনি লেখেন :

How felt he when he first was told
A slave he ceased to be ;
How proudly beat his heart, when first
He knew that he was free !
The noblest feelings of the soul
To glow at once began ,
He knelt no more ; his thoughts were raised :
He felt himself a man.
He looked above—the breath of Heaven
Around him freshly blew ,
He smiled exultingly to see
The wild birds as they flew.
He looked upon the running stream
That 'neath him rolled away ;
Then thought on winds, and birds, and floods,
And cried, "I'm free as they"!
On Freedom ! there is something dear

E'en in thy very name,
That lights the altar of the soul
With everlasting flame.
Success attend the patriot sword,
That is unsheathed for thee !
And glory to the breast that bleeds,
Bleeds nobly to be free !
Blest be the generous hand that breaks
The chain a tyrant gave,
And, feeling for degraded man,
Gives freedom to the slave.

কবিতার ভাব-অনুভাবগুলির মধ্যে ডিরোজিওর হৃদয়ের প্রত্যেকটি তন্ত্রীর অনুরণন শোনা যায়। কবি ডিরোজিও বলেছেন, গোলাম যখন জানতে পারল যে সে তার দাসত্বের নির্বাসনদণ্ড থেকে মুক্ত, তখন তার অন্তরাত্মা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। যখন সে স্বাধীন জীবনের স্বাদ পেল, তখন মুক্ত মানুষের উন্নত চিন্তাভাবনাগুলিও তার মনের অনন্ত আকাশে যেন তারার মতো ঝিকমিক করতে লাগল। কারও কাছে আর সে নতজানু হবে না মাথা হেঁট করবে না, মাথা উঁচু করে উচ্চচিন্তা করবে নির্ভীক বীরের মতো। এই কথা ভাবতে ভাবতে একবার সে আকাশের দিকে মুখ তুলে চেয়ে দেখল, মুক্ত হাওয়া হাত বুলিয়ে গেল তার মাথায়। আনন্দে আত্মহারা হয়ে মুক্ত বিহঙ্গের ডানা-ঝাপটানি সে দেখতে লাগল। বহমান নদীর দিকে চেয়ে রইল একদৃষ্টিতে। ভাবতে লাগল—এই আকাশ, এই বাতাস, এই পাখি, এই নদী, এদের মতো আমিও স্বাধীন, আমিও মুক্ত। মুক্তি ও স্বাধীনতা কথার মধ্যে না-জানি কি ঐন্দ্রজালিক মোহ আছে! তার নাম করলেই যেন আত্মার বেদীমূলে আলোর প্রদীপ জ্বলে ওঠে, অনির্বাণ তার দীপশিখা। 'স্বাধীনতা' নামের মাহাত্ম্য এমন যে-দেশপ্রেমিক তার পবিত্র নামে সংকল্প করে তরবারি কোষমুক্ত করেন, তাঁর পরাজয় হয় না। যে বক্ষ থেকে রক্ত ঝরে পড়ে, আত্মোৎসর্গের গৌরবে সেই বক্ষই টান-টান হয়ে ফুলে ওঠে। যে হাত অত্যাচারীর শৃঙ্খল ছিন্ন করে পরাধীন লাঞ্ছিত মানুষকে আত্মমর্যাদা

দান করতে পারে, সে হাত ধন্য !

'ক্রীতদাসের মুক্তি' কবিতার মধ্যে ডিরোজিওর জীবনের সমগ্র আদর্শটি এমন পরিপূর্ণরূপে মূর্ত হয়ে উঠেছে যা আর কোথাও হয়নি। বর্বর দাসত্বের অনাদৃত কুৎসিত রূপ তিনি আশৈশব স্বচক্ষে দেখেছেন কলকাতা শহরে। কেবল দারিদ্র্যের জন্যই যে মানুষ দাসখত লিখে দিয়েছে তা নয়, ধর্মান্ধতার জন্যও যে কিভাবে এদেশের মানুষ অবলীলাক্রমে আত্মবিক্রয় করেছে ও করতে পারে তা-ও তিনি প্রত্যহ দেখেছেন। সর্বপ্রকার দাসত্বের বিরুদ্ধে তাঁর মন-প্রাণ তাই কিশোর বয়সে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, এবং সকল রকমের ব্যক্তিক ও সামাজিক বন্ধন থেকে তিনি মানুষের অবাধ মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁর স্বল্পায়ু কর্মজীবনে এই স্বপ্নকেই তিনি বাস্তবে রূপ দেবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন।

ডিরোজিওর বাল্য ও কিশোর জীবনের পরিবেশ পরিচয় শেষ হল না এখানে। তার বৈচিত্র্য ও বৈরূপ্যের আরও নানাদিক আছে। তার বিবরণ না দিলে তাঁর চরিত্র-গঠনের চিত্রশালার ধারণা পরিষ্কার হবে না। প্রথমেই ন্যায়-বিচারের ধারণার কথা মনে পড়ে। লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড এবং গুরু অপরাধে লঘুদণ্ড দেওয়া তখনকার ইংরেজ বিচারকদের কাছে সুবিচার বলে গণ্য হত। এই বিচারবোধ ও দণ্ডনীতি যে তাঁদের ব্যক্তিগত ইচ্ছাপ্রসূত ছিল না, সামাজিক প্রথাধীন ছিল, তা বলাই বাহুল্য। আঠার শতকে তো বটেই, উনিশ শতকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত সেকালের পত্রিকায় কলকাতার সুপ্রিম কোর্টের বিচারের যে-সব খবর ছাপা হত তা পাঠ করলে আজকের যে-কোন লোক ভয়ে শিউরে উঠবেন। দু-একটি দৃষ্টান্ত 'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

১৮০৬ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরে আদালতের সংবাদে দেখা যায় মুর, জেম্‌স, রায়ান নামে সাহেবদের নরহত্যার অপরাধে একবছর কারাদণ্ড ও কুড়ি টাকা জরিমানা করা হয়। কাউকে আবার একই অপরাধের জন্য একসপ্তাহ জেল ও একটাকা জরিমানা করা হয়। চুরির অপরাধে কানাই মিস্ত্রির হাত পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দেওয়া হয়। জালিয়াতি ও প্রতারণার অপরাধে প্রাণদণ্ডও দেওয়া হয় অনেক অপরাধীকে। একসময় ইংরেজরা

চাবুক মেরে অপরাধীদের প্রকাশ্যে পথের উপর লোকসমক্ষে ফাঁসী দিতেন। তাতেও যথেষ্ট দণ্ড দেওয়া হয় না মনে করে তাঁরা ঠিক করেন যে অতঃপর বেত্রাঘাত করে অপরাধীকে কামানের মুখে বসিয়ে সোজা উড়িয়ে দেওয়া হবে। এই বিচারবোধ ইংরেজরা ইংলণ্ড থেকেই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন, এদেশের কাজীর বিচার অথবা দণ্ডনায়কের বিচার থেকে গ্রহণ করেননি। অর্থাৎ মধ্যযুগের নীতিবোধ ও আইনকানুনের জঙ্গল থেকে এদেশের লোকের মতো ইংরেজরাও তখনও পর্যন্ত পরিত্রাণ পাননি। বিচারের এই বিসদৃশ বিশৃংখলাকে ট্রেভেলিয়ান 'illogical chaos of law' বলে অভিহিত করেছেন। ন্যায়বিচারের এই অর্ধ-বর্বর প্রহসন ডিরোজিও বাল্যকাল থেকে দেখেছেন কলকাতা শহরে। এ-ও যে মধ্যযুগের মানসিক জাড্যের ভস্মাবশেষ ছাড়া আর কিছুই নয় তা-ও তিনি উপলব্ধি করেছেন ধীরে ধীরে।

কেবল বিচারকদের নয়, ইংরেজ পুলিশের অবস্থাও তখন খুব শোচনীয় ছিল। এদেশের জাদুমন্ত্র তুকতাক নলচালা বাটিচালা ইত্যাদি আধিভৌতিক কৌশলের সাহায্য নিয়ে চোর-জুয়াচোর সন্ধান করতে ইংরেজ পুলিশেরা আদৌ দ্বিধা করতেন না। আঠার শতকের শেষে টমাস মট্ নামে এক সাহেব কলকাতার পুলিশ সুপার ছিলেন। চোরডাকাত ধরার জাদুকরী কৌশলের জন্য তিনি 'জাদুকর মট্' বলে খ্যাত হয়েছিলেন এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ সেপাইদের শহরের লোক 'Motte's conjurors' বলত। উনিশ শতকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত অন্তত কলকাতার পুলিশের মধ্যে জাদুকর মটের শিষ্য প্রশিষ্যের অভাব ছিল না। শ্রীমতী ফ্যানি পার্কস ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দেও কলকাতার পুলিশকে চালপড়ার সাহায্যে চোর ধরতে দেখেছেন। চৌরঙ্গিতে তাঁর নিজের বাড়িতেই এই পদ্ধতিতে চোর ধরার একটি বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। চালপড়া ও নলচালার সাহায্যে কলকাতার ইংরেজ পুলিশদের চোর ধরার দৃশ্য উপভোগ করার সুযোগ বাল্যকাল থেকে ডিরোজিও যথেষ্ট পেয়েছিলেন। এদেশের মনোভূমিতে মধ্যযুগের নানা রকম ভূতপ্রেত দৈত্যের তাণ্ডবনৃত্য দেখে তিনি বিমূঢ় হয়ে গেছেন। ইংরেজদেরও স্কন্ধে চেপে সেই দৈত্যরা দৌরাত্ম্য করছে দেখে তিনি আরও অবাক হয়েছেন নিশ্চয়। তার উপর হিউমপন্থী গুরু ডেভিড ড্রামণ্ডের

শিক্ষায় মানুষের মনের এই শ্মশানদৃশ্য তাঁর কাছে যে কী বীভৎস ও ভয়াবহ মনে হয়েছে তা ভাবা যায় না।

কলকাতা শহরে তখন বিপুলকায় মেদবহুল রাজা মহারাজা বেনিয়ান-ইজারাদারদের জীবনযাত্রা ছিল সর্বক্ষেত্রে ইংরেজ মহাপ্রভুদের অনুগামী। গৃহের আসবাবপত্তরে, দাসদাসীর সমাবেশে, ভোজসভার নৃত্যগীত সমারোহে, উৎসব পার্বণের কৃত্রিম বিলাসে, এদেশীয় সমাজের নব্যপ্রধানেরা বিদেশী শাসকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লোকচক্ষে সামাজিক মর্যাদালাভের জন্য তখন অত্যধিক লালায়িত হয়েছিলেন।

সমগ্র আঠার শতক ধরে বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে প্রবল বিপর্যয়ের ঝড় বয়ে গিয়েছিল তার প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া বাঙালীর সামাজিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্বভাবতঃই প্রকট হযে উঠেছিল। শাস্ত্রকার ও স্মৃতিকারেরা যত বেশি কঠোর নিয়মের লৌহশৃংখলে পদস্খলিত নীতিভ্রষ্ট সমাজকে বাঁধতে চাইছিলেন, ততই যেন 'বজ্র আঁটুনি ফস্‌কা গেরো'র মতো সমাজের স্খলন-পতন-চ্যুতি ও অধোগতি ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কৌলীন্যপ্রথা বহুবিবাহ বাল্যবিবাহ পৌত্তলিকতা প্রভৃতি যাবতীয় কুসংস্কার ও কুপ্রথা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল সমাজে। সহমরণ ও সতীদাহের মতো বীভৎস প্রথাও উনিশ শতকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত বাংলার সমাজে যেভাবে প্রসারলাভ করেছিল, তা থেকে অজ্ঞান ও অযৌক্তিকতার গাঢ় অন্ধকার যে দেশবাসীর মন ও বুদ্ধিকে কতখানি আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল তা খানিকটা অনুমান করা যায়। ডিরোজিও যখন এই নতুন মহানগরে জন্মগ্রহণ করেন তখন এই ঘোর অমাবস্যার অন্ধকারে আমাদের যুক্তি ও বুদ্ধি নিমজ্জিত হয়েছিল। ভেলার মতো কেবল ভেসে বেড়াচ্ছিল ধর্মোন্মত্ত বিকলচিত্ত, বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তির ও দৃষ্টির কোনো কাণ্ডারী ছিল না তাতে।

কৃষ্ণপক্ষের রাতের মতো বাংলাদেশের জীবনে গোটা আঠার শতকটাই পর্বে-পর্বে যেন অন্ধকারের প্রহর অতিক্রম করে চলেছিল। সেই অন্ধকারে কেবল ধ্বনিত হচ্ছিল অর্থলোলুপদের সোরগোল, বিদেশী ও স্বদেশী উভয় দলের। তার মধ্যে শিক্ষার বাসনা ছিল না, জ্ঞানবিদ্যা ও সংস্কৃত

চর্চার প্রতি অনুরাগ তো দূরের কথা বরং বিরাগই ছিল এবং দেশীয় মহান ঐতিহ্য যা কিছু তা যে বিস্মৃতির কোন্ অতল তিমিরে তলিয়ে গিয়েছিল তার ঠিক নেই। বিদেশী রাইটার, জুনিয়র সিনিয়র মার্চেণ্ট, ফ্যাক্টর, এজেণ্ট থেকে কৌন্সিলের সদস্য, প্রেসিডেণ্ট, গভর্নর পর্যন্ত সকলেই ছিলেন টাকার ধান্ধায় উন্মত্ত, দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য। তাঁদের এদেশী প্রতিনিধিরা, অর্থাৎ নতুন বাঙালী (এবং অবাঙালীও) ধনাঢ্যরা বিদেশী প্রভুদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হচ্ছিলেন পদে পদে। এইসব নব্য বাঙালী রাজা মহারাজা মুন্সী দেওয়ান-বেনিয়ানদের তাৎকালিক বিকৃত সাংস্কৃতিক আচরণের একটি হলওয়েল বর্ণিত 'জেণ্টুদের দুর্গোৎসব।'* শিক্ষা সংস্কৃতিক্ষেত্রে আঠার শতকের একমাত্র ক্ষীণ আলোকরশ্মি হল, ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বাংলা 'এসিয়াটিক সোসাইটি', কিন্তু এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়ে তখন যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানানুসন্ধিৎসা প্রকাশ পেয়েছিল তা সীমাবদ্ধ ছিল কলকাতা শহরের মাত্র ত্রিশজন ইয়োরোপীয়ের মধ্যে।** এই ত্রিশজনের মধ্যে সকলে যে প্রাচ্যবিদ উইলিয়ম জোন্সের মতো বিদ্যানুরাগী ছিলেন তা নয়, সামাজিক প্রতিপত্তি ও প্রভুত্বের জোরেও অনেকে এই বিদ্বৎগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। বাঙালী ও ভারতীয়ের জীবনের সঙ্গে তার কোনো সংস্রব ছিল না, অন্তত আঠার শতকে। সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতাদের কক্ষেই এই আলোকরশ্মি আবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু অন্ধকার রাত্রির পর আলোকোজ্জ্বল দিন আসে যেমন, ঠিক তেমনি সহজ স্বাভাবিক নিয়মে না হলেও, কতকটা অনুরূপ ঐতিহাসিক আবর্তনের ছন্দে সামাজিক অন্ধকার-যুগের পর নতুন আলোর ও আশার সম্ভাবনা নিয়ে নবযুগের অভ্যুদয় হয়। আঠার শতকের পর উনিশ শতকের প্রথম পর্ব থেকেই একটা পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল নতুন সম্ভাবনা নিয়ে।

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ডিরোজিও যখন জন্মগ্রহণ করেন, রামমোহন রায় তখনও বাংলার নতুন রাজধানী কলকাতা শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করার সিদ্ধান্ত করেননি। বালক ডিরোজিও যখন ড্রামণ্ডের স্কুলে ভর্তি হন, সেই সময় ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি রামমোহন কলকাতায় এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। আট-নয় বছর ডিরোজিও যখন ড্রামণ্ডের

স্কুলে লেখাপড়া শিখেছিলেন, রামমোহন তখন ধীরে ধীরে নবযুগের আদর্শ সংগ্রামে অবতীর্ণ হচ্ছিলেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ডিরোজিওর যখন বর্ণপরিচয় হচ্ছে ধর্মতলা অ্যাকাডেমিতে, রামমোহন তখন কলকাতায় 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করে এবং অনুবাদ ও ভাষ্যসহ 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশ করে সমাজে প্রথম কলগুঞ্জনের সৃষ্টি করছেন।

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ডিরোজিও যখন ন বছরের ছাত্র, রামমোহন তখন সহমরণ বিষয়ে তাঁর প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ লিখে প্রকাশ করেন।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে চোদ্দবছর বয়সে ডিরোজিও বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করেন। তখন তাঁর পূর্ণ কৈশোর, এবং নব্যবাবুদের কলকাতা শহরে তাঁর সামনে পাতাল-বিস্তৃত পিচ্ছিল পতনের পথ। আরও একটি দুর্গম পথ বহুবাধা অপসারণ করে রামমোহন তখন নির্মাণ করছিলেন বটে, কিন্তু তা যেমন চড়াইবহুল তেমনি কণ্টকাকীর্ণ ও বিপদসংকুল। এর যে-কোন একটি পথ ধরে ফিরিঙ্গি সন্তান ডিরোজিওকেও তখন যাত্রা করতে হবে।

যে সমাজে ডিরোজিওর বাল্যকাল কৈশোর ও যৌবনের প্রথমপর্ব কেটেছিল তার রূপ ও প্রকৃতি ছিল এইরকম।*** এই ধরনের সমাজে সচেতন ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় দুই প্রকারের—হ্যাঁ-ব্যক্তিত্ব ও না-ব্যক্তিত্ব। সমাজের প্রচলিত প্রথা ও সংস্কার মাথা হেঁট করে মেনে চলতে রাজী না, শাস্ত্রমত বলে গৃহীত বিধিনিষেধ আচরণীয় বলে স্বীকার করতে সম্মত না, বুদ্ধি ও যুক্তির অগম্য যা তা সত্য বলে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছুক না, কোন শাসন অনুশাসনকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বিচার-বুদ্ধির চেয়ে বড় সত্য বলে গ্রহণ করতে বাধ্য না—সামাজিক পরিবেষ্টনের একটা সীমিত স্তরে তখন এইরকম 'না-না' আর 'না'-র বিস্ফোরক বারুদ দিয়ে ঠাসা। সমাজের এই স্তরে অগণিত 'না'-এর বারুদের মধ্যে আবাল্য প্রতিপালিত হয়ে ডিরোজিওর মনপ্রাণ প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে চারিদিক বিদীর্ণ করে যেন ফেটে পড়তে চেয়েছিল।

* বিনয় ঘোষ ঃ 'কলকাতা কালচার' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

** "Thirty Gentlemen attended this meeting, ( ১৫ জানুয়ারি, ১৭৮৪, বৃহস্পতিবার এসিয়াটিক সোসাইটি স্থাপনের উদ্দেশ্যে আহূত প্রথম সভা ) and they represented the *elite* of the European Community in Calcutta at the time." ( Centenary Review of the Asiatic Society of Bengal, 1784-1883 —Part 1, History of the Society, by Rajendralal Mitra ) ।

*** বিনয় ঘোষ ঃ বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা ঃ ১৮০০-১৯০০
বিনয় ঘোষ ঃ বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ( পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ )
সামাজিক পরিবেশের বিস্তারিত পরিচয় এই গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যাবে।

# ডিরোজিও শিক্ষাসত্র

## যোগেশচন্দ্র বাগল

সম্প্রতি জনৈক লেখক ডিরোজিওর কার্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন যে, ডিরোজিওর কবিপ্রতিভার আলোচনা করিতে আমরা যেন ভুলিয়াই গিয়াছি। বাস্তবিক পক্ষে, এ বিষয়ে তাঁহার লেখা বাদে ইদানীং কালে আর কোনো আলোচনা দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তবে একটি কথা, কবি কি সাংবাদিক হইলেও ডিরোজিওর অবিস্মরণীয় কীর্তি তাঁহার বাঙালি যুবকদের শিক্ষাদানের মধ্যেই সবিশেষ প্রকট হইয়া রহিয়াছে। তিনি স্বকীয় শিক্ষাগুণে সমাজ-জীবনে যে অভূতপূর্ব সাড়া জাগাইয়া ইহাকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে সক্ষম হন সে কথা আজ কে না জানেন। এই সমাজচেতনা সম্পূর্ণ শতাব্দী উপচাইয়া আমাদের সময়েও পোঁছিয়াছে। তাই এ বিষয়ে এত আলোচনা-সমালোচনা ইত্যাদি।

ডিরোজিওকে আমি 'শিক্ষাসত্র' বলিতেছি। অন্নসত্র, দানসত্র প্রভৃতি কথার সঙ্গে আমরা পরিচিত। অন্নবিতরণের স্থান অন্নসত্র। যখন কোন বিশেষ উপলক্ষে প্রচুর দান করা হয়, তাহাকে আমরা বলি দানসত্র।

শিক্ষাসত্র কথাটিও মূলত এই অর্থেই আমি এখানে প্রয়োগ করিতেছি। শিক্ষায়তন বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সাধারণ অর্থে শিক্ষাদানের ক্ষেত্র। ডিরোজিও হিন্দু কলেজের মত একটি শিক্ষায়তনের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়াও শিক্ষা-ব্যাপারটিকে এমন সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন এবং তদনুরূপ ইহা কার্যে রূপায়িত করিতে যত্ন লইয়াছিলেন যে, ডিরোজিওকেই একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য করা যায়। ইহার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। পরে আমি এ বিষয়ে বলিতেছি।

ডিরোজিও মাত্র পাঁচ বৎসর কাল (মে ১৮২৬-এপ্রিল ১৮৩১) হিন্দু কলেজে চতুর্থ শিক্ষকের পদে বৃত ছিলেন। জীবনীকার এডওয়ার্ডস্ এই সময়টিকে মাত্র তিন বৎসর ধার্য করিয়াছেন। কারণ তাঁহার প্রদত্ত কলেজে ডিরোজিওর শিক্ষকপদে নিয়োগের তারিখ মার্চ ১৮২৮। ইহা যে ভুল তাহা নিশ্চিত-রূপেই প্রমাণিত হইয়াছে। শিবনাথ শাস্ত্রী 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' পুস্তকেও এডওয়ার্ড-প্রদত্ত সময়টিকে গ্রহণ করিয়া বিপদে পড়িয়াছেন। যাহা হোক, শিক্ষাব্রতী ডিরোজিও সম্বন্ধে কোথায় কি পাওয়া যায় সে বিষয়ে দু-চার কথা আগে বলা যাক। মনে রাখিবেন, ডিরোজিওর শিক্ষকতা-কাল হইতে আমরা প্রায় দেড় শতাব্দী আগাইয়া আসিয়াছি। কাজেই সমসাময়িক রচনা এবং পরবর্তীকালের নির্ভরযোগ্য বিবরণাদির উপরেই আমাদের কম-বেশী নির্ভর করিতে হইতেছে।

ডিরোজিওর ছাত্র-শিষ্যগণ তাঁহার এই সময়কার কার্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু কিছু লিখিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ সিকদার, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি কাহারো কাহারো রচনায়, পুস্তকে এবং দিনলিপিতে ডিরোজিও সম্বন্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ আছে। এই সূত্র হইতে তাঁহার শিক্ষাদান-পদ্ধতি এবং কিশোর ও যুবছাত্রগণের উপর ইহার প্রভাব কতকটা আঁচ করা যাইতে পারে। ডিরোজিওর সময়ে কলেজের অ-শিক্ষক কর্মী ছিলেন হরমোহন চট্টোপাধ্যায়। তিনি তাঁহার শিক্ষাদানরীতি, ছাত্রদের উপর ইহার প্রভাব এবং কলেজকর্তৃপক্ষের সঙ্গে ডিরোজিওর বিরোধ সম্পর্কে বিশেষ

আলোকপাত করিয়াছেন। তাঁহার এই বিষয়ক পুস্তকখানি আদৌ মুদ্রিত হয় নাই। ইহার পাণ্ডুলিপি হরমোহনের পুত্রের নিকট হইতে ডিরোজিও-চরিতকার টমাস এডওয়ার্ডস্ পান এবং ইহার কোন কোন অংশ নিজ পুস্তকে ( *Henry Derozio e c.* পৃ ৬৬-৭০) উদ্ধৃত করেন। শিবনাথ শাস্ত্রীব 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে ডিরোজিও সম্পর্কে এমন অনেক বিষয় আছে যাহা অন্যত্র পাওয়া ভাব। তিনি কয়েকজন ডিবোজিও-শিষ্যের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসেন এবং তাঁহাদের প্রমুখাৎ ডিরোজিও সম্বন্ধে যাহা যাহা শুনিয়াছেন উক্ত পুস্তকে তাহার অনেকটা লিপিবদ্ধ কবিয়াছেন। বাংলার বাহিরেও কোন কোন ডিবোজিও-শিষ্য সমাজসেবার ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। ইহারও উল্লেখ পাই এই গ্রন্থে।

আমরা এখানে ডিবোজিওর শিক্ষকতা-কালেব কথাই বলিতেছি এবং বিভিন্ন সূত্র হইতে ইহার উপরে কিরূপ আলোকপাত করা হইয়াছে তাহাই সংক্ষেপে বলিলাম। এই সকল সূত্র হইতে যাহা যাহা জানিতে পারি তাহার পরেও কিছু জিজ্ঞাসা থাকিয়া যায়। এ কথা এখন নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, ডিরোজিও হিন্দু কলেজের চতুর্থ শিক্ষক ছিলেন এবং তিনি চতুর্থ শ্রেণীতে ছাত্রগণকে ইতিহাস ও ইংরাজি সাহিত্য পড়াইতেন। কলেজের সময় সাত ঘণ্টা। তিনি কি দিনের এই দীর্ঘকাল শুধু একই শ্রেণীতে ঐ দুইটি বিষয় পড়াইতেন, না অন্যান্য শ্রেণীতে তাঁহাকে কিছু পড়াইতে হইত? ডিরোজিও নিশ্চয়ই সংস্কৃত, ফার্সি বা বাংলা পড়াইতেন না। গণিতেও তাঁহার আসক্তি ছিল অতি কম। এ কারণ ইহার পাঠনার ভারও যে তাঁহার উপর দেওয়া হইবে, ইহা তো মনে হয় না। বিজ্ঞানের শিক্ষক আলাদা। বাকি থাকে শুধু ভূগোল। ইহা অবশ্য তাঁহার এক্তিয়ারের মধ্যে ছিল মনে হয়। এতদিন পরে আজ এই জিজ্ঞাসার উত্তর কে দিবেন?

তবে একথা নিশ্চিত যে, ডিরোজিও পাঁচ বৎসরকাল একাদিক্রমে চতুর্থ শ্রেণীতে উক্ত বিষয়-দুইটি ( ইতিহাস ও ইংরেজি সাহিত্য ) পড়াইয়াছেন। প্রতি বৎসর কম করিয়া ৪০ জন ছাত্র ধরিলেও পাঁচ-ছয় বৎসরে প্রায় আড়াই শত ছাত্র ডিরোজিওর নিকট পাঠ লন। প্রথম হইতেই ডিরোজিওর পাঠনারীতি ছেলেদের মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। কৃষ্ণমোহন

বন্দ্যোপাধ্যায় কখনও কলেজে ডিরোজিওর নিকট পড়েন নাই। কিন্তু তিনি তাঁহার দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ডিরোজিও যখন চতুর্থ শিক্ষকরূপে শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করেন, তখন হিসাব মতে, কৃষ্ণমোহন ছিলেন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। কৃষ্ণমোহনের মত আরও অনেকে তাঁহার নিকট ক্লাসের বাহিরে পাঠ লইতে আসেন এবং তাঁহার দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন। উচ্চতর শ্রেণী হইতে আরও কেহ কেহ ডিরোজিওর সংস্পর্শে আসিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ—হরচন্দ্র ঘোষ ও রসিককৃষ্ণ মল্লিকের নাম করা যাইতে পারে। হরচন্দ্র ডিরোজিও অপেক্ষা এক বৎসরের বড় ছিলেন, আর রসিককৃষ্ণ ছিলেন এক বৎসরের ছোট। ইঁহাদের কথা এখানে বলিতেছি এই জন্য যে, উপরিউক্ত ছাত্রসংখ্যা বাদে আরও বিস্তর ছাত্র ডিরোজিওর পাঠনারীতিতে বিশেষভাবে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

ডিরোজিও বহু ছাত্রকে পড়াইয়াছেন, এমনকি উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রেরাও তাঁহার নিকটে শিক্ষালাভের জন্য ভিড় জমাইতেন। শিক্ষক তো আরও অনেকে ছিলেন। একজন লেখক বলেন—ছেলেরা অন্যান্য শিক্ষকের নিকট পাঠ গ্রহণ করিলেও ডিরোজিওরই একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। শুধু পাঠনারীতির উৎকর্ষ ও অভিনবত্বের দরুনই ইহা সম্ভব হয় না, ইহার অতিরিক্ত আরও কিছু ছিল। এইখানেই ড্রামণ্ডের শিক্ষা যে ডিরোজিওর অস্থিমজ্জাগত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ মিলে। মানুষের প্রতি দরদ, স্নেহ, মমতা—এক কথায় মানবপ্রেম, যাহার উৎস স্বদেশপ্রেমের মধ্যে, ডিরোজিওর ভিতর তাহা বিশেষভাবে স্ফুরিত হইয়াছিল। ছাত্রদল যাহারা তাঁহার নিকট ক্লাসে পাঠ লইত এবং যাহারা অন্যত্র তাঁহার সংস্পর্শে আসিত, সকলেই ডিরোজিওর প্রীতিপূর্ণ মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ না হইয়া পারিত না। আর এই কারণেই চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে তিনি কিশোর ও যুবক ছাত্রসমাজকে তদ্রূপ আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। এইখানে আরও একটি বিষয়ের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ডিরোজিও অষ্টাদশ বর্ষে পা দিয়াই কলেজের চতুর্থ শিক্ষকপদে ব্রতী হন। তিনি যে শ্রেণীর জন্য বিশেষ করিয়া নিযুক্ত সেই চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রদের বয়স তখন ১৩ হইতে ১৫ বৎসরের মধ্যে। শিক্ষক ও ছাত্রদলের ভিতর বয়সের এই নৈকট্য উভয়ের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

ডিরোজিওকে 'শিক্ষাসত্র' বলিয়াছি। সামগ্রিক ভাবনাই যে ইহার মূলে তাহা কি আর বলিতে? এখন ডিরোজিওর পাঠদান সম্পর্কে খানিকটা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিলেই ইহার যাথাথ্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। পূর্বে বলিয়াছি, ডিরোজিও চতুর্থ শ্রেণীতে ইতিহাস ও ইংরাজী সাহিত্য পড়াইতেন। এই দুটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত পুস্তকসমূহ সম্বন্ধে কলেজের কার্যবিবরণীতে কোন উল্লেখ নাই; অবশ্য ইহাতে বোধ হয় থাকিবারও কথা নয়। যাঁহারা তাহার নিকট এই শ্রেণীতে পাঠ লইতেন তাঁহাদেরও কোনও লেখায় এ সম্বন্ধে উল্লেখ দেখি না। একমাত্র হরমোহন চট্টোপাধ্যায়ই তাঁহার অমুদ্রিত পুস্তকে ইহা দিয়াছেন। এই সব বইয়ের মধ্যে ইতিহাস ছিল—গোল্ডস্মিথের *History of Greece, Rome & England*; রাসেলের *Modern Europe*, রবার্টসনের *Charles V.* এবং সাহিত্যবিভাগে এই কখানা বই: *Gay's Fables, Pope's Homer's Illiad and Odyssey, Dryden's Virgil, Milton's Paradise Lost*, ও শেক্সপীয়রের একখানি বিয়োগান্ত নাটক।—( Henry Derozio etc. T. Edwards পৃ ৬৬ )।

ডিরোজিওর কবিমানস স্বতই ছেলেদের নিকট পাঠ্যবিষয়সমূহকে সরস ও সহজবোধ্য করিয়া তুলিত। তিনি ছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত দার্শনিকদের মতবাদের সঙ্গে পরিচিত। ইহাদের মধ্যে হিউম ছিলেন তাঁহার বিশেষ প্রিয়। হিউমের যুক্তিভিত্তিক মানবতাবাদ, গুরু ড্রামণ্ডের মত তাঁহাকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। হিউমের দার্শনিক ভাবনা তাঁহার পাঠদান রীতিকে ভাবসমৃদ্ধ করিয়া তোলে। ক্লাসে সব বিষয়ের বিশদ আলোচনা করা সম্ভব নয়। ডিরোজিও অবসর সময়ে এবং ছুটির পর কলেজগৃহে বসিয়াই ছাত্রদের সঙ্গে অধীতব্য নানা বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত হইতেন।

আগে বলিয়াছি, উপরের কোন কোন শ্রেণীর ছাত্রগণও তাঁহার এই পড়ানোয় যোগ দিত। এই কথা একটু পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার। ডিরোজিওর সাক্ষাৎ ছাত্ররা তাঁহার দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। তাহারা ক্রমে উপরের শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া ঐ ঐ শ্রেণীর

পুস্তকাদি পাঠে লিপ্ত হয়। এইসব ছাত্র যাহারা ক্রমে তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হয়, তাহারাও অনেকে কোন কোন দিন ছুটির পর ডিরোজিওর আসরে আসিয়া মিলিত হইত। এটিকে একটি পাঠচক্র বলা চলে। ডিরোজিও ছেলেদিগকে অধীত ও অধীতব্য বই-পুঁথি বুঝাইয়া দিতেন। পাঠ্যাতিরিক্ত কোন কোন বিষয়ের উপর ছেলেদের সঙ্গে তিনি আলোচনায় লিপ্ত হইতেন। প্যারীচাঁদ মিত্র বলেন, ধর্ম ও দর্শন-বিষয়ক পুস্তকাদি পাঠ করিতে এই সময়ে ডিরোজিওর নিকট হইতে কিশোর ছাত্রেরা বিশেষ উৎসাহ পান।

দর্শনশাস্ত্র ডিরোজিওর অতি প্রিয় বিষয়। নানা আলোচনার মাধ্যমে এই ধরনের জ্ঞানও ছেলেরা লাভ করিতে থাকে। ডিরোজিও ছিলেন সত্যসন্ধানী। সত্যের প্রতি অগাধ প্রীতি তাঁহার ছাত্রদের মধ্যেও অনুক্রামিত হয়। কলেজ ছুটির পর ছেলেদের শিক্ষাদানের নিমিত্ত ডিরোজিও এত যে ক্লেশ স্বীকার করিতেন, তাহা ছিল কর্তৃপক্ষের অগোচর। তিনি নিঃস্বার্থভাবেই দিনের পর দিন এইরূপ কার্য করিয়া যাইতেন।

কিশোর ছেলেদের কেহ কেহ তাঁহার বাড়িতে গমন করিত এবং পাঠ্য ও পাঠ্যাতিরিক্ত নানা বিষয়ের আলোচনায় লিপ্ত হইত। এখান হইতেই অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের উৎপত্তি।

আমরা আজকাল একটি কথা যেন ভুলিতে বসিয়াছি। একটি বিষয়ে—এবং আমার মনে হয় তাহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, শিক্ষাব্রতীদের মনোযোগী হওয়া শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, কর্তব্যও। এটি হইল, ছাত্রদের মধ্যে নীতিবোধ জাগানো, যাহার ফলে তাহাদের চরিত্র গঠিত হইয়া মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্ভব হইতে পারে। বিদ্যানুরাগ এবং নীতিবোধ উন্মেষ, এই দুই দিকেই ডিরোজিওর সমান দৃষ্টি ছিল। ডিরোজিও কবি, সাহিত্যিক, দর্শনবেত্তা, তদুপরি তাঁহার পাঠনারীতি অভিনব। কাজেই ছেলেদের মনে বিদ্যানুরাগ জন্মানো তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য ছিল। নীতিবোধের উন্মেষ অপেক্ষাকৃত কঠিন ব্যাপার। আমাদেরই কথায়—'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়।' ডিরোজিওর শিক্ষা ও আচরণ, দুইয়ে মিলিয়া ছাত্রদের মধ্যে সত্যিকার নীতি—

জ্ঞান জন্মায়। মানবচরিত্রের দোষত্রুটি যে তাঁহার মধ্যে একেবারেই ছিল না এমন কথা কেহ বলিবেন না। কিন্তু কথায় এক, কাজে আর, এই রকমটি তিনি ছিলেন না। তিনি ছাত্রদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে মিশিতেন। খোলা-খুলিভাবে কথা কহিতেন এবং সত্যের প্রতি তাঁহার অপরিসীম নিষ্ঠা স্বীয় আচরণ দ্বারা তাঁহাদের হৃদ্‌গত করাইতেন। আর এই কাবণে নিজের আদর্শের দ্বারা কিশোর ছাত্রগণকে অনুপ্রাণিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সময়ে ছেলেদের মধ্যে যে প্রগাঢ় নীতিবোধ তথা সত্যানুরাগ জন্মে, তাহার কথা তাঁহাদের কেহ কেহ পরে লিখিয়া গিয়াছেন। হরমোহন চট্টোপাধ্যায় বলেন—

'Such was the force of his instruction that the conduct of the students out of the college was most exemplary, and gained them the applause of the outside world, not only in a literary and scientific point of view, but what was of still greater importance, they were all considered 'men of truth.' Indeed the 'College boy' was a synonym for truth, and it was a general belief and saying among our countrymen, which those that remember the time, must acknowledge that 'such a boy is incapable of falsehood because he is a College boy' —(Henry Derozio etc পৃঃ ৬৭)

উপরে যাহা বলিয়াছি, হরমোহনের উক্তিতে তাহারই সমর্থন মিলিতেছে। এ বিষয়ে হরমোহন এই মর্মে বলেন যে, ডিরোজিওর শিক্ষাপ্রভাবে ছাত্রদের মনে শুধু বিদ্যানুরাগই জন্মে নাই। ইহার অপেক্ষাও যাহা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তাহা অর্থাৎ কিশোর ছাত্রদের আচরণ আদর্শস্থল হইয়া প্রশংসালাভ করিতে সমর্থ হয়। এই বিষয়টি হইল ছাত্রদের সত্যের প্রতি প্রীতি। ঐ সময় 'সত্য' এবং 'কলেজের ছাত্র' এই দুইটি পরস্পরের প্রতিশব্দ হইয়া দাঁড়ায়। ছেলেরা কখনই মিথ্যা বলিতে পারে না, কারণ তাহারা যে কলেজের ছেলে! এই কথা তখন লোকের মনে গাঁথিয়া গিয়াছিল। এই সময়কার ছাত্র, পরবর্তীকালের প্রখ্যাত রাধানাথ সিকদার ডিরোজিওর শিক্ষাদানরীতি ও তাঁহার উপরে ইহার প্রভাব সম্বন্ধে এইরূপ

লিখিয়াছেন—"ডিরোজিও প্রথমত জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদিগকে উপদেশ দিতেন। এ শিক্ষা অমূল্য। তাঁহার শিক্ষাগুণে সাহিত্যিক যশের আকাঙ্ক্ষা আমার মনে এমন ভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে যে, আজও তাহা আমার সকল কর্ম নিয়ন্ত্রিত এবং আমাকে অনুপ্রাণিত করিতেছে। ...তাঁহার নিকট হইতে এরূপ কতকগুলি উদার নীতিমূলক ধারণা লাভ করিয়াছি, যাহা চিরকাল আমার কার্যকে প্রভাবিত করিবে।" অতঃপর রাধানাথ খুব জোরের সঙ্গে এই কথা কয়েকটি বলেন—"নিশ্চিত বলিতে পারি যে সত্যানুসন্ধিৎসা ও পাপের প্রতি ঘৃণা যাহা সমাজের শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে আজ এত অধিক পরিমাণে দেখা যায়—এ সকলের মূলে ছিলেন একমাত্র তিনিই। ডিরোজিও।"

# হিন্দু কলেজ : ডিরোজিও : আধুনিকতা

## সুরেশচন্দ্র মৈত্র

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় বালকদের ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত করে তোলা। প্রথম যুগে ইংরেজী শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল শব্দজ্ঞান অর্জন, পরে দাঁড়াল বাক্য রচনা প্রণালী আয়ত্ত করা এবং ইংরেজীতে জমা-খরচ রাখতে শেখা। English education, among the inhabitants of Bengal has hither to had little more than mere language for it's object ; a sufficient command of which for conducting the details of efficient duty, comprehended the utmost ambition of native students. The spelling book, a few reading exercises, a grammar and a dictionary formed the whole course of their reading, except in a few isolated instances of superior ability and industry ; little more was effected than a qualification of a copyist and an accountant.(১)

সাহেবদের সঙ্গে কাজকর্ম চালাবার পক্ষে যেটুকু ভাষাজ্ঞান প্রয়োজন, সেইটুকু আহরণ করাই ছিল তখনকার হবু মুৎসুদ্দি বেনিয়ান সরকার

মশাইদের অভিভাবকবর্গের বাসনা। ১৭৮৯ সনে বাংলা-ইংরেজী শব্দকোষ সংকলনের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন কলকাতার প্রধান প্রধান দেশীয় ভদ্রমহোদয়েরা (২)। হিন্দু কলেজের প্রথম নয় বৎসরের যে ইতিহাস (১৮১৭– ১৮২৫), সে ইতিহাস অন্যান্য ইংরেজী শিক্ষালয়ের 'কৃতিত্ব' অপেক্ষা অধিকতর গৌরবজনক ছিল না। হিন্দু কলেজের আর্থিক সংকট হিন্দু কলেজের নব রূপান্তরের হেতু। পর্তুগীজ বণিক জোসেফ ব্যাবেটো ছিলেন কোষাধ্যক্ষ; তাঁব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে যাওয়ায় হিন্দু কলেজের গচ্ছিত টাকা নষ্ট হয়ে যায়। তখন কর্মকর্তারা সরকারী সাহায্যের জন্য প্রার্থনা জানালেন। সরকার ১৮২৪ সনের শেষের দিকে একজন পবিদর্শক নিযুক্ত কবলেন; এই পরিদর্শকের নাম হল ডাঃ হোবেস হেমান উইলসন। ভদ্রলোক শিক্ষাবিভাগেব সেক্রেটারী। ডাঃ উইলসন যখন হিন্দু কলেজেব দায়িত্ব ভাব নিলেন, তখনও হিন্দু কলেজের সর্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেবাও(1st Class) Tcg রচিত Book of knowledge পড়ত, Enfield রচিত Speaker পাঠ কবত। তখন আরবী ফারসী পঠন পাঠনের ব্যবস্থাও বলবৎ ছিল।

উইলসন সাহেব হিন্দু কলেজের শিক্ষার লক্ষ্য বদলে দিলেন; তিনি স্পষ্টভাষায় বললেন, সাধারণভাবে ইতিহাস, ভূগোল এবং ইংরেজি ভাষাজ্ঞান অর্জন হোল হিন্দু কলেজে শিক্ষার লক্ষ্য। The general result of the operations of the Hindu College is to give the Students a considerable command of the English Language, to extend their knowledge of History, Geography and to open to them a view of the objects and means of Science." (৩) (Wilson's Report 1825)। এই মন্ত্র বলে এক অসাধ্য সাধন হোল। ১৮২৮ সনে তিনি লিখেছেন—"Whilst those of the present first class admit of no comparision with anything yet effected by the College, and far exceed the expectations which I then expressed or entertained.'' (৪) এক নব রূপান্তর সাধিত হোল; নবীন পাঠক্রম হোল প্রবর্তিত। এই নবীন পাঠক্রমে উচ্চতর শ্রেণীর জন্য সাহিত্য, মনোদর্শন বা মনস্তত্ত্ব (Mental Philosophy), ইতিহাস, গণিত, ভূতবিদ্যা

(Natural philosophy) ও ভূগোল স্থান পেল। সাহিত্যের পাঠ্যসূচীতে সেক্সপীয়ার, মিলটন, পোপ, ড্রাইডেন, অ্যাডিসন, জনসন, গোল্ডস্মিথ, গ্রে, হোমার, (অনূদিত); দর্শনে বেকন, লক, স্টুয়ার্ট, হার্টালি, রীড অ্যাবাবক্রম্বি; বিজ্ঞানে নিউটনের তিন শাখা (Three Sections), Optics, পোর্টারের বলবিদ্যা (Mechanics) হাইমারের জ্যোতির্বিদ্যা, হার্সেলের জ্যোতির্বিদ্যা, হলের ডিফারেন্সিয়াল ও ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস্, হিলের উচ্চতর গণিত ও জ্যামিতি; ইতিহাসে গ্রীস, রোম, আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস—গিবন, হিউম, রবার্টসন প্রভৃতির রচনা; অর্থনীতিতে এ্যাগডাম স্মিথের সদ্য প্রকাশিত ওয়েলথ অব নেশন্স পাঠ্য তালিকায় স্থান পেয়েছিল। ন্যায়-শাস্ত্রে মিলের লজিক, হোয়াটলির লজিক, এবং লেথামের ইংরাজী ভাষা সম্পর্কিত রচনা পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়েছিল। (৫) বলাবাহুল্য এই সমস্ত গ্রন্থ পঠন-পাঠনের ফলে শুধু ভাষা জ্ঞান অর্জন নয়, সত্যিকার শিক্ষালাভও সম্ভব হোল। Novum oganum-এর ভূমিকায় হিন্দু কলেজের পরবর্তী অধ্যক্ষ মিঃ কার লিখেছিলেন "They (Bacon, Milton, Adam Smith and Shakespeare) will make him a moral and intellectual being." তা সত্য হতে চলল। ১৮২৪ সনে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের বার্ষিক পরীক্ষায় ছাত্রদের কার্যকলাপ দেখে সংবাদপত্রে বিদ্রূপ করা হয়। (৬)

॥ ২ ॥

আর ১৮২৮ সনের হিন্দু কলেজের বার্ষিক পরীক্ষা দেখে জনৈক সাংবাদিক বলেছিলেন, হিন্দু কলেজ বাঙালী যুবকদের ইতিহাস ও বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানে পূর্ণ করতে চায়, ইংরাজি সাহিত্য পড়ুক এবং তা উপভোগ করুক, এটা চায়। আর চায় তারা যেন express just conclusions on a clear and polished Style, founded upon a comprehensive view of constitution of Society, and the phenomena of nature." (৭) পূর্বেই বলেছি এই নবীন হিন্দু কলেজের রূপকার ছিলেন ডঃ উইলসন: ডেভিড হেয়ারের সহযোগিতায় তিনি নবীন পাঠ-ক্রমটি তৈরি ও প্রবর্তন করেছিলেন। এই নবীন পাঠক্রম বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য নতুন শিক্ষক নিযুক্ত হতে লাগলেন।

ডঃ রস, ও ডঃ টাইটলার প্রভৃতি বিজ্ঞান ও গণিতের শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। দু'জন শিক্ষকের নাম পাওয়া যাচ্ছে—২৩শে মে সমাচার দর্পণে। তা থেকে জানা গেল হিন্দু কলেজে ডিয়ার ম্যান ও ডিরোজিও নামে দু জন শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার গত ডিরোজিও (১৮৭৩) জন্ম বার্ষিকী বক্তৃতায় বলেছেন যে, ১৩ই মে ডিরোজিও হিন্দু কলেজে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। সমাচার দর্পণের সংবাদটি ১৩ই মে তারিখে প্রকাশিত হয়েছে ; তার অর্থ এই নয় যে ঐ তারিখে ঐ নিয়োগ ঘটেছে। ৩রা মে ১৮২৬ সনে বৌবাজার স্ট্রীটের ভাড়াটে বাড়ি ছেড়ে হিন্দু কলেজ পটুলডাঙ্গার নবনির্মিত ভবনে স্থানান্তরিত হয়। এবং সম্ভবত তার পূর্বেই এই নব নিয়োগ পত্রাদি বিলি করা হয়েছিল। ডিরোজিওর কর্মকাল ১লা মে থেকে শুরু হয়েছিল বলে আমাদের ধারণা। এর বিকল্প কোন তারিখ নির্ণয় করা যুক্তিবর্জিত কাজ। ১৮২২ সন থেকে বার্ষিক পরীক্ষা উপলক্ষে সর্বসাধারণের সম্মুখে ছাত্ররা বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করত। সারা বছর অনুশীলন করে তারা কতটা পড়তে, লিখতে ও বানান করতে শিখেছে তার পরিচয় দেওয়া হোত। এবং যারা উঁচু ক্লাসের ছাত্র, তাঁরা ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ করে কৃতিত্ব প্রদর্শন করতেন। (৮) তাতেই অবশ্য তাঁদের কপালে সেদিন ভালো-ভালো চাকরী জুটত।

১৮২৪ সনের পরীক্ষার বিবরণের কথা বলেছি। তখন ছাত্ররা বিজ্ঞান বিষয়ে হাস্যকর জবাব দিয়ে সমালোচনার লক্ষ্যস্থল হয়েছে। ১৮২৫ সনেও তারা কেবল ভুগোল খগোল বিদ্যার কৃতিত্ব দেখাচ্ছে। (৯) অর্থাৎ তারা আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হতে পারেনি। ১৮২৬ সন থেকে হাওয়া পালটে যাচ্ছে একটু একটু করে। স্বয়ং উইলসন ইতিমধ্যে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। ২৬ সনের বার্ষিক পরীক্ষার রিপোর্টে দেখছি—"শিক্ষার উপযোগিতা কি" তাই নিয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হচ্ছে। এই বিতর্কে অংশ গ্রহণ করছেন অতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, কৃষ্ণধন মিত্র ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক। এ'রা অনেকেই পরবর্তী যুগের মোটামুটি পরিচিত, কেউ কেউ অতিশয় খ্যাত ব্যক্তি। (১০) ১৮২৭ সনে ছাত্রেরা প্রবন্ধ লেখায় নয়, আবৃত্তি ও বক্তৃতাতেই কৃতিত্ব দেখাচ্ছেন। ভাষাজ্ঞান

শব্দ-জ্ঞানের অনেক ঊর্ধ্বে চলে গেছে। (১১) এর পূর্বেই অবশ্য নতুন শিক্ষকেরা যোগদান করেছেন। এই বিতর্কের অংশ গ্রহণকারী রাজকিশোর বসুর বক্তৃতার শেষাংশ উদ্ধৃত করা গেল—The European benefits consist solely in pecuniary assistance, where as ours are not only the same, but the gain of learning, which is still more substantial, and to conclude with saying, that we are safe every way, improving in literature and sciences day by day and shall continue to do so as long as the British Patronising sway shall rule over us." (Calcutta Govt. Gazette, 24 January, 1828) (১২) ১৮২৭ সন থেকে হিন্দু কলেজের পরিবেশে দারুণ পরিবর্তন ঘটে গেছে ; তার পরিচয় কয়েক ঘণ্টার বার্ষিক উৎসবেও চাপা থাকছে না। এই বৎসর বার্ষিক পরীক্ষা-উৎসবে ছাত্ররা যে সব প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক করল, তা শুধু জ্ঞানমূলক নয়, চলমান জীবনের নানা জরুরী প্রসঙ্গ তাতে উঁকি দিল। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের বিতর্কের বিষয় ছিল—The consequences resulting to Europe and Asia by the discovery of the passage round the cape of Good Hope--উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে নৌপথ আবিষ্কারের ফলে ইউরোপ ও এশিয়ার কি কি সুবিধা হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের বিতর্কের বিষয় হোল—The Preference to be given to the public Distinction or to private happiness—ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, না সামাজিক সমৃদ্ধি—অনুসরণীয় কোনটি? বিতর্কে অংশ গ্রহণ করলেন রসিককৃষ্ণ মল্লিক এবং গঙ্গা গোবিন্দ গাঙ্গুলী। গঙ্গা গোবিন্দ বললেন, "a life which is not serviceable to our fellow creatures is not at all to be preferred to one, which has for its object the benefits of our species, and in which one is actively engaged in promoting that philanthropic end......and I therefore prefer public distinction because in public life the greatest good can be done to a greater number of beings, which in private life, cannot be expected." (১৩) এই বিতর্কে মাধবচন্দ্র মল্লিকও অংশ গ্রহণ করে-

ছিলেন। এই বৎসর আরও তিনটি বিষয়ে তিন শ্রেণীর ছাত্ররা প্রবন্ধ লেখে। তৃতীয় শ্রেণীর বিষয় হোল – The Preferrable claims to the Administration of different Grecian states , পঞ্চম শ্রেণীর বিষয় হোল— Consequences of the Britons from the Roman conquest এ ছাড়া এই বৎসরের পরীক্ষা উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ ছিল কাশীপ্রসাদ ঘোষের ইংরেজী রচনা। কাশীপ্রসাদ ঘোষ পরবর্তী যুগের বিশিষ্ট ইংরেজী লেখক ও কবি, 'The Hindu Intelligence পত্রিকার সম্পাদক ও 'The Shair and other Poems' এর কবি। কাশীপ্রসাদ ঘোষের শক্তি-মত্তার প্রথম প্রকাশ এই বৎসরে ঘটে। কাশীপ্রসাদ সেকালের বিখ্যাত জেমস মিল লিখিত বৃটিশ ভারতের ইতিহাস গ্রন্থের প্রথম চারটি পরিচ্ছেদের উপর এক সুনিপুণ সমালোচনা প্রকাশ করলেন। ঐ সমালোচনা নিবন্ধে নানা প্রসঙ্গের অবতারণার পর তিনি লিখলেন যে জেমস মিল হিন্দুদের চতুর্বর্গ কল্পনাকে 'দুর্বার শৃঙ্খলাহীন কল্পনা' র (wild and ungoverned imagination) পরিবর্ণিত বলেছেন। কিন্তু হিন্দুদের ঐ সিদ্ধান্ত আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার দ্বারা পুরোপুরি সমর্থিত হয়। (Chronology in those times was closely allied to astronomy , in fact the latter was the base of the former Science তখন কাশীপ্রসাদ স্কুলের ছাত্র, কিন্তু তাঁর এই মন্তব্য সেকালের প্রভাবশালী পত্রিকায় প্রতিধ্বনি তুলেছে। ( When Mr. Mill wrote his History of the British India, he very probably, never suspected that the pages of his work would be critically examined by a Hindoo distinguished for his arguments in the English language, and familiar with the classical recondite learning of the west. (১৪) উক্ত সংবাদপত্রে আরও বলা হল যে, ছাত্রদের কলম থেকে এই জাতীয় রচনার প্রকাশ খুবই অপ্রত্যাশিত, কারণ মাত্র কয়েক মাসের শিক্ষায় এটা ঘটছে। এই বৎসরের বার্ষিক উৎসবে আরও দুটি 'পরীক্ষা' প্রদর্শিত হয়—কাশী প্রসাদ ঘোষ ও হরচন্দ্র ঘোষের লেখা ইংরাজী কবিতা। প্রদর্শিত হয়েছিল ছাত্রদের আঁকা ছবি। উলাস্টোন নামে একজন দক্ষ শিল্পী শিল্প শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেছেন। সাংবাদিক লিখছেন, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বিতর্ক

—একই কক্ষে অনুষ্ঠিত হোত ; তখন ছাত্ররা হিন্দুস্থানী, ফরাসী ও বাংলায় বক্তৃতা দিত। আজ ছাত্ররা বক্তৃতা দিচ্ছে ইংরেজীতে। পূর্বে ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করা ছিল মুখ্য লক্ষ্য। আজ ইউরোপীয়দের রাজনীতি ও কায়দা কানুন অনুকরণ করা হলো প্রধান লক্ষ্য। "This is certainly a grand step towards enlarging the sphere of this understanding and freeing them from the spell of prejudice.' (১৫)

১৮২৭ সনের বার্ষিক উৎসবে ছাত্রদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে এইটি হোল সাংবাদিকের অভিমত। এই পরিবর্তনের পিছনে কার অবদান সর্বাধিক ? কার শিক্ষকতা ও জীবনাদর্শ এখানে সব থেকে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে ? উইলসন, না উনিশ বৎসবের জনৈক কিশোর শিক্ষক ?

হিন্দু কলেজের প্রধান শিক্ষক J. J. D' Anselme পূর্বেও প্রধান শিক্ষক ছিলেন, আজও আছেন। নিশ্চয়ই এই পরিবর্তনের জন্য তাঁকে সাধুবাদ আমরা দিতে পারি না। ডেভিড হেয়ারের সহযোগিতায় উইলসন পরিবর্তনের হাওয়া এনেছেন। ক্যালকাটা মন্থলি জার্নালে উইলসনের হিন্দু কলেজ সংক্রান্ত অবদানের কথা বিস্তৃতভাবে লেখা হয়। আমরা ঐ রিপোর্টটি সম্পূর্ণ তুলে দিলাম।

রিপোর্টটিতে চোখ বুলালে বুঝা যাবে উইলসনের কাজ প্রতিদিনের কাজ নয়, সাময়িক কাজ। প্রতিদিনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখতে কার আদর্শ সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী হয়েছিল ? ব্যক্তি বিষয়ের আদর্শ নয়। সিডনী কলেজ ও হিন্দু কলেজ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে গঠিত হয়, (১৬ক) ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে পরিকল্পিত হয় উইলসনের অধিনায়কত্বে এবং হেয়ারের সহযোগিতায়। পরিবর্তন নিয়ে এল নবীন পাঠক্রম এবং নবীন গ্রন্থকাবেরা। ১৮২৮ সাল থেকে নতুন ছাত্রগোষ্ঠীর সাক্ষাৎ পাচ্ছি ; নতুন পর্ব সুরু হয়ে গেছে। আগামী কালের বামপন্থী সমাজের নেতৃবৃন্দের উদ্ভব ঘটছে। এই বৎসর কৃষ্ণমোহন, রসিক, গঙ্গাচরণ, হরচন্দ্র, শিবচন্দ্র, রাধানাথ আবৃত্তিতে যোগ দিয়েছেন। ১৮২৮ সালের বার্ষিক উৎসবে কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়কে ভালভাবে দেখতে পাই। কৃষ্ণমোহন ডিরোজিওর ছাত্র ছিলেন না ; কিন্তু তাঁকেই গুরু বলে মানতেন। এই

বার্ষিক পরীক্ষায় লাল গোলাপ ও শ্বেত গোলাপদের কলহ ও তার পরিণতি সম্বন্ধে তিনি নানা তথ্য পরিবেশন করলেন। তাব থেকেও বড় খবর হোল কৃষ্ণমোহন অক্সিজেন ( oxygen ) ও নাইট্রোজেনেব মৌলিক উপাদান ব্যাখ্যা করলেন। সুন্দব আবৃত্তি করলেন। বেঙ্গল হরকরা কৃষ্ণমোহনের ভূয়সী প্রশংসা কবে লিখল—Would the spirit of Addison have been present, he would have felt that his idea of the soul had been enriched by the poetic spirit of the Hindoo child' (১৬)—কৃষ্ণমোহন ক্যাটোব স্বগতোক্তি সুন্দর ভাবে আবৃত্তি কবেছেন।

১৮২৯ সালে ছাত্রদের লেখা ছয়টি সেরা প্রবন্ধ অভ্যাগতদের শোনান হোল : প্রবন্ধের বিষয়গুলি ছিল এই—

১. বাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ শাসন বিধি ?

২. মানুষেব সদ্‌বৃত্তিসমূহেব প্রকৃত নির্ণয়কারী কে ?—দুর্ভাগ্য না সৌভাগ্য ?

৩. ইতব জন্তু নিধন কি নীতি-সম্মত ?

৪. ইউরোপীয় বা হিন্দু বিবাহপদ্ধতির মধ্যে কোনটি মানবজীবনে সুখ-সমৃদ্ধির পক্ষে প্রকৃষ্টতর ?

এছাড়াও এ বৎসর ছাত্রদের রচিত ও অঙ্কিত কবিতা ও চিত্র প্রদর্শিত হয়। ১৮৩১ সালে হিন্দু কলেজের সঙ্গে ডিরোজিওর সম্পর্ক ছেদ করতে হয়েছিল। এই বৎসরের বার্ষিক পরীক্ষা-উৎসবে তিনটি প্রবন্ধ পঠিত হয় ; তার বিষয়বস্তু হোল—

১. উত্তরাঞ্চলে বর্বরদের আকস্মিক অভ্যুদয় এবং সেই কারণে রোমক সাম্রাজ্যের বিনাশ – সভ্যতার অগ্রগতিতে এই দুই ঘটনার প্রভাব।

২. বিজ্ঞান-অনুশীলন অপেক্ষা ভদ্র সাহিত্য-অনুশীলন ব্যক্তি বিশেষ, জাতিবিশেষের কাছে অধিকতর সুখকর, হিতকর ও সম্মানজনক নয়।

৩. সামাজিক সন্তোষ উৎপাদনে ব্যক্তিগত দায়দায়িত্ব পালন ও সামাজিক দায়দায়িত্ব পালন সম-প্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র রামতনু লাহিড়ী প্রথম বিষয়টি অবলম্বনে প্রবন্ধ লিখে সাধুবাদ পান। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিষয়ের উপর লিখেছিলেন প্রথম শ্রেণীর ছাত্র রাধানাথ সিকদার এবং হরচন্দ্র ঘোষ। রাধানাথ লিখেছেন যে, ডিরোজিও তাঁকে দর্শন পাঠে উদ্বুদ্ধ করেন। (১৬ক) এই সব প্রবন্ধ লেখক সকলেই "displayed considerable reading and very respectable powers, both of composition and reasoning."(১৭)

এর পরে হিন্দু কলেজের সঙ্গে ডিরোজিওর আর কোন সম্পর্ক থাকল না। এবং এই নব-জগৎ থেকে তাঁর বিদায় নেবার তারিখটিও খুব দূরবর্তী নয়।

এই সব বিবরণের তলায় তলায় কেবল কি উইলসন উপস্থিত আছেন? ডিরোজিও কি নেই?

॥ ৩ ॥

শুধু কি বার্ষিক পরীক্ষার বিবরণীতে এই নতুন যৌবনের স্পন্দন ধরা পড়েছে? পরীক্ষা-উৎসবে প্রবন্ধ পড়ে, বিতর্কে যোগদান করে, কবিতা লিখে, কবিতা আবৃত্তি করে ছাত্ররা কেবল বুদ্ধিবৃত্তিকে শানিত করে তুলত, একথা বললে সবটুকু বলা হবে না। ১৮২৮ সনে ডিরোজিও একাডেমিক এসোসিয়েশন গঠন করেন। তিনি স্বয়ং ছিলেন ঐ সভার সভাপতি, আর উমাচরণ বসু ছিলেন সম্পাদক।

একাডেমিক এসোসিয়েশন ছাত্রদের প্রথম আলোচনা-সভা। এর ইতিহাস বিস্তৃতভাবে আলোচনা-যোগ্য। আলোচনা-সভার প্রয়োজনীয়তা কিছুদিন ধরেই উপলব্ধ হচ্ছে, তার জন্য দাবীও উঠছে। (১৮) প্রথম প্রথম কলেজেই এই সভার বৈঠক বসত, পরে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মানিকতলার বাগানবাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়, কলেজ কর্তৃপক্ষের আপত্তিতে। প্যারীচাঁদ বলেছেন ১৮২৯ বা ১৮৩০ সালে একাডেমিক এসোসিয়েশন গঠিত হয় হুগলী ওয়ার্ডস্ ইনস্টিটিউশানের গৃহে, পরে হেয়ার স্কুলে স্থানান্তরিত হয়। ডিরোজিওর মৃত্যুর পর হেয়ার ঐ সভার সভাপতি হন। সপ্তাহে একদিন বৈঠক বসত, কয়েক ঘণ্টা ধরে বৈঠক চলত। সভার শেষে হেয়ার সাহেব চাঁদিনী রাতে কত বিষয়ে না আলাপ করতেন। It was

at last proposed to establish in 1829 or in 1830, a debating club, called Academic Association at the house now occupied by the Ward's Institution....

We have alluded to the establishment of the Academic Association which afterwards was removed to Hare's School, After Derozio's resignation, Hare was elected President, The meeting were held once a week and lasted for several hours, after which Hare sometimes walked with some of the members on moonlight nights and talked on different matters." (১৮ক) প্যারীচাঁদ প্রথম এই সভার অধিবেশন কোথায় হোত, তার খোঁজ দেন নি। না দিলেও তাঁর বিবরণের সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বিবরণের খুব বেশী গরমিল নেই। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, ডিরোজিওর মৃত্যুর পর 'একাডেমিক এসোসিয়েশন' হেয়ারের স্কুলে উঠিয়া আসে। এই যুবক দল মহামতি হেয়ারকে সভাপতিরূপে বরণ করিয়া সভার কার্য চালাইতে থাকেন। দুঃখের বিষয় ১৮৪৩ সালের মধ্যে ঐ সভা উঠিয়া যায়।" (১৯) এত দীর্ঘ কাল স্থায়ী হয়েছিল কিনা তা আমরা বলতে অক্ষম। তবে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত যে স্থায়ী হয়েছিল, তার প্রমাণ হস্তগত হয়েছে। ক্যালকাটা কুরিয়েরে একাডেমিক এসোসিয়েশন সম্বন্ধে জানাচ্ছে—despite various efforts move to crush it at its bud, the spirit that animated its founder, continues to guide its operation to this day," (২০) ডিরোজিওর মৃত্যুর পরও উৎসাহী ছাত্রদের আনুকূল্যে এই প্রতিষ্ঠান কয়েক বছর টিকে ছিল। বিনয় ঘোষ লিখেছেন, "ডিরোজিওর মৃত্যুর পর এই এসোসিয়েশনের অস্তিত্ব ছিল বলে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।" ( বিদ্রোহী ডিরোজিও—পৃ ১৪৯ )। ক্যালকাটা কুরিয়েরে খবরটি ঐ ধরণের সিদ্ধান্তের প্রতিকূলতা করছে।

১৮২৮ সালে হোক, আর ১৮২৯ সালেই হোক, প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে একাডেমিক এসোসিয়েশন বাঙ্গালী সমাজজীবনে তীব্রভাবে প্রভাব

ফেলতে থাকে। ঐ সভার কার্যকলাপে উদ্বুদ্ধ হয়ে আরও অনেক আলোচনা-সভা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এশিয়া গেজেটের একটি বিবরণী 'জনবুল' পুনঃ মুদ্রিত করে। বিবরণটি গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা উদ্ধৃত করছি ঃ

The spirit of union spreads itself; and in the course of a short time a great number of literary societies have been formed in Calcutta consisting principally of the former and present leading students of the Hindu College, the school society's English Schools, and the seminary generally known by the name of Ram Mohan Roy's school. It has been ascertained upon enquiry that seven associations of this kind are now in existence, the proceedings of which are conducted exclusively in the English language. Most of them meet once a week, and some of longer intervels, for discussing questions in literature and science, and sometimes in politics, the number of members belonging to each varies from 17 to 50. At some of the societies written essays are produced, which become the subject of discussion; at one of them lectures on intellectual topics are delivered in rotation by the members and at another by the president, an East Indian gentleman of great abilities, whose name has been for some time familiar to the public ear as the auther of some interesting poems. Justice to the merits of this individual requires it to be said, that not content with a conscientious discharge of his duties as a teacher of the charge, he devotes his care and talents during a very considerable part of his time out of school, to the improvement not only of those immediately placed under his tuition, but of all such native youngmen as come within his reach. He is connected with one society only as president, but with most of the others as a member. In short,

he lends a very able and active hand in raising the intellectual character of the native youth, many of the youngmen who have enjoyed the advantage of his instructions have distinguished themselves by their proficiency. He has lately commenced a course of evening lectures in metaphysics in the rooms of the society's school at Pataldanga, which are attended by about 150 native gentlemen. He was prevented from giving these lectures in the College rooms by the interference of misplaced authority. The example thus set in English has been imitated in Bengalee literature, and two or three associations have been formed principally of persons not connected with schools above mentioned, for writing upon and verbally discussing various subjects exclusively in the Bengalee language. These combinations have been, and will, no doubt, continue to be productive of very great advantage. (২১)

এই প্রবন্ধটি থেকে আমরা জানতে পারি যে, ১/১৮৩০ সালের ডিসেম্বরের পূর্বেই একাডেমিক এসোসিয়েশনের বৈঠক কলেজ গৃহ থেকে মাণিকতলার বাগানবাড়িতে স্থানান্তরিত হয়।

২. ডিরোজিও একাডেমিক এসোসিয়েশন ছাড়া আরও অন্যান্য সভার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন ;

৩. পটলডাঙ্গার স্কুল সোসাইটির বিদ্যালয়ে নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে শুরু করেছেন। এবং ঐ বক্তৃতা শ্রবণের জন্য দেড় শত ছাত্র যোগদান করেছে।

৪. বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা তাঁরই আদেশে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ডিরোজিও প্রতিষ্ঠিত বিতর্কসভার আলোচনা-পদ্ধতি ছিল অভিনব। এই আলোচনাসভায় সর্ববিষয়ে মতামত প্রদানের স্বাধীনতা সকল সদস্যের

থাকত। যখন সভার আলোচনার বিষয়বস্তু একবার নির্বাচিত হয়ে গেল, তখন বক্তাদের দুই পক্ষ অবলম্বন করে বক্তৃতা দিতে হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা থাকত না। Their theory was that as professing inquiries after truth, they ought not to do violence to anyone's conscience, by constraining him to argue against his own settled convictions"(২২) কাজেই সবাইকে এই স্বাধীনতা দেওয়া থাকত যে তারা নিজের ইচ্ছামত যুক্তিতর্ক উত্থাপন করতে পারতেন। অনেক সময় একই পক্ষে আধ ডজন বক্তা বক্তৃতা করতেন। সভার সদস্যদের আলোচনা শেষ হলে কোন অতিথি বা অপরিচিত ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে তাঁকেও তাঁর মতামত দাখিল করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হোত। প্রধান আলোচ্য বিষয় বা তার সঙ্গে যুক্ত কোন বক্তব্য বিষয়ের ওপর মতামত দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হোত। এই আমন্ত্রণে সাড়া দেওয়া তখন ছিল একটা বিশেষ সম্মানের কাজ। যে সব মতামত এই সভায় প্রকাশ করা হোত, সেগুলিকে মজবুত করার জন্য ইংরেজ লেখকদের রচনা থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দাখিল করা হোত। ঐতিহাসিক বিষয় হলে রবার্টস ও গিবনের শরণ নেওয়া হোত, রাজনৈতিক প্রশ্ন হলে এ্যাডাম স্মিথ ও জেরেমি বেন্থাম, বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন হলে নিউটন ও ডেভি; ধর্মীয় হলে হিউম ও টমাস পেইন; দার্শনিক প্রশ্ন হলে লক, রীড, স্টুয়ার্ট ও ব্রাউন। আর সব বিষয়েই বক্তৃতা করার সময় ইংরেজী সাহিত্যের সব চাইতে জনপ্রিয় কবি বাইরন ও স্যার ওয়ালটার স্কটের রচনা থেকে ভূরি ভূরি উদ্ধৃতি ইতস্তত ব্যবহার করা হত।(২৩) একদিনকার এ বিতর্ক অনুষ্ঠানে রেবরেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডাফ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। সেদিনকার সন্ধ্যায় আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল—"নারী শিক্ষার যৌক্তিকতা"। হিন্দু কলেজের পঞ্চাশটি ছাত্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিষয়টির যৌক্তিকতা সবাই মেনে নিলেন। একজন বিবাহিত যুবক চীৎকার করে বলে উঠলেন—এটা কি সত্য নয় যে আমাদের শাস্ত্রে নারীশিক্ষা নিষিদ্ধ? খোলাখুলিভাবে না হলেও কার্যত কি নিষিদ্ধ নয়? ন্যায় ও যুক্তির দ্বারা অনুমোদিত নয়, এমন কোন অনুশাসন যদি শাস্ত্রগ্রন্থে থাকে, তবে সেই শাস্ত্রগ্রন্থকে আমি পদদলিত করি।" রেবরেণ্ড ডাফ

বলছেন, The brave words won rapturous plaudits for the speaker" (২৪) একাডেমিক এসোসিয়েশনের কার্যকলাপ কী ভাবে চলত, ও বিষয়ে আরও একজন প্রত্যক্ষদর্শী এবং সভায় অংশগ্রহণকারীর জোবানবন্দী পাওয়া যাচ্ছে। হরমোহন চ্যাট্যার্জি হিন্দু কলেজের ছাত্র। তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্রদের আচরণ ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে একটি বড় নিবন্ধ লিখে যান। তাঁর পুত্র চণ্ডীচরণ চ্যাটার্জী সেই অনূদিত নিবন্ধটি ডিরোজিওর চরিতকার টমাস এডওয়ার্ডসের হাতে তুলে দেন। এডওয়ার্ডস তাঁর গ্রন্থে ঐ লিপি থেকে অংশ বিশেষ ব্যবহার করেছেন। আমরা এডওয়ার্ডস ব্যবহৃত উপকরণ থেকে হরমোহনের দুই একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করছি। সুখের বিষয়ে রেবরেণ্ড ডাফের বক্তব্য এবং পূর্ব কথিত সংবাদ পত্রের বক্তব্যের সঙ্গে চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যের মূলত কোন পার্থক্য নেই।

ডিরোজিও বিদ্যালয়ে যে আলোচনা সভা স্থাপন করেছিলেন, তাকে প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের যোগদান করার অধিকার ছিল। ঐ সভায় কাব্য ও সাহিত্য থেকে এবং নীতি দর্শন থেকে পাঠ দান করা হতো। প্রায় প্রত্যহ ক্লাস বসবার পূর্বে বা পরে সভা বসতো। যদিও কলেজ কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতসারে বা বিনা অনুমতিতে এই সভা বসতো, তবু ঐ সব বিষয়ে সুশিক্ষিত করার কাজে ডিরোজিওর স্বার্থশূন্য উৎসাহ ও অনুরাগ ছিল অসামান্য। এমনই এই ভালবাসা ও মানবহিতৈষিতাবোধের দ্বারা তাঁর এই কার্যাবলী উদবুদ্ধ ছিল, যার কোন জুড়ি আজ পর্যন্ত মেলে না—এতকাল যতজন শিক্ষক হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা করেছেন, বা যাঁরা বিদায় গ্রহণ করেছেন, তাঁদের সকলের প্রসংগ স্মরণে রেখেই বলছি। ছাত্ররাও তেমনি তাঁকে বুক ভরে ভালবাসতো; তাঁরা তার উপদেশ অনুসারে পরিচালিত হতে চাইতো, প্রাত্যাহিক জীবনের প্রতিটি কাজে তাঁকে নকল করতে চাইতো। ছাত্রদের মনের ওপর ডিরোজিও এমনই প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলেন যে তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁর পরামর্শ ও উপদেশ ব্যতীত অগ্রসর হতে চাইতেন না। অপর পক্ষে, ছাত্রদের সাহিত্যের রুচি তিনি তৈরী করে দিতেন; পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের কুফল সম্বন্ধে তাদের অবহিত করে তুলতেন; তাঁদের নীতি-

বোধ ও নীতি-অনুরাগ তৈরি করে দিতেন, যার ফলে তাঁরা তাঁদের যুগের পিছিয়ে-পড়া ধ্যান ধারণা থেকে সম্পূর্ণ উচুঁতে প্রতিষ্ঠিত হতেন।(২৫)

হরমোহন অবশ্য অতঃপর ডিরোজিওর ছাত্রদের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় তাই বর্ণনা করেছেন। আমরা আপাতত এ বিষয়ে নীরব থাকছি।

এই সভায় কি কি আলোচনা হোত, সে বিষয়ে হরমোহন চ্যাটার্জি'র বক্তব্য অনুসন্ধান করা যাক। হরমোহন বলছেন, হিন্দু-ধর্মে'র নীতি ও আচরণবিধি খোলাখুলি উপহসিত ও নিন্দিত হোত; নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে ক্রুদ্ধ বিতর্ক হোত। হিউমের ভাবধারা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হোত, সমর্থি'ত হোত উৎসাহের সঙ্গে। অধিকাংশ বিতর্ক সভায় হিন্দু সমাজের বর্তমান হীন অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হোত। হিন্দুদের বর্তমান দুর্গতির জন্য দায়ী করা হোত তাদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার-আচ্ছন্নতাকে, উদারনীতিক শিক্ষা ব্যতীত এই দুর্গতির অবসান অসম্ভব বলে মনে করা হোত। নারী সমাজের দুর্গতিতে দারুণ ক্ষোভ প্রকাশ করা হোত। এক দিনের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, নারীদের অবশ্যই লেখাপড়া শেখাতে হবে। সভায় উপস্থিত সভ্যদের আশ্বস্ত করে বলা হয় যে, এই আন্দোলনে জনৈক নেতৃস্থানীয় সদস্যের স্ত্রী অতিশয় সুশিক্ষিতা মহিলা; তিনি নানা শাস্ত্রেই অতীব পারঙ্গম, বিশেষ করে নীতি দর্শন ( Moral Philosophy ) ও গণিতে।(২৬) নারীশিক্ষার জন্য নব্য যুবকদের এই তীব্র অনুরাগ পাদরী ডাফ সাহেবেরও মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল এ বিবরণ পূর্বে'ই দিয়েছি।

হিন্দুধর্মে'র বিরুদ্ধে নব্য যুবকদের বিষোদ্‌গার সম্বন্ধে ডাফের বিবরণীও একই প্রকার। তাঁর সাক্ষ্য উদ্ধৃত করছি "The general tone of the d scussions was a decided revolt against existing religious institutions......The young lions of The Academy roared out, week after week. Down with Hinduism ! Down with Orthodoxy,"(২৬ক)

॥ ৪ ॥

বিতর্ক সভার কার্যক্রমকে সম্পূর্ণতা দেবার জন্য এল পত্রিকা পার্থেনন। ইতিপূর্বে এক মাত্র Parental Academic Instituton থেকে Juvenilia নামে ছাত্রদের দুই খণ্ড রচনা সংকলন প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালী ছাত্রদের রচনা বক্ষে ধারণ করে এই প্রথম পত্রিকা প্রকাশিত হোল। ১৮৩০ সনে ১৫ ফেব্রুয়ারী প্রথম সংখ্যা* মুদ্রিত ও বিতরিত হয়; দ্বিতীয় সংখ্যা মুদ্রিত শুধু হয়েছিল। "পার্থিনন নামক ইংরেজী ভাষায় এক সমাচার পত্র সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছিল তাহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হইলে পাঠক বর্গের গোচরার্থ গত ১২ই ফাল্গুন চন্দ্রিকায় আলোক করা গিযাছে ঐ কাগজের তৎ প্রকাশকেব নাম প্রকাশ হয় নাই কিন্তু কএকজন হিন্দু বালক যাঁহারা উত্তমরূপে ইংরেজীবিদ্যায সুশিক্ষিত হয়েছেন তাঁহাবদিগেব দ্বারা প্রস্তুত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে এমত জ্ঞান হওয়া গিয়াছিল অপর সেই কাগজে এতদ্দেশীয়দিগেব আরাধনা আচার বিচার ব্যবহারাদি বিষয়ে দোষোল্লেখ করণে তৎপ্রকাশকদিগেব অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছিল কিন্তু ধর্মের প্রভাবে বালকদিগের বালকত্ব প্রকাশ হইতে পারিল না কেন না বালকেরা প্রায় সর্বদাই কুকর্মে প্রবৃত্ত হয় পিতা পিতা মহাদি প্রতিপালক বা শিক্ষকের বিজ্ঞপ্তি হইলে অবশ্যই তৎকর্মে নিবারিত ও তাড়িত হয় পার্থিনন পত্রেব বিষয়ে তাহাই হইয়াছে অর্থাৎ আমরা

*অধ্যাপক সুশোভন সরকার লিখেছেন, "Derozio started an Academic association with a monthly organ, the Athenium, in which a pupil Madhab Chandra Mallik difiantly proclaimed that he and his friends hated Hinduism from the bottom of their hearts." পরবর্তীকালে তিনি 'Derozio and young Bengal' প্রবন্ধে পার্থেনন পত্রিকার নাম বলেছেন; তবে বন্ধনীর মধ্যে Athenium এর নামও উল্লেখ করেছেন শাস্ত্রী মহাশয়ের মত হিসাবে। Athenium নামে ইয়ং বেঙ্গলদের কোন পত্রিকা ছিল না; মাধবচন্দ্র মল্লিক উক্ত পত্রিকায় তার ঐ অতিখ্যাত মন্তব্য রাখেন নি। এ ক্ষেত্রেও শাস্ত্রী মহাশয় সরকার মহাশয়ের ভ্রান্তির কারণ। শাস্ত্রী মহাশয় আবার এডওয়ার্ডসকে অনুসরণ করে বিভ্রান্ত হয়েছেন।

জানিলাম ধর্মসভা জনিত ভয়ে ভীত হইয়া বালকেরা ঐ কাগজ করিতে নিবস্ত হইয়াছে ইহাতে পার্থিননের যেমন উত্থান অমনি পতন হইল।"(২৬খ)

সমাচাব পত্রিকা শুধু নিন্দাবাদই করে তৃপ্ত হয় নি ; এবং পত্রিকার প্রচার বন্ধ হলে তাব মনেব আনন্দ চেপে বাখতে পারে নি। কিন্তু উক্ত পত্রিকায় কি কি বিষয় স্থান পেযেছিল, সে খবর তাবা দক্ষতাব সঙ্গেই চেপে বেখেছে।

প্রবন্ধগুলি যে সুলিখিত ছিল, এ বিষয়ে প্রথম মুখ খোলে 'জনবুল', হিন্দু কলেজের জনৈক ছাত্রের ইংরেজী কাব্য-সংকলন (কাশীপ্রসাদেব) সমালোচনা করতে গিযে বলল—"The capacity of many of the native youths to write English prose may be judged from the specimens which were published in the first and unfortunately the only number of the much regretted Parthenon,'' (২৬গ) তবে জনবুল কি কি প্রবন্ধ পার্থিননে বের হয়েছিল এ বিষযে নীরব থাকে।

পরবর্তীকালে ডিরোজিওব ভাবশিষ্যদের পরিচালিত 'বেঙ্গল স্পেকটেটবে'র (১৮৪২—১৮৪৩) ১ম খণ্ড ৭ম সংখ্যায় পার্থেনন পত্রিকাব বিষযসূচী সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। অদ্যাবধি এ ক্ষেত্রে বেঙ্গল স্পেকটেটরের বিবরণই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। ......"The first native paper in English The Parthenon was put forth under his auspices. The first number advocated the cause of colonisation, and that of Female Education. It condemned the superstition of the Hindoos and prayed for cheap justice. It startled the orthodox Hindoos and their might and influence crushed it in the bud. The second number was in type, although it was never circulated.'' (২৬ঘ) নারীশিক্ষা, বিচারব্যবস্থার সহজ-লভ্যতা প্রভৃতি নিয়ে ডিরোজিওপন্থীরা, পরবর্তী যুগেও আন্দোলন করেছেন। তবে 'কলোনাইজেশন' বা 'উপনিবেশীকরণ' সম্বন্ধে তাঁদের মতামত পরবর্তী-

কালে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। জ্ঞানান্বেষণ উপনিবেশিক অধিকার মঞ্জুর করার বিরোধিতাই করেছিল।

বেঙ্গল স্পেকটেটর ইংরেজী ভাষায় পার্থেননকে সর্ব প্রথম ভারতীয় পত্রিকা বলে অভিহিত করেছে। কথাটা স্বজনতোষণ নয়। দ্বারকা-নাথের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হতে পারে। দ্বারকানাথ বিভিন্ন পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু সম্পাদকীয় কাজে কোন সহযোগিতা করেন নি। আর প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'রিফর্মার' পরবর্তী পত্রিকা। 'বেঙ্গল হেরাল্ডে'র কর্তৃত্বভার গ্রহণও পরবর্তী ঘটনা। ১৮৩০ সনের মার্চ মাসেই পার্থেননের অপমৃত্যু ঘটল; কারণ "The good old man took fright and the sound of alarm was trumpetted by the Chundrica, the organ of the orthodox". Bengal Spectator, vol I No 7. এই 'Good old man' হলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। পার্থেনন ইণ্ডিয়া গেজেট মুদ্রাযন্ত্র থেকে ছাপা হোত; সাপ্তাহিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হবে বলে স্থিরীকৃত হয়েছিল। সমাচার দর্পণ তার প্রশংসা করেছিল—"তাহার প্রথম সংখ্যার কাগজে যে কএক প্রকরণ লিখিত আছে তাহা অতি সম্ভাবযুক্ত রচিত এবং তাহাতে তল্লেখকের ইংরেজী পুস্তকের অতিশয় চর্চার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দৃষ্ট হইতেছে।" ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৩০। ইণ্ডিয়া গেজেটে (১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৮৩০) বলা হয়েছিল, পার্থেনন হলো "a specimen of what Hindu by birth yet European by education, could do,"(২৭) সম্ভবত এই সব প্রশংসাও ঐ পত্রিকার পক্ষে ভাল হয়েছিল। রিফর্মার ১৮৩১ সনে ৫ই ফেব্রুয়ারী আত্ম-প্রকাশ করে; এনকোয়ারার ১৭ই মে আর জ্ঞানান্বেষণ ১৮ই জুন প্রকা-শিত হয়। ডিরোজিওর স্ব-সম্পাদিত পত্রিকা ইষ্ট ইণ্ডিয়ানের প্রকা-শনার তারিখ ১৬ই মে, ১৮৩১। কাজেই পার্থেননের প্রথম পত্রিকার গৌরব অক্ষুন্ন থাকছে।

হিন্দু কলেজের ছাত্ররা দুই দুখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তখন আর তাঁরা কলেজের ছাত্র ছিলেন না। কাজেই সে পত্রিকা বন্ধ করে

দেবার সাধ্য কলেজ কর্তৃপক্ষের ছিল না। ঐ বৎসর ২৩শে এপ্রিল হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিও বিদায় গ্রহণ করেন। তার চব্বিশ দিনেব মাথায় এনকোয়ারার আত্মপ্রকাশ করে। বলা বাহুল্য পত্রিকা প্রকাশনায় গুরু ডিরোজিওর আশীর্বাদ তাঁরা পেয়েছিলেন; আনুকূল্যও পেয়েছিলেন।

ডিরোজিওর পদত্যাগে নব্যদল দুঃখ পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা হতোদ্যম হন নি। একাডেমিক এসোসিয়েশনের কার্যকলাপ বন্ধ হয় নি। বরং নব্যদল নানা কাজে আরও গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করল। ডিরোজিও বিশ্বাস করতেন, "useful knowledge should precede amusement".

সেই সূত্রেই হিন্দু কলেজের ছাত্রদের যজ্ঞসূত্র। তাঁরা স্কুল সভা-সমিতি সংগঠন ও পত্রিকা প্রকাশনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করলেন।

মাধবচন্দ্র মল্লিক, রাধানাথ পাল ও গঙ্গাচরণ সেন হিন্দু ফ্রী স্কুল স্থাপন করেন। শারদাপ্রসাদ বসু হিন্দু বেনেভোলেণ্ট ইনস্টিটিউশন স্থাপন করেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক স্কুল স্হাপনার কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন।

রামমোহন রায় পরিচালিত 'সম্বাদ কৌমুদী'তে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের এই সব শিক্ষাবিষয়ক কর্মপ্রয়াস সপ্রশংস উল্লিখিত হয়েছে। এমন কি এই ব্যাপারে এনকোয়ারারের অভিমত উদ্ধৃত কবে তার পোষকতা করা হয়েছে।

হেয়ার স্কুলের শিক্ষক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'এনকোয়ারার' পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার প্রকাশনার অনুমতিপত্র গ্রহণ করতে গিয়েই তিনি পুলিশ অফিসে গংগাজল স্পর্শ করে শপথ নিতে অস্বীকার করেছিলেন; অস্বীকৃতির কারণ হিসাবে তিনি বলেছিলেন যে তিনি হিন্দুধর্ম মানেন না। (২৮)

পরবর্তীকালে জুরী হিসাবে শপথ গ্রহণ করতে গিয়ে রসিককৃষ্ণ মল্লিক গংগাজল স্পর্শ করতে অস্বীকার করেছিলেন।

এনকোয়ারারের আত্মপ্রকাশের একমাস পরে দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা প্রকাশ করলেন। জ্ঞানান্বেষণ

ছিল প্রথমে কেবল বাংলা পত্রিকা, পরে দ্বিভাষিক হয়। কর্মচ্যুত হওয়ার পূর্বে এবং পরে ডিরোজিও কখনও কখনও বেঙ্গল ক্রনিকল, বেঙ্গল হরকরা, হেসপেরাস প্রভৃতি বিভিন্ন পত্র পত্রিকার সাংবাদিকতা করেছেন। হেসপেরাস পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে তিনি 'ইষ্ট ইণ্ডিয়ান' নামে এক স্বতন্ত্র পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই কারণে হেসপেরাসের পরিচালকবর্গ ক্ষোভ প্রকাশ করেন।* হেসপেরাস এপ্রিল মাসের পরে ডিরোজিওর ওপর নির্ভর করে আত্মপ্রকাশ করে। এটি ছিল একটি ক্ষুদে সান্ধ্য পত্রিকা। (২৯)

বেঙ্গল ক্রনিকলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। কারণ পুরস্কার বিতরণী সভার বিবরণটি তাঁর লেখা। হেয়ারের এমন রেখাচিত্র আর দ্বিতীয়বার কেউ আঁকেন নি। এনকোয়ারার পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে স্বয়ং ডিরোজিও জড়িত ছিলেন বলে কেউ কেউ অনুমান করেছেন। বিশেষ করে প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধটি তার লেখনী নিঃসৃত বলে কারও কারও ধারণা।

"গত ১৭ই মে অবধি এনকোয়ারার নামে ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষায় সম্বাদপত্র এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত অল্প বয়স্কদের দ্বারা প্রকাশারম্ভ হইয়াছে তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান সম্পাদক হন তৎপত্রের ভূমিকার শেষভাগ অবলোকনে আমরা বোধ করিলাম যে পত্রের প্রথম ভাগের লিখিত সম্পাদকের স্বীয় উক্তি ব্যতীত প্রায় সমুদয় তৎপত্রস্থিত বক্তৃতা এতদ্দেশীয় হিন্দু বালকেদের দ্বারা রচিত হইয়াছে এবং রচকেরদের বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ বৎসরের উর্দ্ধে নহে ইহাতে আমরা অবশ্যই আহ্লাদিত হইলাম এবং তাঁহারদের এতাবৎ অল্প বয়সে যে এরূপ বিদ্যা জন্মিয়াছে ইহাতে বিশেষ অনুরাগ করিলাম।"

* অধ্যাপক সুশোভন সরকার তাঁর "Bengal Renaissance and other Essays" নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে ডিরোজিও ভাগলপুর থেকে ফিরে হেসপেরাস ও ক্যালকাটা লিটারারী গেজেটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, হরকরাতেও লিখতেন। আর হেসপেরাস ১৮৩১ সনের পূর্বে আত্মপ্রকাশ করে নি।

সম্বাদ কৌমুদীর প্রশংসালাভ করলেও এনকোয়াবার নরমপন্থী কাগজ ছিল না। প্রথম থেকেই এনকোয়ারার ছিল উগ্র মতবাদের পরিপোষক।

"Having thus launched our bark under the denomination of Enquirer, we set sail in quest of truth and happiness." (৩০)

সত্য ও সুখের সন্ধান সে পেয়েছিল কি না জানি না। কিন্তু মাত্র তিন বৎসরের আয়ুষ্কালে নানা বিতর্কের উদ্ভব ঘটিয়েছিল বা জড়িত হয়ে পড়েছিল এনকোয়ারার। হিন্দু সমাজের নানা আচার অনুষ্ঠান, সংস্কার ও প্রথার বিরুদ্ধে এখানে অবিরত লেখনী পরিচালিত হয়েছে। সতীদাহ প্রথা, বহুবিবাহ, চড়ক পূজা, হিন্দু বিবাহ বিধি, পৌত্তলিকতা, দুর্গাপূজা উপলক্ষে আমোদ প্রমোদ, ভুয়া সন্ন্যাসী বৃত্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে ঐ পত্রিকায় একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক বিষয়েও প্রবন্ধ লিখিত হোত। মফঃস্বল আদালতে দুর্নীতি, ভারত আইনের ৫ম বিধি, সংবাদপত্রের ডাকমাশুল, সরকার কর্তৃক জমিদারী ক্রয়, দেশীয় গ্র্যাণ্ড, জুরি প্রথা প্রবর্তন প্রভৃতি প্রশ্নের সরকারী নীতি সমালোচিত হয়।

আবার শুধু নেতিবাচক বা সমালোচনামূলক নিবন্ধ প্রকাশ হোত, তা-ই নয়। নানা বিষয়ে সমর্থনসূচক প্রবন্ধও প্রকাশিত হোত। চুঁচুড়ায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অভিনন্দন জানান হোল, সংগঠকদের সাধুবাদ দেওয়া হোল। হিন্দুদের উন্নতির কোন পথ, এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। হিন্দু কলেজের কার্যকলাপ, ডেভিড হেয়ারের তৈলচিত্র প্রস্তুতকরণ; মিশনারীদের স্কুল স্থাপনা প্রভৃতি বিষয়ে এই পত্রিকার উৎসাহব্যঞ্জক সমর্থন উল্লেখযোগ্য।

হিন্দু ফ্রী স্কুলের ত্রিমাসিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানে ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিও, রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও দক্ষিণানন্দ মুখার্জী সহ এনকোয়ারার সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন। এই পরীক্ষার এক বর্ণনা এনকোয়ারারে ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৩১ প্রকাশিত হয়। যে বক্তব্য এই প্রবন্ধে ভাষা পেয়েছে, তা অবশ্য স্মরণযোগ্য। এই প্রবন্ধে গ্রন্থকার বললেন হিন্দু কলেজ থেকেই

এই জ্ঞানের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে এবং কুসংস্কার ও অজ্ঞতার দুর্গ ধ্বসে পড়ছে।

The Hindoo Free School was first planned by a young gentleman with the pure motive of communicating instruction to the native youth. The small fund has been raised by subscription for its support, added with patriotic spirit with which its teachers have voluntarily given their assistance to it, without any desire of gain....

The natives have been hitherto indebted to European charity for education, they have had hitherto no Schools to attend but such as were established by the benevolence of the foreigners. Time has produced a happy change ; they now see in their countrymen images of brethren ; they now feel the duty they owe to their country.

তারপর আন্দুল প্রভৃতি স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করে বলা হলো—'It is a pleasing incident that all these institutions have been projected and are materially assisted by the exertions of young men whose youth would never create in the philosopher any expectation of what they are realizing. These considerations must be extremely gratifying to the feelings of a Philanthropist, and should produce happy conceptions in the minds of a Hindoo. The spirit of liberalism has been wide by diffused, and, that the march of intellect will now be retarded is far from probable. When upwards of three thousand boys are receiving systematic instruction in the refined language of England we have nothing but hope upon our side. The rays that have emanated from the Hindoo College and that are now diverging to

other places must eventually dissipate the mists of ignorance and superstition. When knowledge once begins its march, it cannot, without the greatest difficulty, be retarded in its progress. Prejudice and bigotry are hostile to truth, and, therefore, to knowledge; they cannot reign for any length of time.'(৩১)

প্রবন্ধকার রক্ষণশীলদের প্রতি একেবারে জেহাদ ঘোষণা করলেন।

The liberal, although now prosecuted by the brutal tyranny of the priest craft, will soon have occasion to seal his triumph in the overthrow of ignorance. Proud shall we be of such a day; and all the pains, all the troubles we are at present undergoing wll be lost in the high satisfaction we shall feel at the triumph of knowledge over ignorance; of civilisation over barbarism of TRUTH over falsehood!"(৩২)

এ রচনা অতীব উত্তেজিত (বা উদ্বুদ্ধ) যুবকের রচনা এবং এনকোয়ারারের এই বক্তব্যও সম্বাদ কৌমুদীর প্রশংসাবাদ অর্জন করেছিল।

"এতদ্দেশীয় মহাশয় কর্তৃক এতদ্দেশীয়েরদের বিদ্যাদান বিষয়ে এনকোয়ারারে অত্যুত্তম লিখিয়াছেন। তৎপত্র সম্পাদক লেখেন যে, ইহার পূর্বে কেবল ইউরোপীয় লোকেরদের বদান্যতাতেই এতদ্দেশীয়েরদের বিদ্যাভ্যাস হইত। হিতৈষী বিদেশীয়েরদের কর্তৃক স্থাপিত বিদ্যালয় ব্যতিরেকে অপর কোন বিদ্যালয় ছিল না কিন্তু কালক্রমে মহা রূপান্তর হইয়াছে। এইক্ষণে এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা স্বদেশীয়েরদের উপকারার্থ যাহা কর্তব্য তাহা তাঁহারা সুজ্ঞাত হইয়াছেন।'(৩৩) (সংবাদ কৌমুদী ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৩১)। কাজেই সংস্কারমূলক কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা ছিল।

জ্ঞানান্বেষণ ১৮ই জুন আত্মপ্রকাশ করে ; জ্ঞানান্বেষণ তার মুখবন্ধে বাংলা ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করে। 'এক প্রয়োজন এই যে এতদ্দেশীয় বিশিষ্ট বংশোদ্ভব অনেক মহাশয়েরা লোকের প্রপঞ্চ বাক্যতে প্রতারিত হইতেছেন তাহাতে তাঁহারদিগের কোনরূপেই ভাল হইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া খেদিত হইয়া বিবেচনা করিলাম নানা দেশ প্রচলিত বেদ বেদান্ত প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা দ্বারা তাঁহারদিগের ভ্রান্তি দূর করিতে চেষ্টা করিব।

দ্বিতীয়তঃ এই যে এতদ্দেশনিবাসী অনেকেই আপন২ জাতিবিহিত ধর্মের প্রতি জিজ্ঞাসা করিলে যথাশাস্ত্রানুসারে কহিয়া থাকেন কিন্তু সেই মহাশয়েরা এমন কর্ম করেন যে তাহা কোন বিশিষ্ট লোকেরই কর্ত্তব্য নহে ইহার কারণ কি তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে। তৃতীয় এই যে ভূগোল প্রভৃতি গ্রন্থ যদ্যপি এতদ্দেশে দেশান্তরীয় ও বঙ্গদেশীয় ভাষায় নানা প্রকারে প্রকাশ হইয়াছে তথাপি সে অতি বিস্তারিত রূপে প্রচার হয় নাই অতএব সকলের আশুবোধের নিমিত্তে সেই সকল গ্রন্থ আমরা বঙ্গদেশীয় ভাষায় ক্রমে ২ প্রকাশ করিব। এবং অন্য ২ বিষয় যাহা প্রকাশ করা আবশ্যক তাহাও উপস্থিতানুসারে প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না।' ইতি" (৩৪ক)

স্বভাবতই জ্ঞানান্বেষণের এই বক্তব্য পরবর্তীকালে বদলে গেল, যখন রসিককৃষ্ণ মল্লিক সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। তখন থেকে জ্ঞানান্বেষণ দ্বিভাষিক পত্রিকারূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় প্রশ্নে জ্ঞানান্বেষণ সুস্পষ্ট অভিমত ঘোষণা করতে থাকে।

পত্রিকার লেখকদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, মাধবচন্দ্র মল্লিক, তারকচন্দ্র বসু, প্যারীচাঁদ মিত্র ও রামচন্দ্র মিত্র প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। এঁরা সকলেই ডিরোজিওর শিষ্য ; ডিরোজিওর ভাবধারাকেই জনপ্রিয় করে তোলার 'প্রয়াসী' হয়েছেন। জ্ঞানান্বেষণ ১৮৪০ সনে নবেম্বর মাসে বন্ধ হয়ে যায়। জ্ঞানান্বেষণের পরিচালকবর্গ অচিরেই আর একখানি পত্রিকা প্রকাশ করলেন, তার নাম Bengal Spectator—১৮৪২ সনে এপ্রিল মাসে প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এ

পত্রিকাও ছিল দ্বিভাষিক। কিন্তু এ পত্রিকাও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। তবে বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার ইতিবৃত্তে এর একটা স্থান আছে। এই প্রথম বিধবাবিবাহের পক্ষে বিদ্যাসাগর ব্যবহৃত শ্লোকটি—'নষ্টে মৃতে' ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয়ত এই পত্রিকা থেকে শুধু রাজনৈতিক উৎকণ্ঠা নয়, রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য সরাসরি সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া হয়।

এই যুগের হিন্দু কলেজের অন্যান্য ছাত্রও একই প্রেরণায় নানা পত্র পত্রিকা প্রকাশ করেছেন, তন্মধ্যে সম্বাদ সার সংগ্রহ, জ্ঞানোদয়, বিজ্ঞান সেবধি, বিজ্ঞান সার সংগ্রহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ ৫ ॥

ডিরোজিওর ভাবধারা তাঁর ছাত্রদের মাধ্যমে অবশ্যই প্রচার লাভ করে। ডিরোজিও নিজেও নানা বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, কবিতায় ও চিঠিপত্রে তাঁর মনোজগতের নানা খবর ছড়িয়ে রেখে গেছেন। ডিরোজিওর পূর্বে নব্য জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচারে কেউ যে ব্রতী হন নি, একথা বলা যায় না। স্যার উইলিয়াম জোন্সের প্রসঙ্গ বাদ দিলাম। কিন্তু এসিয়াটিক সোসাইটির নানা সদস্য এক্ষেত্রে প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। বিশেষ করে ডঃ ওয়ালিক, ও ডঃ ও' শগনেশি জীববিদ্যা উদ্ভিদবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে নানা বক্তৃতা দিয়ে ও প্রবন্ধ লিখে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জগতের সীমাবদ্ধতা হ্রাস করে দিচ্ছিলেন। সেই ১৭৯০ সনে ডঃ ডিনউইডি বিদ্যুৎশক্তি বিষয়ে তাঁর প্রথম বক্তৃতা দেন। (৩৪খ) (ক্যালকাটা গেজেট, ৪ ডিসেম্বর, ১৭৯০) এ ছাড়া দুই একজন সাংবাদিক এবং সিভিলিয়ান কর্মচারীও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। ক্যালকাটা জার্নালের জেমস সিল্ক বাকিংহাম হিকীর গেজেটের মত পরচর্চা করতে এদেশে আসেননি। জ্ঞানচর্চার জন্যই এসেছিলেন। তাই অতীব দ্রুততার সঙ্গে তাঁকে বলপূর্বক এ দেশ থেকে বিতাড়িত করা হোল। জেমস ইয়ং ছিলেন জেরেমি বেন্থামের সঙ্গে পরিচিত, তিনিই রামমোহনকে বেন্থামের দৃষ্টিপথে নিয়ে আসেন; বেন্থাম রামমোহনকে এক চিঠিতে এই বলে সম্বোধন করেন "intensely admired and dearly beloved collaborator in the service of mankind"

রামমোহনের একেশ্বরবাদ বেন্থামের মতে ইউরোপীয় প্রভাবজাত—Rammohan Roy has cast off thirty five millions of Gods, and has learnt from us to embrace reason in the all important field of religion".(৩৫) (The works of Jeremy Bentham—J. Browning (Edited) 1843. Vol. X. 571)

রামমোহনের প্রভাবে দ্বারকানাথ, প্রসন্নকুমার, চন্দ্রশেখর দেব, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রভৃতি নব্য জ্ঞানবিজ্ঞানের উপাসক হয়ে উঠেন। ১৮২৪ সনেই লাসিংটন লিখছেন--বিদ্যালয় ( অর্থাৎ হিন্দু কলেজ ) প্রতিষ্ঠার কারণ নব্য শিক্ষার জন্য হিন্দুদের ব্যাকুলতা। যে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তারা শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়েছে, তা আগে কখনও দেখা যায় নি। হিন্দু চরিত্রের এই পরিবর্তন নতুন। "The establishment among themselves of the Vidyalaya manifests an anxiety for the dissemination of knowledge, highly creditable to the wealthy and respectable Hindoo, who were concerned in it, and the readiness with which they have admitted European co operation, displays a degree of liberality, for which our former acquaintance with the Hindoo character had not prepared us". (৩৬)

লাসিংটন শুধু এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হননি; ১৮২৪ সনের মধ্যে হিন্দু যুবকদের মধ্যে ধর্মীয় চিন্তায় যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছিল, তারও উল্লেখ করেছেন।

"Indeed, it would appear that a great revolution has taken place among that class, for the Rev. Mr. Adam states that "a native gentleman on whose authority he can rely, computes that about one tenth of the reading native population of Calcutta have rejected idolatry, and of these his informant supposes about one third have rejected revelation altogether, though a few of them profess to do so, and the remaining two thirds are believers in the divine revelation of the Vedas."(৩৭)

শুধু ধর্মীয় মতামতে নয়, শুধু মনোজগতে নয়, বাহ্যজগতে, গৃহ সজ্জায়, বেশভূষাতেও পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। বিশপ হিবারের সেই পরিবর্তিত চিঠিখানি এখানে উদ্ধৃত করা গেল—"……at present there is an obvious and increasing disposition to imitate the English in everything, which has already led to very remarkable changes…. The wealthy natives now all affect to have all their houses decorated with corinthian pillars, and filled with English furnitures. They drive the most dashing carriages in Calcutta. Many of them speak English fluently, and are tolerably read in English literature and the children of one our friends I saw one day dressed in jackets and trousers with round hats, shoes, stockings. Among the lower orders the same feeling shows itself more benificially, in a growing neglect of caste—is not merely a willingness, but an anxiety to send their children to our schools, and a desire to learn and speak English.'(৩৮) ( Bishop Heber's letter to R. J Wilmost Horton—1823 )

সেকালের কাগজপত্রে দুই একজনের নামও পাওয়া যায়—হরিমোহন ঠাকুর বেশভূষায় ছিলেন পুরোদস্তুর সাহেব ; তাঁর গৃহ সজ্জাও ছিল বিদেশী শাস্ত্র সম্মত। রাজা রামলোচন তো একবার তাঁর এ্যাটর্নির দপ্তরে ইউ-রোপীয় পোষাক পরিহিত অবস্থায় উপস্থিত হয়ে সবাইকে হকচকিয়ে দিয়ে-ছিলেন। সে তো ১৭৮০ সালেরই কথা। (৩৯) ( Good old days of Hon'ble John Company—W. H. Carey)

কাজেই হিন্দু কলেজের ছাত্রদের বিদেশী পোষাক পরিধান ও বিদেশী খানাপিনা আস্বাদন, এমন কি বিদেশী বুলি উচ্চারণ অভিনব ব্যাপার নয়। সমাচার চন্দ্রিকা এবং সংবাদ প্রভাকরের সমালোচনা এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যভ্রষ্ট ; সমালোচনার আসল হেতু হোল তাদের জীবন দর্শনের পরিবর্তন। ডিরো-জিওর পূর্বে বাংলার ভাব জগতে এমন আলোড়ন আর দেখা যায় নি।

কুসংস্কার আর কুপ্রথার বিরুদ্ধে ডিরোজিও এবং ডিরোজিওপন্থীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তাঁরা ঈশ্বর মানেন না, এ কথা বলেন নি; তারা ঈশ্বর সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসু। রামমোহন থেকে এইখানে তাঁদের পার্থক্য; তাঁরা শুধু সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা করেন নি। বিধবাদের বিবাহ দানের প্রস্তাব করেছেন। অধিকন্তু তাঁরা হিন্দু বিবাহবিধি সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন। (১৮) কিন্তু হিন্দু পরিবার প্রথা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলেন নি। বরং দক্ষিনানন্দ পিতার সঙ্গে মতবিরোধের দরুণ গৃহত্যাগ করলে ডিরোজিও তাঁকে বুঝিয়ে সুজিয়ে ঘরে ফিরিয়ে দেন।

তাঁরা যুক্তির মহাপটে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা য়ুরোপীয় তথা আধুনিক যুক্তিবিজ্ঞান কেবল মাত্র পড়ুয়ার মনোভাব নিয়ে পড়েননি। ডিরোজিওর কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি ছাত্রদের এই বিশেষ রুচি তৈরী করে দিয়েছিলেন। লকের গ্রন্থাবলী পড়ে রামগোপাল বলেছিলেন, "লকের মস্তক প্রবীনের ন্যায় কিন্তু রসনা শিশুর ন্যায়।"(৪০) নিঃসন্দেহে এই উক্তি স্মরণীয় উক্তি, কিন্তু তিনি যখন পিতামহের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে পিতার কাকুতি মিনতিতে বলেছিলেন, "আপনার অনুরোধে আমি সর্ববিধ কার্য করিতে এবং ক্লেশ সহিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু মিথ্যা বলিতে পারিব না।" তখন তাঁর আবাল্য লক-চর্চা যে শুধু পড়ুয়ার চর্চা নয়, তা বুঝতে পারি। "বৃদ্ধ বয়সেও জননীর সন্নিধানে আসিলে শিশুর মত হইয়া যাইতেন। অথচ মাতার অনুরোধেও নিজের হৃদয়স্থিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে পুরাতন রীতি অনুসারে একটি আট বা দশ বৎসর বয়স্কা বালিকাকে বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই।" (৪১) ইনি হলেন রাধানাথ শিকদার। তাঁর 'প্রিন্সিবিয়ো' পাঠ যে বিলাস নয় অনুভব করতে পারি। যেদিন জননীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধে বালকের এই উক্তি শ্রবণে "এ দিকে তো বলা হয় কিছুই মানি না, ওদিকে শ্রাদ্ধ কর্তে বসা হয়েছে, পৈতাটি বেশ ঝুলছে, বামনাই দেখান হচ্ছে।" রামতনু মর্মান্তিক লজ্জা পেলেন, তখন জীবন ও যুক্তির মধ্যে মেলবন্ধন ঘটল। (৪২) আদালতে দাঁড়িয়ে রসিককৃষ্ণ যেদিন বললেন, আমি গঙ্গা মানি না, সেদিন তাঁর স্পর্ধা নবীন বয়সের স্পর্ধা ছিল না, ছিল সত্যের স্পর্ধা, যুক্তির স্পর্ধা। (৪৩) সংবাদ পত্রে যখন এই ঘটনা

উপলক্ষ করে বলা হোল যে, তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, ধর্ম মানেন না, এই উক্তি করেছেন তখন তিনি প্রতিবাদ করে জানালেন"………আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই যে, কোন ধর্মেই আস্থা নাই, একথা আমি বলি নাই। অন্য পক্ষে আমি বিচারপতির নিকট স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়া ছিলাম—ঈশ্বরের কাছে আমার পবিত্র দায়িত্ব আছে এই জ্ঞানেই আমি এ জগতের কার্য করি।" (৪৭) ( Asiatic Journal 1835. May-August. Bengal Hurkaru থেকে উদ্ধৃত।) উইলসনকে লিখিত পত্রে ডিরোজিও ঠিক একই মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন –"ছাত্ররা যদি কেউ নাস্তিক হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য যেমন নিন্দাবাদ আমার প্রাপ্য, তেমনি যারা আস্তিক হয়েছে তাদের জন্য সাধুবাদও আমার প্রাপ্য। (৪৫) এই কারণেই হরমোহন চ্যাটার্জী লিখেছেন, হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা সত্যের উপাসক। কলেজ "বালক" সত্যের প্রতিশব্দ।

হরমোহনের এই ভাষণ গুণমুগ্ধ ছাত্রের ভাষণ হতে পারে, কিন্তু এর সঙ্গে ইতিহাসের অনাত্মীয়তা নেই। সমসাময়িক বিবরণ এর পাশে এসেই দাঁড়াবে।

লাসিংটনের বিবরণে বা 'গুড ওল্ড ডেজ অব অনারেবল জন কোম্পানী'তে সেকালের জীবন চর্চার যে পরিবর্তনের সংবাদ আছে, তার সঙ্গে এই পরিবর্তন মিলিয়ে পড়লে বুঝা যাবে, এ শুধু পোষাক পরিচ্ছদের নবীনত্ব নয় বা ঈশ্বর অবিশ্বাস নয়। এনকোয়ারারে তার নিদর্শন আছে। (৪৬) ডিরোজিওর পদত্যাগ পত্রেও তার কবুল আছে। (৪৭)

"Come then. ye friends of the Hindoos, and jointly, hail the approach of what is conducive to the interests of a nation and the civilisation of man. Welcome Truth, knowledge. Virtue and therefore happiness.' (৪৮)

"If it be wrong to speak at all upon such a subject, I am guilty; but I am neither afraid, nor ashamed to confess having stated the doubts of philosophers upon this head,

because I have also stated the solution of these doubts. Is it forbidden anywhere to argue upon such a question? If so, it must be equally wrong to adduce an argument upon either side. Or is it consistent with an enlightened notion of truth to wed ourselves to only one view of so important a subject, resolving to close our eyes and ears against all impressions that oppose themselves to it? (৪৮ক)

॥ ৬ ॥

রামমোহনপন্থীদেব সঙ্গে ডিরোজিওর নানা প্রসঙ্গে দৃষ্টিভিন্নতা ছিল। রামমোহন যুক্তিবাদের সঙ্গে পরমার্থবাদকে মিলিয়েছিলেন যেমন মিলিয়েছিলেন জন লক, নিউটন, এবং পরবর্তীকালে ফেনিলন (Fenelon)। কিন্তু যুক্তির মুক্তি কতটুকু এগুলে সম্পূর্ণ হবে, বা আদৌ তার শেষ আছে কিনা, এটা দার্শনিকরাও ভেবে কূল কিনারা করতে পারেন নি; ডিরোজিও দার্শনিক নন, বেঁচে থাকলে কি হতেন, বলতে পারি না। কিন্তু তিনি কোন সত্য প্রতিষ্ঠা করেন নি; জ্ঞানতত্ত্বে নতুন কোন অঙ্গীকার তিনি আনেন নি। এমন কি নতুন কোন পদ্ধতিবিজ্ঞানও (Methodology) তিনি গড়ে তোলেন নি। তিনি পড়তেন, জানতেন, বুঝতেন এবং তা প্রচার করতেন। তিনি জন লক পড়েছেন। তার বিরোধী অন্তর্বাদী দর্শনও তিনি পড়েছেন। আবার লকের পরিণতি হিউমে যতটুকু হয়েছে, সে খোঁজও মর্মজ্ঞের মত রাখেন। ফরাসী দার্শনিক গোষ্ঠীর যাঁরা লকের অনুসারী ডিরোজিও তাঁদের সঙ্গে পরিচিত। যাঁরা ব্যতিক্রম ডিরোজিও তাঁদেরও অবহেলা করেন নি। ফরাসী বিপ্লবের প্রেরণা তার মনে প্রেরিত হয়েছে। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ তিনি শুধু সাংবাদিকের মত জানেন নি; সেই যুদ্ধের অন্তর্নিহিত বক্তব্য তিনি অনুধাবন করেছেন। তাই টম পেইন তাঁর প্রিয় লেখক; টম পেইন ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকার মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে মেলবন্ধন করেছেন। ভারতবর্ষে ঐ দুইটি দুনিয়া কাঁপানো ঘটনার তাৎপর্য তিনি উপলব্ধি করেছেন—শুধু তত্ত্বগতভাবে নয়।

তিনি ভারতের মাটিতে তার বীজ রোপণ করতে চেয়েছেন। টম পেইনের Rights of Man বা Age of Reason বই দুখানি ডিরোজিওর ছাত্রেরা যে পরম সমাদরে পড়েছেন, তার কারণ এইখানে। পাদ্রী ডাফ বিচলিত হয়েছেন—বিচলিত হয়েছেন ঐ জাতীয় অবিশ্বাসীর (infidel) গ্রন্থ ভারত বর্ষের যুবকেরা পড়ছে। শুধু পড়ছে না, খৃষ্টীয় মিশনারীদের খৃষ্ট মহিমার বা বাইবেল সমাচারের অলৌকিকতার দুর্গে দুর্গতি ডেকে নিয়ে আসছে তারই বুদ্ধি পরম্পরা অনুসরণ করে। সংবাদ প্রভাকরে অনূদিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, জনৈক সংস্কৃত পণ্ডিত তাঁর খৃষ্ট বিরোধী সংস্কৃত গ্রন্থেও পেইন উদ্ধৃত করেছেন, অবশ্য অনুবাদের মাধ্যমে।(৪৯)

রামমোহন সর্ব ধর্মের সার সংগ্রহ করতে চেয়েছেন; ধর্ম তাঁর কাছে শুধু নীতিজ্ঞান নয়, ঈশ্বরবিশ্বাসও বটে। এই কারণে ডিরোজিও রামমোহনকে "half liberal" বলেছেন। যুক্তির অঙ্গুলি ধরে তাঁরা সিকি এগিয়ে বিমূঢ় হতে চাননি। তাই পরিপূর্ণ যুক্তিবাদিতার সঙ্গে অর্ধস্ফুট যুক্তিবাদের বিরোধ অনিবার্য। কিশোরীচাঁদ ঠিকই বলেছেন, "They felt and they asserted in their lives that what is morally wrong, cannot be theologically right."(৫০)

সুশোভন সরকার বলেছেন, ইয়ং বেঙ্গলদের আচরণে রামমোহনের "Sense of decency" ও "theistic idealism" আহত হয়েছিল।(৫১) 'Sense of decency'—এই মূল্যায়ন তর্কসাপেক্ষ। যাদের বয়সসীমা কুড়ি পার হয় নি; তাঁদের সঙ্গে পঞ্চাশ বৎসরের প্রৌঢ়ের জীবনভঙ্গি মিলবে, এ প্রত্যাশা করা ন্যায়সঙ্গত নয়। যৌবন আতিশয্যের কাল, বাড়াবাড়ির সময়। যৌবনের ধর্ম আর প্রৌঢ়ত্বের আচরণ এক নিক্তিতে ওজন করা যায় না।

রামমোহনের সঙ্গে বা রামমোহনপন্থীদের সঙ্গে ডিরোজিও বা ডিরোজিওপন্থীদের বিরোধ অবিমিশ্র বিরোধ নয়। রামমোহনের সকল উদ্যোগ আয়োজন ডিরোজিওপন্থীদের বাঞ্ছিত উত্তরাধিকার। তাই তারা বহুস্থলে মিলেছেন, অনেক স্থলে মিলতে পারেন নি।

ডিরোজিওপন্থীরা রাজনৈতিক ব্যাপারেও স্বতন্ত্র কথা বলেছেন; কিন্তু

প্রধানত হিন্দু সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই তাদের বিদ্রোহ। সামাজিক কুপ্রথার তাঁরা বিরোধিতা করেছেন। রামমোহন হিন্দু পৌত্তলিকতার অঞ্চল ত্যাগ করলেন; ডিরোজিওপন্হীরা এ ব্যাপারে তাঁকে সমর্থন করার সুযোগ পান নি। কারণ তখনও তাঁরা শৈশবের ক্রীড়া অঙ্গন ত্যাগ করেন নি। কিন্তু সেই পৌত্তলিকতার সঙ্গে বিচ্ছেদ যখন ব্রাহ্ম সমাজকে ব্রাহ্মণ্য প্রভুত্বের অবসানে প্ররোচিত করল না; তখন তারা সমালোচনা করেছেন। এ সমালোচনা পরবর্তী কালে কেশবচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর দ্বারা আরও প্রত্যক্ষ গোচরীভূত হবে। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে তিনি যখন মসী ধারণ করলেন, ডিরোজিও তখন রামমোহনকে সোৎসাহ সমর্থন করেছেন। সে দিনের একটি ইতিবৃত্ত উৎকলিত করা গেলঃ "তাঁহারা এক দিবস কলেজের এক ঘরে বসিয়া অভিনন্দন পত্র লইয়া অত্যন্ত উৎসাহের সহিত এই তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছেন যে, উক্ত পত্রের ইংরেজী রচনা রামমোহনের কি অ্যাডাম সাহেবের। এমন সময়ে প্রাতঃ স্মরণীয় ডিরোজিও সাহেব আসিয়া বিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন "তোমরা মানুষ, না এই দেয়াল? নারীহত্যারূপ ভীষণ প্রথা দেশ হইতে উঠিয়া গেল, ইহাতে তোমরা কোথায় আনন্দ করিবে না অভিনন্দনপত্রের ইংরাজী কাহার রচনা এই বৃথা তর্কে তোমরা মত্ত। রামমোহন রায় ইংরাজীতে কিরূপ সুপণ্ডিত ব্যক্তি জানিলে তোমরা ইহা অ্যাডাম সাহেবের বলিয়া মনে করিতে না।" (৫২) (মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় চতুর্থ সংস্করণ। পৃঃ ৩৬৮)। সতীদাহ নিষিদ্ধ হয়েছে। এই সংবাদ ডিরোজিওর কাছে মানবমুক্তির সংবাদ। ইণ্ডিয়া গেজেটেই ৮ই আগষ্ট (১৮৩১) তাঁর এই ঐতিহাসিক ঘটনা উপলক্ষে একটি কবিতা প্রকাশিত হোল—

**Hark, heard ye not ? The Widows wail is over....**
**The storm is passing, the rainbow's span**
**Stretch from North to South ; the ebon car**
**Of darkness rolls away ; the breezes fan**
**The infant dawn ; and morning's herald star**
**Comes trembling into day ! O ! can the sun be far ?**(৫৩)

শুধু ডিরোজিও নন্ ডিরোজিও অনুগামীরাও নীরব থাকলেন না। Enquirer পত্রিকায় The Suttee নামে একই সময়ে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। (৫৪)

সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করে যে আইন জারী হোল, তাকে রদ করার জন্য ধর্মসভার সদস্যরা মিঃ ব্যাথিকে কৌসুলি করে বিলেত পাঠালে এনকোয়ারার লিখেছিল—That an Englishman in the nineteenth century would enlist himself as one of the defends of such a horrible rite as that of the Suttee, is what the historian could never dream of being obliged to record." (৫৫)

সে যুগে শ্রদ্ধা যেমন তাঁরা পোষণ করতেন ; সমালোচনাও তেমনি তাঁরাই করেছেন। যা সমালোচিত হওয়া উচিত বলে তাঁরা মনে করেছেন, তাকে সমালোচনা করেছেন। কারণ "সত্য অপেক্ষা প্রিয়তর তাঁদের আর কিছুই নয়।"

আমরা তাঁদের রামমোহনপন্থীদের সমালোচনার কয়েকটি উদাহরণ সংকলিত করছি।

১. ১৯শে ভাদ্র, ১৮৩১ সালে তখন ব্রহ্মসভার পক্ষ থেকে দুইশত জন ব্রাহ্মণকে প্রণামী দেওয়া হোল, তখন ডিরোজিও প্রতিবাদ জানালেন ; সমালোচনা করলেন—"We have always supposed that Bramha Shabha was not a Brahminical juggle, and that it was established by Rammohan Roy upon the purest principles of worship to God and love to man......charity is an excellent virtue ; but when a select body of men are made the objects of it, to the exclusion of others, we like to know the reason of such a distinction. The Brahmins are not gods of our idolatory ; but it does not therefore follow that others may not worship them if they please. We only think that to give the Brahmins up, on one account and to take them back, on another, is quite super derogatory. It is the same humbug in another name."(৫৬)

২. রামমোহনের সহচর প্রসন্নকুমার ঠাকুরের গৃহে দুর্গোৎসব হোল ; প্রথমে অবশ্য চন্দ্রিকার সম্পাদক ভবানীচরণ এ ব্যাপারে মুখ খোলেন। যাঁরা মুখে পৌত্তলিকতার নিন্দা করেন, অথচ স্বগৃহে মূর্তিপূজা করেন, চন্দ্রিকা তাঁদের নাম প্রকাশ করে দেয়। ইস্ট ইণ্ডিয়ান পত্রিকায় ডিরোজিও বিষয়টির গুরুত্ব দিলেন। মিথ্যাচারের তিনি বিরোধী। ১৫ই অক্টোবর ইস্ট ইণ্ডিয়ান পত্রিকার সমালোচনা বের হোল। (৫৭)

ইণ্ডিয়া গেজেটে জনৈক পত্রলেখক এর জবাব দেবার চেষ্টা করলেন। তিনি লিখলেন প্রসন্ন ঠাকুর বাড়ীতে দুর্গাপূজা করেন, তার কারণ উত্তরাধিকারবিধি তাঁকে পূজা করতে বাধ্য করছে।

I have read in this morning's East Indian an attack against Baboo Prusunna Coomer Tagore, the talented conductor of the Reformer for inconsistency—for celebrating an idolatrous poojah ; he has attacked idolatry through the Reformer, and at the same time is celebrating idolatrous worship in his house. He has attacked idolatry because he hates it from the bottom of his heart. I know he hates it as much as Mr. Derozio, the Editor of the East Indian, or Baboo Krishna Mohona Banerjeah, the editor the Enquirer, can do. Now for the other side of the story. He has celebrated an idolatrous poojah in his family house not because he approves of it, but because he cannot avoid doing it. The property he inherits from his ancestors is left to him on condition of celebrating this poojah every year ; for which a fund is deposited in his hands as a trust" (৫৮)

এইটুকু শুধু লিখলে বলবার কিছু থাকত না ; কিন্তু পত্রলেখক সেখানেই থামলেন না। তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন যে ডিরোজিও খৃস্টধর্মাবলম্বী।

May I ask Mr. Derozio if he never saw a rank deist

going to the Temple of Christ and worshipping at his altar without a grain of belief in the Bible ? If he answers in the affirmative, I think he should certainly expose their conduct as being more within the bounds of his vocation, then trouble himself about what Hindoo do, a subject on which notwithstanding pretensions, he has often betrayed great ignorance.''(৫৯)

পত্রলেখক এর পর ডিরোজিওর বিশ্বস্ত অনুচরদের মধ্যে মিথ্যাচারী আবিষ্কার করলেন। তিনি লিখলেন আমি শুনেছি মাধবচন্দ্র মল্লিক তাঁর গৃহে দুর্গাপূজা করেছেন। অথচ তিনি তো হিন্দুধর্মের শ্রাদ্ধ করছেন। এ বিষয়ে ডিরোজিওর কি বলবার আছে? আর তাঁর বন্ধু কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জীই বা কি বলেন? মাধবচন্দ্র মল্লিক ছিলেন কট্টর ডিরোজিওপন্থী। ২১শে তারিখে এক চিঠিতে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কড়া জবাব দিলেন।

What he has said of my having celebrated the Doorga poojah is a thing which is entirely against my principles and I never have acted, nor will act, against them, though I might be disliked by my kindred, hated by the Hindoos, and excommunicated by the Dhurma Shubha" (20 oct, I835) (৬০)

বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারত্ব ব্যাপারে যে সর্তাদির কথা পত্রলেখক প্রসন্নকুমার সম্বন্ধে লিখেছিলেন, ইস্ট ইণ্ডিয়ান পত্রিকায় তার জবাব দেওয়া হোল, "No condition regarding the celebaration of the Doorga Poojah festival has been imposed upon the Baboo by his ancestors, nor is there any fund deposited with him for that purpose. When the property left to him, and his brothers, was divided among them, they agreed upon themselves to celebrate the poojahs by terms, for a specified time. This period was limited to five years, the last of

which has just expired. The agreement among the brothers was voluntary, not imposed upon them by ancestors." (৬১) বলা বাহুল্য এ সব খুঁটিনাটি পারিবারিক খবর ডিরোজিওর জানবার কথা নয় ; সম্ভবত ঠাকুর পরিবারের ঘনিষ্ঠ কোন আত্মীয় এসব খবর সরবরাহ করেছিলেন এবং সে আত্মীয় বোধকরি দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। ব্রাহ্মমতাবলম্বীদের ধর্ম বিষয়ক ধ্যান ধারণা ডিরোজিওর কাছে ন্যায়নীতি অনুমোদিত নয়। ইস্ট ইণ্ডিয়ান পত্রিকা প্রকাশ করার একটি উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় সমাজের খবরাখবর বিস্তৃতভাবে পরিবেশন করা। দেশীয়দের মধ্যে যে পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে তিনি নিজে প্রত্যক্ষভাবে তার সঙ্গে জড়িত বলে এই সব সংবাদ সংগ্রহ কবা তাঁর পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ হযেছে।

The Hindoos of Calcutta are divided into several parties the orthodox being, as may be supposed, the largest and most opulent. It has several public organs—the Chundrika, the Prabhakar, the Ratnakar, other papers written in Bengallee language. They have no paper in English as yet; but we have heard that a Christian was to have been employed by them to defend the cause of idolatry! The editor of Enquirer threatened to expose him if he attempted to perpetuate the ignorance and superstition of Hindoos by defending their religious and evil practices. We believe this produced the desired effect, the Christian has not yet inked his maiden pen, to prove that we should have more Gods than one.

Rammohan Roy is the founder or rather the leader of another sect. But what his opinions are neither his friends nor foes can determine. It is easier to say what they are not, than what they are and this, we think, is the case with most thinking men. Rammohan, it is well known, appeals to the Vedas, the Koran and the Bible, holding them all pro-

bably in equal estimation, extracting the good from each and rejecting from all whatever he considers apocryphal. He has been known to attend and join in prayer both among Christian and Hindoo unitarians ; but whether he prefers the forms of the one or the other it is difficult to determine. We have seen persons salute him as a Brahmin, and we have heard him pronounce the Brahminical benediction upon such occasions ; and if the proceedings of the Bramhu Shubha, as regulated at present have been sanctioned by him, it is obvious that the Brahmins are treated by his followers with as much respect, as they are by the most orthodox. He has always lived like a Hindoo, drinking a little wine occasionally in the cold weather. He has, we believe, sat at table with Europeans, but never eaten anything with them. His followers, at least some of them, are not very consistent. Sheltering themselves under the shadow of his name, they indulge to licentiousness in everything forbidden in the shastras, as meat and drink, while at the same time, they fee the Brahmins, profess to disbelieve Hindooism, and never neglect to have poojahs at home. These persons, the Editor of Enquirer calls half-liberals, and well he may. The Reformer is their paper in the English language, and they have the Bungodoot and Cowmoodee in the Bengallee." (৬২)

রামমোহন ও ব্রাহ্মসভা সম্বন্ধে ডিরোজিওর মূল্যায়নে যুক্তির একটা ফাঁক আছে। বাস্তব অবস্থা ও যুক্তিবাদিতার মধ্যে সামঞ্জস্য রচনায় ডিরোজিও ব্যর্থ হয়েছিলেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি নব্যদের সম্বন্ধে লিখছেন, শেষোক্ত দল হলেন সর্বাপেক্ষা প্রতিভাসম্পন্ন গোষ্ঠী। কৃষ্ণমোহন, দক্ষিণানন্দ ও মাধবচন্দ্র এই দলভুক্ত।

রামমোহন বা ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে ডিরোজিওর যে সমালোচনা, তা গ্রহণ যোগ্য হতেও পারে, নাও হতে পারে। কিন্তু তাঁর অন্যান্য বক্তব্য আমাদের সযত্ন পরিচযের অপেক্ষা রাখে। ডিরোজিও এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন যে, হিন্দু সমাজের আচারব্যবস্থা, সংস্কার প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর পক্ষে কোন মত প্রচার করা সুবিবেচনার কাজ নয়। এ ব্যাপারে হিন্দুরাই মত প্রকাশের অধিকারী। তবে এক্ষেত্রে যুক্তি ও বিবেচনার নির্দেশ অনুসারে চলতে হবে; এই ছিল তাঁর পরামর্শ। এক্ষেত্রে তিনি কোন রকম আপোষ মীমাংসা বিরোধী। ১৮৩১ সালেও দেখা গেল দুর্গাপূজার উৎসবে লাট সাহেব, হাইকোর্টের জজ থেকে শুরু করে অনেক গণ্যমান্য ইংরেজ নিমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেছেন। তাঁদের পাশে গির্জার ধর্মযাজক মহোদয়েরাও বিরাজমান। এমন কি বাইজী নাচের আসরেও তাঁরা অনুপস্থিত থাকছেন না। ডিরোজিও খৃষ্টীয মিশনারীদের এই আচরণকে ক্ষমার চোখে দেখেন নি। ২১শে অক্টোবর তিনি এক প্রবন্ধে খৃষ্টীয় মহাপুরুষদের এই কাজের নিন্দা করলেন। অর্থাৎ তিনি একটা নির্দিষ্ট নীতি মেনে চলতে চেয়েছেন; এ ক্ষেত্রে কোন গোঁজামিল তিনি বরদাস্ত করেন নি। এ হোল তাঁর কার্যক্রমের নেতিবাচক দিক। কিন্তু ইতিবাচক দিকও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা শিক্ষা প্রসারে উদ্যোগী হলে তিনি তাঁদের প্রাণ খুলে সমর্থন করছেন। আড়পুলি লেনের বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার দিনে উপস্থিত থেকে তিনি ছাত্রদের উৎসাহ দিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়ান পত্রিকায় তিনি জানালেন যে তিন হাজারের বেশি ছাত্র ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করছে।

"We believe that there are now upwards of three thou sand native youth receiving instruction in the English language and becoming acquainted with the valuable stores of European literature and science in general." (৬৪)

ঐ প্রবন্ধে তিনি এই আধুনিক শিক্ষার প্রসারে যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং মহামতি ডেভিড হেয়ারের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। আর তারিফ করলেন হিন্দু কলেজের ছাত্রদের, যাঁরা নতুন নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে সোৎসাহে এগিয়ে এসেছেন।

জাতীর শ্রীবৃদ্ধিই ছিল তার লক্ষ্য ; এই কারণে তিনি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার স্থাপনে আপত্তি জানালেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর তিনি এক প্রবন্ধে ইস্ট ইণ্ডিয়ান পত্রিকায় লিখলেন—'a theatre among the Hindoos, with the degree of knowledge they at present possess will be like building a palace in the waste.' তাঁর পরামর্শ ছিল ভিন্নরূপ—"we recommend our Hindoo patriots and philanthropists to instruct their countrymen, by means of schools ; and when they are fitted to appreciate the dramatic compositions of refined nation, it will be quite time enough to erect a theatre.' কারণ তাঁর বক্তব্য হোল "useful knowledge should precede amusement."(৬৪)

নাটক ও নাট্যশালার ব্যাপারে ডিরোজিও আদৌ স্পর্শকাতর বা নীতিবাগীশ ছিলেন না। ড্রামণ্ড সাহেবের ধর্মতলা একাডেমির ১৮২২/১৮২৩ সালের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে যে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল, তাতে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন, এবং ঐ নাট্যাভিনয় থেকেই তিনি মিঃ উইলসনের দৃষ্টিপথে পড়েন, যার ফলে তাঁর হিন্দু কলেজে শিক্ষকতায় যোগদান। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে তিনি 'মার্চেণ্ট অব ভেনিসে' শাইলকের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। দ্বিতীয় বৎসর 'ডগলাস' নামক ট্রাজেডিতে তিনি অবতীর্ণ হন। যথেষ্ট প্রশংসাভাগী হন।

তিনি এ যুগের প্রয়োজনবাদী জীবননীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন ; বিশ্বাসী ছিলেন হিতবাদে। তাই জাতির প্রাথমিক প্রয়োজনই তাঁর কাছে প্রথম প্রয়োজন হয়ে দেখা দিল। অবশ্য এই ব্যাপারে তার প্রিয় ছাত্রদের সঙ্গেই তার মতবিরোধ হোল। মতবিরোধ সর্বক্ষেত্রেই শত্রুতাবোধক নয়, হিন্দু থিয়েটারের কার্যনির্বাহক কমিটিতে হরচন্দ্র ঘোষ ও মাধবচন্দ্র মল্লিক স্থান পেলেন বা স্বেচ্ছায় যোগ দিলেন।

জাতীয় উন্নতির জন্য তাঁর ছাত্ররা যখন যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন, ডিরোজিও সর্বদাই তার প্রচণ্ড উৎসাহদাতা ছিলেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে জাতি বলতে তিনি কি বুঝতেন? ভারতবর্ষ কি শুধু হিন্দুর? মুসলমান কি অবাঞ্ছিত? ইউরেশীয়দের স্বদেশ বা স্বভূমি কোনটি?

ডিরোজিও কবিতা লিখে প্রবন্ধ লিখে সভা সমিতিতে বক্তৃতা করে এবং সঙ্ঘবিশেষের অনুষ্ঠান পত্র (Prospectus) রচনা করে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। To India—My Native Land এবং Harp of India ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় সঙ্গীত। Harp of India ১৮২৭ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কবিতা সংকলনের মুখবন্ধে স্থান পেয়েছিল। To India—My Native Land স্থান পেয়েছিল The Fakeer of Jungheera কাব্যগ্রন্থের মুখবন্ধে।* তখন সাহেব সুবোদের উন্নতনাসিকার যুগ; নানা সুযোগ সুবিধা তাঁরা পেয়ে থাকেন; অবশিষ্ট সুযোগ সুবিধার জন্য আন্দোলন করছেন—যেমন এদেশে অবাধ বসবাস ও ভূ-সম্পত্তি ক্রয়। আইন আদালত তাঁদের জন্য পৃথক; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও পৃথক চাই। ইংরেজ পরিচালিত কোন কোন বিদ্যালয়ে দেশীয় ছাত্রদের প্রবেশাধিকার অস্বীকৃত ছিল। এই পরিবেশে ডিরোজিওর শিক্ষাগুরু ড্রামণ্ড সাহেব পরিচালিত

* বিনয় ঘোষ লিখেছেন, "ডিরোজিওর নিজের সংকলনে The Harp of India প্রথম কবিতারূপে স্থান পেয়েছে। ব্রাডলে বার্ট সম্পাদিত ডিরোজিওর কাব্য সংকলনে (Poems of Henry Louis Vivian Derozio—A Forgotten Anglo-Indian Poet. Oxford University Press 1923) এই কবিতার পরে 'To India—My Native Land' কবিতাটি মুদ্রিত হয়েছে। ব্র্যাডলে বার্ট তাঁর সংকলনের ভূমিকায় ডিরোজিওর কবিতা সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা করেন নি; তাঁর সংকলন থেকে ডিরোজিওর নিজের সংকলনের কিছু কবিতা বাদ দেওয়া হয়েছে।" (পৃঃ—১২৫)

বিনয় ঘোষ জানেন না যে, ডিরোজিওর কাব্য সংকলন দুইটি। প্রথম সংকলন প্রকাশিত হয় ১৮২৭ সনে, তার প্রথম কবিতা The Harp of India; দ্বিতীয় সংকলন ১৮২৮ সনে। তার ভূমিকায় ছিল 'To India—My Native Land.' ব্র্যাডলে বার্ট উভয় কাব্যের কবিতা নিয়ে একটি সংকলন করেছেন, কাজেই প্রথম সংকলনের কিছু বাদ যাবেই।

ধর্মতলা একাডেমিতে সর্ব জাতির সর্ব বর্ণের প্রবেশাধিকার ছিল। এই স্বাতন্ত্র্য ডিরোজিওর অকুণ্ঠ সাধুবাদ অর্জন করল। ঐ বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার বিবরণী লিখতে গিয়ে তিনি কয়েকটি মৌলিক নীতি ব্যাখ্যা করলেন। তাঁর মধ্যে হিন্দু ছাত্র ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছাত্রদের একত্রে পড়াশুনা তিনি খুব সমর্থন জানালেন। এবং ইস্ট ইণ্ডিয়ানদের সতর্ক করে দিলেন যে, তাঁরা যেন আর শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি না করেন।

এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠার উপযোগী বাস্তব পরিবেশ পূর্বেই উদ্ভূত হয়েছে। ইউরেশীয়দের দায়িত্বশীল সরকারী চাকরিতে প্রবেশ নেই, নৌ বহরে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছিল। এ সব 'হিতকর' কাজ করেছিলেন কর্নওয়ালিশ। উদ্ধৃত প্রবন্ধ রচনার দুই বৎসর পূর্বে ইস্ট ইণ্ডিয়ান বা ইউ-রেশীয়দের নিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়ার উদ্যোগ হয়। ডিরোজিওর বন্ধু রিকেটস্ বিলেত গিয়েছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়ানদের বক্তব্য যথাযোগ্য স্থানে পরিবেশন করার জন্য। কিন্তু ফল নাস্তি। তখন টাউন হলে সভা হোল; সংঘ গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হোল। সমাজের নাম কি হবে তাই নিয়ে বিতর্ক হোল। কুড়ি বৎসরের সেই অত্যাশ্চর্য যুবকটি শেষ সিদ্ধান্ত দাখিল করেছিলেন—সমাজের নাম ইউরেশিয়ান হবে, না ইষ্ট ইণ্ডিয়ান হবে এই সম্পর্কে। এমন কি, তখন তিনি শিক্ষাগুরু ড্রামণ্ডের বিরোধিতা করতেও ইতস্তত করেননি। এই সভায় তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা স্মরণীয়। এই বক্তৃতার অ-সাম্প্রদায়িক সুর তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে খুবই বিস্ময়কর।

The admission of East Indians to certain rights do not preclude the possibility of other classes of the population also securing for themselves the privileges to which they are entitled. If the East Indians were permitted to enjoy all privileges they now seek, it would be impossible to withhold the claims of others. The enemies have tried to set both the Europeans and the natives against them by saying that they seek exclusive privileges, well-

knowing that if they once enter the breach, there will be many to follow."(৬৭)

এই সমিতির যে ইস্তাহার বা অনুষ্ঠানপত্র (Prospectus) রচিত হোল, তার বুকের মধ্যেই এই সুরও ধ্বনিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠান-পত্রের রচয়িতা কে, এ সংবাদ আজ অন্ধকারের গর্ভেই থাক। তবে এব বক্তব্যে ডিরোজিওব আন্তরিক সমর্থন আছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রথমে লর্ড বেকনের সেই অতিখ্যাত রচনাটি (প্রবচনও বলা যায়) উদ্ধৃত কবা হয়েছে—Knowledge is power—জ্ঞানই শক্তি।

তাবপব জাতীয় জীবনের প্রসঙ্গ স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরা হোল, শুধু ইস্ট ইণ্ডিয়ানদের প্রসঙ্গ নয়।

Nothing has of late excited more attention, from persons of all descriptions, than the condition and prospects of the inhabitants of India. The subject was little considered a few years ago, but from various circumstances, it has now acquired so much importance, that there seems to be but one opinion on the point—that the situation of the people of India may be and requires to be improved. The apathy formerly so general, is rapidly giving place to a lively concern for promoting the true welfare of the people, on the broadest and most solid basis."(৬৮)

ডিরোজিও এই সংগ্রামে জয়লাভের জন্য ব্যাপক ঐক্য গড়ে তোলার কথা বলেছেন।

"All the zeal of a willforce would have been employed in vain, if the abolition of slavery had depended upon his individual exertions."(৬৯)

তাই গড়ে তুলতে হবে সংগঠন। কিন্তু তাই বলে এই সংগঠন এক বিশেষ সম্প্রদায়ের সংগঠন মাত্র হবে না।

"It will not be supposed, however, that because the chief object of the society will be welfare of East Indians, there will not be any display of illiberality towards other classes of community. So far from it, that it is specially inteded to extend the benefits of the institution to other portions of the inhabitants of this country, consistently with the greater wants of the East Indians and their consequent stronger claims upon its attention."(৭০)

ইস্ট ইণ্ডিয়ান নামে তিনি এক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন; তার জন্য যে ইস্তাহার তিনি প্রচার করেন তাতে স্পষ্ট ভাষায় জানালেন—"To prevent any misconception to which the name of paper may give rise, the proprietor begs to state that his journal will not be exclusively devoted to any particular interest, but that it will advocate the just rights of all classes of the community."(৭১)

ট্যাশ-ফিরিঙ্গী ঘরের বিংশতিবর্ষীয় যুবা সর্ব সম্প্রদায়ের সম অধিকারের কথা বললেন। ঈশ্বর অনুভবের কথা নয়। ব্যবহারিক জীবনের এই মিলনের বাসনার তাৎপর্য আছে। অন্তত উনিশ শতকের প্রারম্ভে জীবনের অনেক প্রধান অঞ্চলে ধর্মনির্ভরতা হ্রাস পাচ্ছে; সংবাদ হিসাবে তার মূল্য অপরিসীম।

॥ ১০ ॥

তাঁর জীবিত কালেই রামমোহন-অনুগামীদের সঙ্গে তাঁর ছাত্রদের প্রচণ্ড বিতর্ক শুরু হয়। মধ্যপন্থী ও চরমপন্থীদের এই বিরোধে তিনি যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন. তার অনুসন্ধান আজ পর্যন্ত কেউ করেন নি। ডিরোজিওপন্থীরা সর্বদাই একই প্রকার সংযম ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন নি। ফলে অনেক ক্ষেত্রে শিষ্যদের বাড়াবাড়ি গুরুর উপর আরোপিত হয়েছে।

এনকোয়ারার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহত্যাগ প্রসঙ্গে যে বিবরণী দাখিল করে, ইণ্ডিয়া গেজেট তার সত্যতা স্বীকার করে কিছু সমালোচনা করে। অবশ্য সে সমালোচনা ছিল বান্ধবোচিত।

ঠিক পরের সপ্তাহে ইণ্ডিয়া গেজেটের এই মন্তব্য সম্বন্ধে 'ইস্ট ইণ্ডিয়ানে' ডিরোজিও একটি প্রবন্ধ লেখেন। বেঙ্গল ক্রনিকলের সম্পাদকীয় দপ্তরের সঙ্গে ডিরোজিও যুক্ত ছিলেন ; এই প্রবন্ধটি তাই ক্রনিকলে উদ্ধৃত হয়। এই প্রবন্ধের ভাষা ও যুক্তির মধ্যে ডিরোজিওর ভাষার যুক্তিমুখীনতা ও আবেগময়তা স্পষ্ট দেখা যায়।

ইণ্ডিয়া গেজেটে চরমপন্থীদের সম্বন্ধে মাঝে মাঝে এরকম বান্ধবোচিত সমালোচনা থাকত। একবার এই প্রকার সমালোচনার বেশ ধরে ডিরোজিও তাঁর ইস্ট ইণ্ডিয়ান পত্রিকায় পুনরায় লিখলেন যে ইণ্ডিয়া গেজেটের সম্পাদক কেবলই চাইছেন যে, চরমপন্থীরা আরও সংযত হোক, বিরুদ্ধবাদীদের সম্বন্ধে আরও উদার হোক। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান লিখল আমরাও তাই চাই। তবে নব্যদের সম্বন্ধে তাঁরা আর একটু সহনশীল হতে পারতেন। নব্যদের আমরাও সংযত হতে বলি "foi violence is not proof of right."

॥ ১১ ॥

ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি ছিলেন নিরপেক্ষ ; তিনি খৃষ্টীয় মিশনারীদের তত্ত্বজিজ্ঞাসা সমর্থন করেন নি ; তিনি রামমোহনের তত্ত্বজিজ্ঞাসারও সমর্থক ছিলেন না। তিনি নিরীশ্বরবাদী ছিলেন বললে সবটুকু বলা হয় না। তিনি ছিলেন সত্যের দিশারী—সত্যের পূজারী। কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, তিনি নাকি হিন্দু ছাত্রদের হিন্দুধর্মের উপর আস্থাশূন্য করে ধীরে ধীরে খৃষ্টীয় ধর্মের দিকেই টেনে নিয়ে চলেছিলেন। হিন্দু কলেজের শিক্ষায় ধর্মজিজ্ঞাসার স্থান ছিল না ; এই কারণে রাজা রামমোহন রায় থেকে পাদরী ডাফ হিন্দু কলেজের শিক্ষার প্রতি অতিশয় বিরূপ ছিলেন। হিন্দু কলেজের জনৈক ছাত্র Polytheist থেকে Deist, এবং Deist থেকে Atheist হয়েছে শুনে রামমোহন বলেছিলেন 'শেষে বোধ হয় Beast হইবে"—এ গল্প শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের শুনিয়েছেন।(৭২)

হিন্দু কলেজের ছাত্ররা উপবীত ধারণ করতে অস্বীকার করেছিল, রামমোহনের মৃত্যুকালেও দেহে যজ্ঞোপবীত ছিল ( সে মৃত্যু বিলেতে ঘটে ), ছাত্ররা পৈতার পর গায়ত্রী মন্ত্র নয়, ইলিয়াদের অংশ বিশেষ আবৃত্তি করত। রামমোহন গায়ত্রীর নবীনতর ব্যাখ্যাও দিয়েছেন; ছাত্ররা কালীঘাটে গিয়ে "Good Morning, Madam" বলেছিল। তিনিও প্রিন্স দ্বারকানাথের বাড়ীর দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণ গ্রহণে নিমরাজি হয়েছিলেন। পৌত্তলিকতা না মানা আর ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ এক নয়। 'ক্যালকাটা রিভিউ'এর প্রবন্ধলেখক ডিরোজিওর সঙ্গে অন্যান্যদের এক করে দেখেন নি।

রামমোহন লর্ড আমহার্স্টকে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করে যে চিঠি লিখেছিলেন, ঐতিহাসিকেরা তার প্রচুর সুখ্যাতি করেছেন। কিন্তু ঐ চিঠিতেই তিনি চেয়েছিলেন 'enlightened system of education' যার প্রস্তাবিত পাঠ্য তালিকার মধ্যে 'Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy, with other useful sciences' ছিল, ধর্ম-শিক্ষার কোন স্থান ছিল না। অথচ তিনিই ডাফ সাহেব এলে তাঁর স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য বাড়ী খুঁজে দিয়েছিলেন। ডাফ সাহেব হিন্দু কলেজের গতিবিধি সম্বন্ধে বলেছিলেন—"the very ideal of a system of education without religion."(৭৩)

ধর্মহীন শিক্ষা থেকে খৃষ্টীয় মিশনারীর শিক্ষা ভাল—এই মত আমহার্স্টকে লিখিত পত্রের বক্তব্যের সঙ্গে মেলে না।

ডিরোজিও সংস্কৃত শিক্ষার বিকল্প খৃষ্টীয় শিক্ষা মনে করতেন না। উইলসনকে তাঁর সেই বিখ্যাত চিঠিতে তিনি বলেছিলেন—ছাত্রদের দার্শনিক হিউমের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি।

হিউম কি বলেছেন, তা হিউমের মুখ থেকেই শোনা যাক।

যেখানে যুক্তিবাদিতা নেই, প্রয়োগসাপেক্ষ যুক্তিবাদ নেই তার জন্য ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন—"Comit it then to the flames: for it can contain nothing but sophistry and illusion."(৭৪)

হিউমের এই উত্তেজনাপূর্ণ মন্তব্য স্বভাবতই রীড ও স্টুয়ার্টের বক্তব্য অপেক্ষা অধিকতর মনোলোভন হয়েছিল নবীন ছাত্রদের। ঠিক একই কারণে লক অপেক্ষা টমাস পেইন অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। লক কথা বলেছিলেন ন্যায়শাস্ত্রীর মত শান্ত কণ্ঠে। পেইন সেখানে দুন্দুভি নিনাদ করেছেন। স্বভাবতই লককে মানলেও এবং জীবনের মৌলিক উপাদান মনে করলেও পেইন অধিকতর আকর্ষণীয় হয়েছে। সে যুগ ছিল উত্তেজনার যুগ, প্রমত্ততার যুগ. কল কোলাহলেব যুগ—পেইন এবং হিউম-এব বাচনভঙ্গির সঙ্গে তাই সে যুগের দারুণ ঐক্য ঘটে গেছে।

পূর্বেই বলেছি ডিরোজিও মৌলিক চিন্তার অধিকারী ছিলেন না, দার্শনিক ছিলেন না। তিনি যুগের বাঞ্ছিত দার্শনিকদের ব্যাখ্যাকারী ছিলেন।

এ বিষয়ে তাঁর যে প্রবল আগ্রহ ছিল, তাব পরিচয় দুটি রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। তিনি ফরাসী অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক M. Maupertius লিখিত "On Moral" প্রবন্ধটি মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ করেছিলেন। প্রথম পরিচ্ছেদে সুখ কি এবং দুঃখ কি—তা আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে—অসৎ কাজের পরিমাণ সৎকাজ অপেক্ষা সচরাচর বহুগুণ বেশী হয়ে পড়ে কেন? তৃতীয় পরিচ্ছেদে আনন্দ ও বেদনাবোধের প্রকৃতি ও পারস্পরিক সম্বন্ধ আলোচিত হয়েছে।(৭৫)

Maupertius ছিলেন Encyclopaedist দার্শনিকদের পরবর্তীযুগের দার্শনিক। কাজেই তাঁর বক্তব্যে লক্-ব্যাখ্যাত যুক্তিধারার অনুসরণ দেখা যায়। তাঁর লেখা একটি মাত্র মৌলিক দার্শনিক প্রবন্ধের প্রসঙ্গ আমরা বহুজনের লেখায় উল্লিখিত দেখেছি। জীবনীকার এডওয়ার্ডস ঐ প্রবন্ধটির জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েও সুফল পান নি। বিশপস কলেজের তখনকার অধ্যক্ষ ডক্টর মিলস বলেছিলেন, ডিরোজিওর লেখা কান্ট-সমালোচনা যে-কোন নামী দার্শনিকেরও সাধনার বস্তু হতে পারে।

ডিরোজিও ছিলেন সর্বতোভাবে আধুনিক, এবং বিজ্ঞানের শক্তিতে আস্থাবান।· মানব প্রগতিতে তিনি ছিালন বিশ্বাসী। কবিতায় বিষয়বস্তু নির্বাচনে তিনি যুগের উৎকণ্ঠার দ্বারাই চালিত হয়েছেন।

Thermopylae, Freedom to the Slave, Greece, The Greeks at Marathon, The Deserted Girl, Hope, এবং To the Pupils of the Hindoo College.

তিনি প্রকৃতি-প্রেমিক ছিলেন ; কিন্তু মানব প্রেমিক, অধিকতর। তিনি জ্ঞানের সন্ধানী ছিলেন, কিন্তু সে জ্ঞান মানবমুক্তির জ্ঞান। তাই মৃত্যুর সাত দিন পূর্বেও এক স্কুলের বার্ষিক উৎসবে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে এলেন যে, তিন সপ্তাহে একদিন করে আইন ( law ), ও রাজনৈতিক অর্থবিদ্যাব ( Political Economy ) ক্লাস নেবেন। (৭৬)

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ১৩ই ফেব্রুয়ারী ইণ্ডিয়া গেজেট তাঁর সম্বন্ধে যা লিখেছে, সে-ই কথাই তাঁর সম্বন্ধে যথার্থ কথা।

"His praise consists in his having done that well to which he was appointed, and having entered heartily and zealously into that which others would have regarded as the mere routine of duty." (৭৫)

এ কর্তব্যবোধ স্বদেশ ও স্বজাতি সম্বন্ধে গভীব ভালবাসা থেকে এসেছে।

ডিরোজিও মৃত্যুকালে বাইবেলের বচন আবৃত্তি করেন নি ; তিনি শুনতে চেয়েছিলেন তাঁর প্রিয় ছাত্রের মুখ থেকে ক্যাম্পবেলের সেই বিখ্যাত কবিতাটি The Pleasures of Hope. ধর্মতলা একাডেমির বার্ষিক উৎসব পর্যালোচনা ছলে তিনি লিখেছিলেন—

"When a Hindoo casts off all appearance of Hindoo religious observance, the majority of his countrymen naturally consider that person as an outcast. He is no longer Hindoo. What then is he? He replies—a lover of Truth." (৭৬)

ছাত্রদের পরবর্তী আচরণ নিশ্চয়ই ডিরোজিও নিরূপণ করতে পারেন না! মধ্যবিত্তের বহু বৈপ্লবিক ভাবাদর্শের কী ভয়াবহ পরিণতি ঘটে, ইতিহাসে সে-উদাহণের অপ্রতুলতা নেই। ফরাসী প্রজাতন্ত্রবাদের

অধঃপতন সবারই জানা। কাজেই ডিরোজিও শিষ্যদের কারো কারো অধঃপতন বা পথ পরিবর্তন বা 'উন্নতি' মধ্যবিত্ত জীবনের কথাসরিৎসাগর বলেই সন্তুষ্ট হতে হবে। ডিরোজিও শেষ পর্যন্তও যুক্তিবাদী ও সত্যসন্ধ।

## ॥ পাদটীকা ॥

১. John Bull, 18 January 1831.
২. Bengal Hurkaru, 23 April, 1789
৩. H. H. Wilson's Report on Education of 1828.
৪. ঐ
৫. An Address to Parliament on the Duties of Great Britain to India—Charles Cameron. London. Longman, Brown, Green and Longman 1853, P. 153
৬. John Bull, 25 Jan, 1824
৭. John Bull, 18 Jan, 1828
৮. Lushington—Religious Institutions, Benevolent Institutions etc. 1824 P. 182
৯. John Bull 26 Jan 1825
১০. John Bull, 18 Jan, 1826
১১. Calcutta Gazette, Jan. 20, 1827
১২. Calcutta Gazette, Jan. 24, 1828
১৩. ঐ
১৪. ঐ
১৫ John Bull, Jan 18, 1828
১৬ ক. John Bull, July 2, 1830
১৬. John Bull, Feb 19, 1829
১৬. ক ঐ

১৭. Calcutta Gazette, Feb 14, 1831
১৮. Bengal Hurkaru, Oct 20, 1824
"I consider the formation of a society in Calcutta is a desideratum."
১৮ ক. David Hare—Pearychand Mittra 1877
১৯. শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। নিউ এজ সংস্করণ পৃষ্ঠা ১৪৩.
২০. Calcutta Courcr. June 5, 1839
২১. India Gazette—Quoted in John Bull December 11, 1830
২২. India and India Missions-Alexander Duff. P. 614—615
২৩. ঐ
২৪. Life of Rev. Alexander Duff George Smith 1879. P. 150
২৫. Thomas Edwards—Henry Derozio, the Eurasian Poet, Teacher and Journalist. Calcutta 1884 Chapter—VI
২৬. ঐ
২৬. ক Recollections of Rev. Alexander Duff—Lalbehari De
২৬. খ সমাচার চন্দ্রিকা—১৩ মার্চ ১৮৩০
২৬. গ John Bull, Dec 11, 1830
২৬. ঘ Bengal Spectator, vol I. No 7
২৭. India Gazette, Feb 17, 1830
২৮. Sir Edward Ryan's letter to Lord Willam Bentinck. 16 June 1831. Bentinck Papers. India Office Library
২৯. Bengal Obituary. Holmes & Co 1848
৩০. India and India missions—Alexander Duff. P. 615
৩১. Enquirer, 6 Sept, 1831
৩২. ঐ
৩৩. সম্বাদ কৌমুদী ২০ সেপ্টেম্বর, ১৮০১
৩৪ ক. যোগেশচন্দ্র বাগল স্মারকগ্রন্থ—জ্ঞানান্বেষণ—সুরেশচন্দ্র মৈত্র।
৩৪ খ. Calcutta Gazette, 4 Dec, 1790.

৩৫. The Works of Jeremy Bentham --J. Bowring ( edited ) 1843 vol X P 571
৩৬. Lushington— P 182
৩৭. ঐ P 222--23
৩৮. Bishop Heber's letter to Wilmot Horton. Dec, 1823
৩৯. Good Old Days of Hon'ble John Company—W. H Carey
৪০. শাস্ত্রী—পৃ ১২১
৪১. ঐ পৃষ্ঠা ১৩৫
৪২. ঐ পৃঃ
৪৩. ঐ, পৃ—১২১
৪৪. Asiatic Journal, May, August, 1835. Quoted from Bengal Hurkaru.
৪৫. উইলসনকে লিখিত ডিরোজিওর পত্র ২৫ এপ্রিল, ১৮৩১।
৪৬. Edwards –Chapter VI
৪৭. Enquirer, 1831
৪৮. উইলসনকে লিখিত ডিরোজিওর পূর্বোল্লিখিত পত্র।
৪৮ ক. ঐ
৪৯. ঐ
৫০. The College & Its Founder—Kissory Chandra Mittra.
৫১. Bengal Renaissance and Other Essay—Sushobhan Sarkar. 1970
৫২. মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৪র্থ সংস্করণ পৃ ৩৬৮
৫৩. India Gazette, Aug 8, 1831
৫৪. Enquirer, 1831
৫৫. Enquirer, 1831
৫৬. East Indian, 15 oct, 1831
৫৭. ঐ

৫৮. India Gazette, 21 oct, 1831

৫৯. ঐ

৬০. India Gazette, 20 oct 1831

৬১. East Indian, 25 Oct, 1831

৬২. ঐ

৬৪. ঐ

৬৪. ঐ 14 Sept, 1831

৬৭. East Indian 17 Dec. 1831

৬৮. ঐ

৬৯. ঐ

৭০. ঐ

৭১. ঐ

৭২. শাস্ত্রী—পৃঃ ৮০

৭৩. India and India missions—Duff P 654

৭৪. An Enquiry Concerning Human Understanding—David Hume P. 131

৭৫. India Gazette—13 Feb, 1832

৭৬. Government Gazette—12 Dec, 1831

# ডিরোজিওর শেষ ইচ্ছাপত্র

নিখিল সরকার

"আমরা খেদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি গত ২৬ ডিসেম্বর সোমবার বেলা দশ ঘণ্টাতীত সময়ে ড্রোজু সাহেবের মরণ হইয়াছে ইহাতে আমরা দুঃখিত হইয়াছি যেহেতু। তাঁহার অত্যল্প বয়স অর্থাৎ চব্বিশ পঁচিশ বৎসরের অধিক নহে, ইহার মধ্যে তিনি অনেক কীর্তি করিয়াছিলেন......"

বাঙ্গালা সমাচার পত্রের মর্ম উদ্ধৃত করে ডিরোজিওর মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করছেন আর এক বাংলা সমাচার পত্র—'সমাচার দর্পণ'। সেদিন ১৮৩২ সনের ৭ জানুয়ারি। একই দিনে ওই কাগজে বিগত বছরের বর্ষফলে বলা হয়েছে : "দিসেম্বর, ২৬। ইস্টিণ্ডিয়ান সম্বাদপত্রের সম্পাদক অতি বিচক্ষণ ড্রজু সাহেব ওলাওঠা রোগে কালবশীভূত হন এবং সকলেই তাহাতে অতি খেদান্বিত।" সুতরাং, জানতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা নেই, ডিরোজিও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৮৩১ সনের ২৬ ডিসেম্বর সোমবার। বস্তুত সেদিনই সন্ধ্যায় 'ক্যালকাটা গেজেট'-এ 'Deaths' শিরোনামায় লেখা হয়—

**"At Calcutta, on the 26th December, Henry Louis Vivian Derozio, Esq., aged 23 years 8 months and 8 days."**

আশ্চর্য, তবু নানা কলমে ডিবোজিওর তিরোভাব তারিখ লিখিত হয়ে আসছে ২৩ ডিসেম্বব। ভুল সংশোধনের জন্য আমাদের অপেক্ষা করে বসে থাকতে হযেছে বলতে গেলে প্রায় একশ' বছর। প্রথম এদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ কবেন ইম্পিবিযাল লাইব্রেরীর এলিয়ট ওয়ালটার ম্যাজ ১৯০৪ সনে তাঁব ডিরোজিও বিষয়ক বক্তৃতায়। বক্তৃতাটি তৎকালেই মুদ্রিত হয়েছিল। কিছুকাল আগে (১৯৬৭ সুবীর রায়চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে পুনর্মুদ্রিত। তাছাড়া ১৯০৯ সনে ম্যাজ-এর তথ্যাবলীর ভিত্তিতে 'বেঙ্গল পাস্ট এণ্ড প্রেজেণ্ট' পত্রিকায় ডিরোজিওর জন্ম মৃত্যুর সঠিক তারিখ প্রকাশিত হয়। পরিষ্কার বলে দেওয়া হয় জন্ম তাঁর ১৮ এপ্রিল (১০ এপ্রিল নয়), ১৮০৯ সন, মৃত্যু—২৬ ডিসেম্বর (২৩ ডিসেম্বর নয়), ১৮৩১ সন। সে বছরই (১৯০৯) ডিবোজিওর সমাধিতে নতুন করে স্থাপন করা হয় এক স্মৃতিলিপি। তাতেও খোদাই করা ছিল এই সংশোধিত তারিখ। ভুল কিন্তু তবু চলছেই চলছে। দায় অবশ্য দুটি প্রধান সূত্রের, 'বেঙ্গল ওবিচুয়ারি' (১৮৪৮) এবং টমাস এডোয়ার্ড লিখিত ডিরোজিও জীবনী ('হেনরি ডিবোজিও, দি ইউরেসিয়ান পয়েট, টিচার অ্যাণ্ড জার্নালিষ্ট, ১৮৮৪)।

এটা ঠিক, তিন দিন আগে অথবা পরে কেউ ভূমিষ্ঠ হলে কিংবা মারা গেলে ইতিহাসেব চোখে খুব একটা হেরফের ঘটে না। তবু যে খুঁত-ধরা বুড়োর মতো প্রথমেই সন তারিখের কচকচি শুরু করতে হল তার কারণ এই নয় যে, আমরা অতিশয় পঞ্জিকাভক্ত কিংবা তিথি-নক্ষত্রে আসক্ত। আসলে এর সঙ্গে বোধহয় জড়িয়ে আছে গবেষণায় নিষ্ঠার প্রশ্নও। যে ভুল অতি সহজে সংশোধন করা সম্ভব তা আঁকড়ে পড়ে থাকার কোনও মানে হয় না। বিশেষত, বয়সে তরুণ হলেও ডিরোজিও যুগ পুরুষ। উনিশ শতকের তৃতীয় প্রহরে হাতে জিয়নকাঠি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি, তাঁর কণ্ঠেই বাঙালী তরুণ প্রথম শুনেছিলেন নবযুগের নতুন বাণী। ডিরোজিও 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর হৃদয়ের রাজা, নবীনের নয়নের মণি। তাঁর সম্পর্কে অহেতুক কোনও অস্পষ্টতা না থাকাই কাম্য। হোক না তা তুচ্ছ কোনও তারিখ।

মৃত্যুকালে, সবাই জানেন, ডিরোজিও কোনও অজ্ঞাতকুলশীল কিংবা

অবজ্ঞাত মানুষ ছিলেন না। বরং ছিলেন এই শহরে রীতিমত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। সাহেবপাড়া, বাঙালীটোলা এবং মধ্যবর্তী ইউরেসিয়ান বা অ্যাংগলো ইণ্ডিয়ান-পল্লী—তিন সমাজেই প্রভূত খ্যাতি তাঁর। অবশ্য ত্রিবিধ কারণে। খাঁটি-সাহেবদের একাংশের কাছে তিনি 'ইউরেসিয়ান' বা অ্যাংগলো-ইণ্ডিয়ানদের একজন মুখপাত্র। অ্যাংগলো-ইণ্ডিয়ান নেতা জন রিকেটস-এর অন্যতম সহযোগী সহকর্মী তিনি। 'দি ইস্ট ইণ্ডিয়ান' কাগজের সম্পাদক ডিরোজিওর বক্তব্য পাক্কা-সাহেবদের পক্ষে অস্বস্তিকর। অ্যাংগলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের কাছে তিনি শুধু আপনজন নন, ডিরোজিওর প্রতিভা তাঁদের কাছে গৌরবের ধন। আর, বাঙালী পল্লীতে ডিরোজিও যে কী ছিলেন উনিশ শতকের তৃতীয় এবং চতুর্থ দশকের আবহাওয়া-সংবাদ সম্পর্কে যাঁরা অবহিত তাঁরা তা জানেন। একদল তরুণের কাছে তিনি যদি দেবতা, সনাতন পন্থীদের চোখে তবে জাগ্রত অপদেবতা। ডিরোজিওর চালচলন সম্পর্কে অতএব সব মহলেরই তীক্ষ্ন নজর, সমান আগ্রহ। তিনি কোন্ স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় যোগ দিয়েছিলেন, বিলাতে গিয়ে অ্যাংগলো-ইণ্ডিয়ানদের দাবীপত্র পেশ করে রিকেটস ফিরে আসার পর তাঁর সম্বর্ধনা-সভায় ডিরোজিও কী বলেছিলেন—খবরের কাগজে নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে সে সব বিবরণ। বাইশ বছরের একজন যুবা সম্পর্কে এই আগ্রহ অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। স্বভাবতই ডিরোজিওর আকস্মিক অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর পরও কাগজে কাগজে বিস্তর লেখালেখি। বলতে গেলে প্রধান, অপ্রধান, কলকাতার প্রায় সমস্ত সংবাদপত্র সবিস্তারে আলোচনা করেছে মৃত্যুর পর ডিরোজিও চরিত। বস্তুত, তাঁর নিজের কাগজ 'দি ইস্ট ইণ্ডিয়ান'-এর পাতায় নাকি দিনের পর দিন চলে জনতার শোকোচ্ছ্বাস। তাই নিয়ে সমালোচনা করেছেন 'বেংগল হরকরা' সম্পাদক।—বাড়াবাড়ি হচ্ছে না কি? বিশেষ করে ওঁর আপন সম্প্রদায়ের শোকার্তরা যে-সব বিশেষণ ব্যবহার করছেন, 'বেংগল হরকরা' সম্পাদক মনে করেন ডিরোজিও বেঁচে থাকলে কিছুতেই সে সব অনুমোদন করতেন না। লক্ষণীয় ব্যাপার এই, 'বেংগল হরকরা' নিজেও কিন্তু প্রকাশ করেছে বিরাট প্রশস্তি। তারপর 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান'-এর সম্পাদকীয় পুনর্মুদ্রণ করে আলোচনাচ্ছলে আবার জানিয়েছেন—ডিরোজিওর প্রশংসায় তাঁরাও

পঞ্চমুখ। তবে তাঁকে শেকসপীয়ার মিলটন-এর সঙ্গে তুলনা করেন নি,—এই যা।

জন হৃদয়ে এমন অনুরাগের আসন পাতা ছিল যাঁর জন্য, তাঁর মৃত্যু শয্যার চারপাশে যে উৎকণ্ঠিত ভিড় গড়ে উঠবে সেটাই স্বাভাবিক। ডিরোজিওর জীবনীকার টমাস এডোয়ার্ড লিখেছেন কলেরা সম্পর্কে কারও মনে ভয় নেই যেন। ডিরোজিওর শয্যা ঘিরে তাঁর হিন্দু কলেজের ছাত্রবন্ধুরা। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।...তাঁরা ডিরোজিওর মা আর বোন অ্যামেলিয়ার উদ্বেগ আর ক্লান্তির শরিক। এছাড়া রয়েছেন পাদ্রি মিঃ হিল। ডঃ টাইটলার, ডঃ উইলসন, ডেভিড হেয়ার, জে ডব্লিউ রিকেটস, ডঃ গ্রাণ্ট প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ। কেউ কাব্য পাঠ করে শোনাচ্ছেন। কেউ পরলোকের কথা বলছেন। ডিরোজিও নাকি তখনও জ্ঞানের জন্য সমান ব্যাকুল, মন তাঁর সমান অনুসন্ধানী। এক সময় চিকিৎসকরা নাকি আশা দিয়েছিলেন, হয়তো তিনি বেঁচে উঠবেন। কিন্তু সব আশা ব্যর্থ হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। ছয়দিন শয্যাশায়ী থেকে বিদায় নিলেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। কবি, শিক্ষক, সাংবাদিক। নবযুগের বাংলার নবীন নায়ক। একটি বাংলা কাগজ লিখছে—"ড্রোজু সাহেবের উপদেশে যে ক'এক জন বালক নষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে তাহারা বড় বিপদগ্রস্ত হইল কেননা তাহারদিগের জ্ঞান ছিল ড্রোজু হর্তাকর্তা বিধাতা। ঐ অবোধেরা পিতামাতার বাক্য হেলন করিয়াও ড্রোজুর আজ্ঞানুবর্তী হইয়াছিল ইহাতে কেহ জাত্যন্তরও হইয়াছে তাহাতেও তাহারা দুঃখী নহে ড্রোজুর মরণে তাহারা জীবন্মৃত প্রায় হইয়া থাকিবেক।..."

এই 'জীবন্মৃত প্রায়' তরুণ দল কি জানতেন তাঁদের বন্ধু, তাত্ত্বিক এবং পথপ্রদর্শক যখন রোগ যন্ত্রণায় ছটফট করছেন, তখনই মাঝপথে এক সময় ডাক পড়েছিল কালি-কলমের? তাঁর সামনে মেলে ধরা হয়েছিল একখণ্ড কাগজ, আর তাতেই পালকের কলমে নিজের হাতে নির্ভুল গদ্যে ডিরোজিও লিখেছিলেন তাঁর শেষ লেখা, তাঁর শেষ ইচ্ছাপত্র? সম্ভবত নয়। সত্যি বলতে কী, ডিরোজিওকে নিয়ে এ-পর্যন্ত অনেক কিছুই লেখা হয়েছে। শুধু এডোয়ার্ড আর ম্যাজ নন, একালেও বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট গবেষক আন্তরিক চেষ্টা করেছেন 'ইয়ং বেঙ্গল'এর মন্ত্রগুরু ডিরোজিওর মূল্যা-

য়নের। কিন্তু এই উইলটি কেউ দেখেছেন বলে মনে হয় না। কোনও রচনায় তার উল্লেখ অন্তত আমাদের চোখে ধরা পড়ে নি। অথচ ডিরোজিও নামে যে বিয়োগান্ত জীবন-নাট্য তাতে আড়াই পৃষ্ঠার এই ইচ্ছাপত্রটিও অনায়াসে যুক্ত হতে পারে আরও একটি হৃদয়-বিদারক দৃশ্য হিসাবে। বিশেষত, এই উইলের পরবর্তী ঘটনাবলী সত্যিই মর্মান্তিক।

উইলটি যে এতকাল গবেষকদের ফাঁকি দিতে পেরেছে তার পিছনে অবশ্য একটা কারণ ছিল। ডিবোজিও ত্রস্ত হাতে এই ইচ্ছাপত্র লেখেন মৃত্যুর তিনদিন আগে, ডিসেম্বরের ২৩ তারিখে। আর তার তিনদিন পরে, কবরের মাটি শুকোতে না শুকোতে দেখি উইলে উক্ত কর্মকর্তাদের একজন ছুটতে ছুটতে সেটি নিয়ে জমা দিচ্ছেন সুপ্রিম কোর্টের হাতে। তিনি অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে নিজের দায়দায়িত্বের কথা ঘোষণা করছেন, আইনজীবী নিযুক্ত করছেন। হরেক কৃত্য তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ। তারিখ সবে তখন ২৯ ডিসেম্বর, ১৮৩১। পরদিন, অর্থাৎ ৩০ ডিসেম্বর তারিখে সব কাগজপত্র দেখে আদালত মেনে নিলেন উইলের অন্যতম নিয়ামক হিসাবে তাঁর অধিকার। তারপর থেকে এই দলিল সুপ্রিম কোর্টের জীবতকাল পর্যন্ত তাঁদের হাতেই ছিল। পরবর্তীকালে তাদের হেফাজত থেকে স্থানান্তরিত হয় হাইকোর্টের মহাফেজখানায়। অগণিত দলিল দস্তাবেজের ভিড়ে এতকাল সেখানেই হারিয়ে ছিল হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর আপন হাতে লেখা এই কাগজের টুকরোখানি। সম্প্রতি আরও কিছু মূল্যবান ঐতিহাসিক নথিপত্রের সঙ্গে দৃশ্যত অকিঞ্চিৎকর এই উইলটিও এসেছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের হেপাজতে। তাঁদের সৌজন্যেই আমরা সুযোগ পেয়েছিলাম এটি দেখবার এবং খুঁটিয়ে পরখ করবার। এজন্য ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ মেমোরিয়ালের কিউরেটার সেক্রেটারী নিশীথরঞ্জন রায় মশাইয়ের কাছে। তাঁর সাহায্য এবং সহযোগিতা ছাড়া উইলটির পাঠোদ্ধার সহজ ছিল না। কেননা, উইলের সর্বাঙ্গে কালের নখচিহ্ন, কাগজ জীর্ণ, লিপি বিবর্ণ। সুতরাং পাঠে কিছু ভুলভ্রান্তি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। সে-সব শোধরাবার দায়িত্ব ডিরোজিও-গবেষকদের উপর রইল। আপাতত আমরা কাগজখানার উপর পল্লবগ্রাহীর মতো চোখ বুলিয়ে যাচ্ছি মাত্র।

তার আগে সংক্ষেপে ডিরোজিওব জীবন সম্পর্কে অনেকবার শোনা তথ্যগুলো আর একবার শুনে নিতে দোষ নেই। বরং তাতে উইলের পাত্র-পাত্রীদের চট করে চেনার পক্ষে সুবিধা। সবাই জানেন, ডিরোজিওর পূর্ব-পুরুষ পর্তুগীজ। তাঁব ধমনীতে পুব আর পশ্চিমের রক্ত। বাবা ফ্রান্সিস ডিরোজিও ছিলেন কলকাতার জেমস স্কট অ্যাণ্ড কোং নামে একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবরক্ষক। সম্পন্ন মধ্যবিত্ত পরিবার। ১৫৫ নম্বর লোয়ার সার্কুলার রোডে ও'দের নিজস্ব বাড়ি। মায়ের নাম—সোফিয়া জনসন। ফ্রান্সিস ডিরোজিওর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় ১৮০৬ সনে। পাঁচটি ছেলেমেয়ে রেখে সোফিয়া মারা যান ১৮১৫ সনে। পরেব বছর ফ্রান্সিস ডিরোজিও আনা মারিয়া নামে একজন বয়স্ক ইংরেজ মহিলাকে বিয়ে করেন। তাঁর নিজের কোনও সন্তান ছিল না। স্বামীর আগের তরফের সন্তানেরাই আপন ছেলেমেয়ের মতো। আনা স্বামী হারান বিয়ের চৌদ্দ বছর পরে। ফ্রান্সিস ডিবোজিওব মৃত্যু ১৮৩০ সনে।

পাঁচ ভাইবোনেব মধ্যে সকলেব বড় ছিল ভাই ফ্রাঙ্ক। সে নাকি সঙ্গীতে কৃতবিদ ছিল। শোনা যায, বয়স যখন কুড়ির কাছাকাছি তখন সে আত্মঘাতী হয়। দ্বিতীয় হেনরি ডিরোজিও, যার জন্য এক দিন আলোড়িত আমাদের সমাজ-সংসার—মনোরাজ্যে ঋতু বদলের পালা। তৃতীয় ক্লডিয়াস গিলবার্ট অ্যাসমোর। ভাই হেনরির মৃত্যুর আগে লেখাপড়া শিখতে সে বিদেশ যাত্রী হয়েছিল। ক' বছর পরে স্কটল্যাণ্ড থেকে এদেশে ফিরে এসে সেও চলে গেল (১৮৩৬)। তখন তাঁর বয়স মোটে বাইশ। বোন ছিল দুটি। বড় সোফিয়া মারা যায় সতের বছর বয়সে, ১৮২৭ সনে। ভাই হেনরি যখন মারা যান, বাড়িতে তখন মা ছাড়া রয়েছে শুধু ছোট ভাই ক্লডিয়াস আর প্রিয় বোন আমেলিয়া। যাঁকে নিয়ে বৃন্দাবন ঘোষালের মুখে নানা রটনা, যার প্রশ্নের উত্তরে একদিন সকালে খাবার টেবিলে ডিরোজিও নিঃশব্দে রেখে গিয়েছিলেন সেই কবিতা—"এ সিসটার-ইন ল, মাই সিসটার ডিয়ার,/এ সিসটার ইন-ল ফর দী ?" এই বোনটির কথা পরে।

লক্ষণীয় ব্যাপার এই, ডিরোজিও এবং তাঁর ভাইবোনেরা কেউই দীর্ঘজীবী হননি। সেদিক থেকে খুবই দুঃখী পরিবার ও'দের। ম্যাজ

একটি কাহিনী শুনিয়েছেন ডিরোজিও সম্পর্কে · একবার তাঁর কোনও ছাত্র নাকি ডিরোজিওকে পরিচয় করিয়ে দেন একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে। সন্ন্যাসী পরে সেই ছাত্রটিকে বলেন—দেখ, তোমাদের গুরুর নাম আমি জানি না। তবে এটা বলে দিচ্ছি তাঁর নামে যত অক্ষর আছে, সে তার চেয়ে বেশী বছর বাঁচবে না। ইংরাজীতে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও লিখতে অক্ষর লাগে তেইশটি। ডিরোজিও তেইশতম বছরেই মারা যান।

ডিরোজিওর জন্ম-কর্ম সবই এই কলকাতায়। চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া শিখেছেন ডেভিড ড্রামণ্ড সাহেবের ধর্মতলা অ্যাকাডেমিতে। ড্রামণ্ড ধর্মে সংশয়বাদী, আদর্শে যুক্তিপন্থী। তিনি অন্য ধরণের শিক্ষক। অনেকেই মনে করেন ডিরোজিও যে ডিরোজিও হলেন সে এই গুরুর জন্যই। স্কুলের পড়া চুকিয়ে হেনরি কিছুদিন কাজ করে-ছিলেন বাবার অফিসে, জেমস স্কট কোম্পানিতে। কিন্তু ভাল লাগল না। কাজ ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেলেন ভাগলপুরে এক পিসেমশাইয়ের কাছে। তিনি নীলকুঠির মালিক ছিলেন। জীবনীকাররা বলেন—ডিরোজিওর কাব্য প্রতিভা মুকুলিত হয় সেখানেই, ভাগলপুরের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে। সেখান থেকেই 'জুভিনিস' ( 'Juvenis' ) নামে কলকাতার কাগজে কাগজে কবিতা পাঠাতেন তিনি। বিশেষ করে 'দি ইণ্ডিয়া গেজেট'-এ। তারপর কলকাতায় ফিরে এসে পরিপূর্ণ চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ। ডিরোজিও 'ইণ্ডিয়া গেজেট'-এর সাব-এডিটার। তিনি কবি। তাঁর প্রথম কবিতার বই ছাপা হচ্ছে। তিনি 'দি হেসপিরাস' ( The Hesperus ) নামে একটি সান্ধ্য কাগজ সম্পাদনা করেন। তিনি শিক্ষক হিসাবে যোগ দিচ্ছেন হিন্দু কলেজে। 'সমাচার দর্পণে' খবর ( ১৩ মে, ১৮২৬ )—"ইংরাজী পাঠশালায় ডিয়ারম্যান নামক একজন গোরা আর ডিরোজী সাহেব এই দুইজন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন।"...... ডিরোজিও কলেজের চতুর্থ শিক্ষক। মাসে মাইনে তাঁর দেড়শ' টাকা। তখন তাঁর বয়স মোটে সতের বছর।

চতুর্থ শিক্ষক কি করে কার্যত প্রায় একমাত্র শিক্ষকের ঠাঁই করে নিয়েছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্রদের হৃদয়ে, সে-কাহিনী এখানে অবান্তর। একটি ছাড়পত্রের কাজ করেছে অবশ্য বয়স। গুরুর সঙ্গে প্রধান শিষ্যদের

দূরত্ব ছিল যৎসামান্য। ডিরোজিওর বয়স যখন বাইশ বছর, কৃষ্ণমোহনের বয়স তখন আঠারো, দক্ষিণারঞ্জনের সতের, রামগোপালের ষোল। তাছাড়া, তহবিলে ছিল বিদ্যা, বুদ্ধি, সাহস। সর্বোপরি প্রতিভা। সুতরাং, 'এলাম, দেখলাম, জয় করলাম' ভঙ্গী তাঁর।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিতর্ক সভা 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন', বা 'পার্থিনন' নামক কাগজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা—এসব নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক আলোচনা হয়েছে। আরও হবে। আলোচনার অবকাশ এখনও অনেক। আমরা উইলটি মেলে ধরার আগে তাঁর জীবনের একটা রূপরেখা দিয়েই ক্ষান্ত থাকতে চাই। কলেজে যোগ দেওয়ার চার বছরের মধ্যে ঝড়, ভূমিকম্প। সংস্কারে আচ্ছাদিত আমাদের কুটিরগুলো বুঝি মুখ থুবড়ে পড়ে। সনাতন ভিতে চিড় ধরার উপক্রম। সুতরাং ও'রা প্রত্যাঘাত হানলেন। ডিরোজিও পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। অবশ্য নীরবে নয়। প্রতিবাদসহ। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষবর্গ এবং কলেজের ভিজিটার এইচ এস উইলসনের কাছে লেখা তাঁর চিঠিগুলো স্মরণীয় ঐতিহাসিক দলিল। বাংলা খবরের কাগজে যখন লেখা হচ্ছে ২৮ এপ্রিল, ১৮৩১—"শুনিয়াছি (কর্মাধ্যক্ষরা) শ্রীযুত ডেরোজু নামক একজন টিচার অর্থাৎ শিক্ষককে কর্ম হইতে রহিত করিয়াছেন", ডিরোজিও তখন হিন্দু কলেজের ম্যানেজিং কমিটিকে পদত্যাগ পাঠাতে বসে লিখছেন—অপরাধী যে, তাকে জেরা করা হল না, সে জানল না কী তার অপরাধ। অথচ এক তরফা বিচার হয়ে গেল। দণ্ডদানের পর্বও শেষ। আশা করি, এসব সত্য বলে স্বীকার করতে আপনারা সংকোচ বোধ করবেন না। তাহলেই আমি খুশি।......

১৮৩১ সনের এপ্রিলে পদত্যাগ, ডিসেম্বরে মৃত্যু। মাঝখানের কয়টি মাসও চুপচাপ বসে ছিলেন না ডিরোজিও। ইতিমধ্যে দুই দুইটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। কবি হিসাবে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। সমালোচকরাও স্বীকার করেন—প্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর কবিতায়। 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর কাগজ 'এনকোয়ারার'-এর পিছনে অন্যতম প্রেরণা তিনি। তখনও তিনি তাঁদের মন্ত্রদাতা। জুন মাসের ১ তারিখে শোনা গেল—"দেরাজু ইস্টিন্ডিয়ান নামক এক সংবাদপত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করেন।"

সেপ্টেম্বরে 'ইস্ট ইন্ডিয়া' সম্পাদককে দেখা গেল উত্তর কলিকাতায় হিন্দু ফ্রী স্কুলের প্রথম ত্রৈমাসিক পরীক্ষার দিনে। স্কুলটি হিন্দু স্কুলের একজন ছাত্রের প্রতিষ্ঠিত। কাগজ লিখছে হাজির ছিলেন "শ্রীযুত হের সাহেব ও শ্রীযুত দ্রাজু সাহেব।" কেউ কেউ লিখছেন—জনসমক্ষে তাঁর শেষ উপস্থিতি ডিসেম্বরের ১৩ তারিখে, প্যারেনটাল অ্যাকাডেমির নবম পুরস্কার বিতরণী সভায়। কিন্তু ২৪ ডিসেম্বরের 'সমাচার দর্পণ' জানাচ্ছে— ডিসেম্বরের ১৭ তারিখে ধর্মতলায় নিজের পুরানো স্কুলের ছাত্রদের পরীক্ষা নিয়েছেন তিনি। ছাত্রদের 'একট ও স্পিচ' ইত্যাদি অবলোকন করে নাকি আমোদিত হয়েছেন। তারপর হঠাৎ অসুস্থতা। রোগশয্যা। মৃত্যু। আর মৃত্যুর তিন দিন আগে কাগজ টেনে নিয়ে দোয়াতে কলম ডুবিয়ে টানা হাতে লিখে যাওয়া—"দিস ইজ দি লাস্ট উইল অ্যাণ্ড টেস্টামেণ্ট অব মিঃ হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও অব সার্কুলার রোড ক্যালকাটা ইন দি প্রভিন্স অব বেঙ্গল অ্যাণ্ড অব নাম্বার ৯ কসাইটোলা স্ট্রীট ইন দি টাউন অব ক্যালকাটা ইন দি সেইড প্রভিন্স অব বেঙ্গল ''।

ডিরোজিওর কোনও রচনার সঙ্গে মিল নেই তাঁর এই গদ্যের। নিতান্ত আইনের ভাষা। তিনি এখানে কবি নন, সাংবাদিক নন, প্রতিবাদী কোনও তুখোড় পত্রলেখক নন, নিছক একজন গৃহস্থ। উইলসন বা হিন্দু কলেজের কর্তাদের কাছে লেখা চিঠিগুলোর তুলনায় এই উইলের ভাষা অত্যন্ত সাদামাটা। বক্তব্যও একান্তভাবেই ঘরোয়া, পাঁচজনকে শোনানোর মত কিছু নয়। তবু যে এটি খুলে বসার কৌতূহল, সে অন্য কারণে। আমাদের পরিচিত যে ডিরোজিও তাঁর কিছুই কি খুঁজে পাব না এতে?

সাদা বাংলায় উইলের বক্তব্য: আমার মৃত পিতা আমাকে শর্তাধীনে কিছু সম্পত্তি দিয়ে গেছেন। আমার ইচ্ছা সেই সব শর্ত পূরণ না করা পর্যন্ত যেন সেই অংশ বিক্রি করা না হয়। সম্প্রতি আমি দি ইস্ট ইণ্ডিয়ান নামে যে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করেছি, আমার ইচ্ছা, আমার ভাই ক্ল্যাডিয়াস গিলবার্ট অ্যাসমোর ডিরোজিও তা পরিচালনা করবে। তবে শর্ত এই, কাগজের যে ঋণ আছে এবং ভবিষ্যতে যে ঋণ হতে পারে তার দায়িত্ব তাকে নিতে হবে। আমার সব ন্যায্য ঋণ মিটিয়ে দেওয়ার পর

আমার সম্পত্তির যা অবশিষ্ট থাকবে, তা আমার ভাই ক্ল্যাডিয়াস গিলবার্ট অ্যাসমোর ডিরোজিও এবং বোন অ্যামেলিয়া ডিরোজিওর মধ্যে সমান-ভাবে ভাগ করে দিতে হবে। আমার ভাই তার অংশ পাবে একুশ বছর বয়সে পৌঁছালে; বোন তাঁর অংশ পাবে একুশ পূর্ণ হলে, বা তার বিয়ের দিনে—যা আগে ঘটে। আমার ইচ্ছা আমার ভাই ক্ল্যাডিয়াস গিলবার্ট অ্যাসমোর ডিরোজিও আমার মৃত পিতার বিধবা আনা মারিয়া ডিরোজিওর ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। সে যদি তা না করে তবে আমি তাকে যে সম্পত্তি দিচ্ছি তার এক-তৃতীয়াংশ থেকে সে বঞ্চিত হবে, এবং ওই অংশ পাবেন আমার মৃত পিতার বিধবা আনা মারিয়া ডিরোজিও। এতদ্দ্বারা আমি জেমস ক্যালডন এসকোয়ার, ডানিয়েল মিকিনস কিং এবং একুশ উত্তীর্ণ হওয়ার পর ক্ল্যাডিয়াস গিলবার্ট অ্যাসমোর ডিরোজিওকে আমার এই শেষ ইচ্ছাপত্রের কার্যকারক নিযুক্ত করছি এবং ইতিপূর্বে সম্পাদিত আমার অন্য সব ইচ্ছাপত্র বাতিল বলে ঘোষণা করছি।

তারপরই টানা হাতে বিখ্যাত সেই স্বাক্ষর—"এইচ এল ভি ডিরোজিও।" বাঁপাশে সই করেছেন সাক্ষীরা। ড্যানিয়েল মিকিনস কিং জনৈক বয়...... (বাকি নামটুকু পড়তে পারিনি) এবং আনা ডিরোজিও। উইলের তারিখ—"টুয়েনটিথার্ড অব ডিসেম্বর ওয়ান থাউসেণ্ড এইট হানড্রেড অ্যাণ্ড থার্টি ওয়ান।" সইয়ের একপাশে লাল শিলমোহর। একটু নজর করলেই বোঝা যায় গালার ওপর বুড়ো আঙুলের ছাপ, হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর টিপসহি।

এই উইলটি কি নিছক একটি পারিবারিক দলিল? ডিরোজিও কি এতে আমাদের জন্য কিছুই রেখে যাননি? খুঁটিয়ে পড়লে কিন্তু একেবারে শূন্য হাতে ফিরতে হয় না আমাদের। অন্তত শেষবারের মতো বিদ্রোহী সেই তরুণটিকে একবার দেখার সুযোগ পাই আমরা এই ছিন্নপত্রে। সুযোগ পাই আরও একবার তাঁকে নিবিড়ভাবে জানবার।

ডিরোজিওর বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত ছিল না। হিন্দু কলেজের দেশীয় অধ্যক্ষরা উন্মত্তের মতো তাঁর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগই এনে-ছিলেন। তার মধ্যে একটি ছিল ডিরোজিও তার ছাত্রদের মা বাবার বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ করার জন্য উস্কানি দিচ্ছেন। উইলসন তাঁর চিঠিতে কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে ডিরোজিওর মুখের ওপর সরাসরি যে তিনটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলেন তার একটি ছিল—তুমি কি মনে কর যে মা বাবার আদেশ মান্য করা বা তাঁদের শ্রদ্ধাভক্তি করা নৈতিক কর্তব্য নয়? ডিরোজিও তাঁর দীর্ঘ উত্তরে অনেক কথাই বলেছিলেন। বলেছিলেন—আমি পিতৃহারা। তা না হলে আমার বাবাই সমুচিত জবাব দিতে পারতেন এই সব অপপ্রচারের। জবাবে তিনি বলতে পারতেন যে ছেলে মা-বাবার প্রতি কর্তব্যপালনে কখনও চেষ্টাব কোনও ত্রুটি রাখেননি তার পক্ষে এমন পরামর্শ দেওয়া কী করে সম্ভব? এখনও আমার মা বেঁচে আছেন, তিনিও বলতে পারবেন এই অভিযোগ আমার চরিত্রেব সঙ্গে কত অসঙ্গতিপূর্ণ। ইত্যাদি। মৃত্যুর পবে সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন পুত্র, ভাই এবং বন্ধু হিসাবে ডিরোজিওব তুলনা হয় না। একটি কাগজ লিখেছিল—তিনি স্নেহশীল পুত্র, হৃদয়বান ভ্রাতা, অন্তরঙ্গ বন্ধু।

ডিরোজিওর উইল বোধহয় তারই স্বপক্ষে আর এক দফা প্রমাণ। এই ইচ্ছাপত্রে অবশ্য কোনও বন্ধু বা শিষ্যের উল্লেখ নেই। কিন্তু যে ভাবে তিনি পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলি বণ্টন করছেন তাতে বোঝা যায় পরিবারের সকলেব সঙ্গে তাঁব কেমন ভালবাসার সম্পর্ক। বোন অ্যামেলিয়ার সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতার কথা আমরা জানি। দাদার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন তিনি। অ্যামেলিয়ার কাছে আবার দাদাই ছিলেন সব। উইলেও তিনি উপস্থিত। ডিরোজিও যখন মারা যান অ্যামেলিয়ার বয়স তখন আঠারো। মা আছেন, ভাই আছে,—অনায়াসে এই ভাগাভাগি থেকে দূরে রাখতে পারতেন তাঁকে। কিন্তু ডিরোজিও তা করেননি। লক্ষণীয় —উইলে পরিবারের একজনই সাক্ষী। তিনি—আনা ডিরোজিও। হেনরির বিমাতা। উইলে এমন কি বিমাতার ভবিষ্যৎ চিন্তায় রীতিমত উদ্বিগ্ন যেন ডিরোজিও। ভাইয়ের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেই তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না, ভাই যদি কর্তব্য পালন না করে সেক্ষেত্রে কী করা হবে তাও স্পষ্টভাষায় জানিয়ে যাচ্ছেন।

তবে এসবের চেয়েও চমকপ্রদ বোধহয় উইলে ঈশ্বরের অনুপস্থিতি। শেষ ইচ্ছাপত্র। কিন্তু কোথাও নেই ঈশ্বরের নামে কোনও শপথবাক্য।

এটা কি ইচ্ছাকৃত ? জানি না। তবে সবাই জানেন ডিরোজিওর ধর্মমত ছিল তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলনের অন্যতম উপলক্ষ। উইলসনের প্রসিদ্ধ তিন প্রশ্নের একটি ছিল—তুমি কি নাস্তিক ? উত্তরে ডিরোজিও যে-বাক্য-গুলো লিখেছিলেন তার যুক্তির ধারা এবং বক্তব্যের গভীরতা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। একসময় নাকি তিনি কাণ্ট-এর আলোচনা করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা-কালে লেখা তাঁর "অবজেকশনস টু দি ফিলজফি অব ইমান্যুয়েল কাণ্ট" পড়ে একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ নাকি মন্তব্য করেছিলেন—প্রতিভাশালী দার্শনিকের পক্ষেও এ রচনা গৌরবজনক। চিঠির এই অংশটি পড়লেও সন্দেহ থাকে বাইশ বছরের তরুণের স্কন্ধে স্থাপিত মাথাটি ছিল প্রবীণ প্রাজ্ঞের। নিপুণ হাতে বোনা তাঁর যুক্তিতর্কের জালটি এড়িয়ে দু'একটি বাক্য মাত্র পড়ে শোনাচ্ছি। উইলসনকে তিনি লিখছেন—

"I am neither afraid nor ashamed to confess having stated the doubts of philosophers upon the existence of a God, because I have also stated the solution of those doubts······ that I should be called a sceptic and an infidel is not surprising. as these names are always given to persons who dare think for themselves in relegion."

মৃত্যুশয্যায় ডিরোজিও নাকি রিকেটসকে অনুরোধ করেছিরেন পাদ্রি হিলকে একবার পাঠিয়ে দিতে। ডিরোজিও নাকি জীবনের শেষ মুহূর্তে স্বীকার করেন তিনি খ্রীষ্টান, তিনি—বিশ্বাসী। ডিরোজিওর শিষ্যদের একজন মহেশচন্দ্র অবশ্য অন্য কথা বলে গেছেন। তিনি নিজে খ্রীষ্টান হয়েছিলেন। তাঁর সাক্ষ্য—মৃত্যুশয্যায়ও ডিরোজিওর কথা ছিল ধর্ম বা ঈশ্বর সম্পর্কে চূড়ান্ত সত্য কী তা আমি এখনও জানি না। আমার অনুসন্ধান এখনও শেষ হয়নি। তবে মৃত্যুর পর কাগজে কাগজে বলা হয়েছে—অন্তিম-কালে ডিরোজিও আস্তিক হয়েছিলেন। 'ইণ্ডিয়ান গেজেট' থেকে ১৮৩২ সনের ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'ক্যালকাটা গেজেট' ডিরোজিও সম্পর্কে যে দীর্ঘ প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করেছেন তাতে স্পস্ট বলা হয়েছে এ-সংবাদে খ্রীষ্টান

মাত্রই আনন্দিত হবেন। তবে কেউ কেউ হয়তো প্রশ্ন তুলবেন—এটুকুই কি যথেষ্ট? তার উত্তরে গেজেটের বক্তব্য—পবিত্রাণের পক্ষে এটুকুই পর্যাপ্ত। এসব আলোচনার ভিত্তিতেই বোধ হয় একটি বাংলা কাগজ মন্তব্য করেছিল —"ড্রোজু পূর্বাপেক্ষা ইদানীং এমত হইয়াছিলেন ঈশ্বর একজন আছেন ইহা প্রায় স্বীকার করিযাছিলেন।"

মৃত্যুর তিন দিন আগে লেখা উইলে সে ধরনের কোনও স্বীকৃতি নেই। হয়তো এ জাতীয় ইচ্ছাপত্রে তার কোনও সুযোগ ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু একই উইল আদালতে পেশ করতে গিয়ে ড্যানিয়েল মিকিনস্ কিং কিন্তু ধর্মপ্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। ডিরোজিওকে তিনি বিশেষিত করেছেন একজন 'খ্রীস্টান প্রজা' হিসাবে। সুতরাং, সেদিনের 'ইয়ং বেঙ্গল' বা ডিরোজিয়ানরা হয়তো এই ইচ্ছাপত্রটিকে বুকে আঁকড়ে ধরতেন, সগর্বে বলে বেড়াতেন ডিরোজিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি, মৃত্যুদিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন সত্যসন্ধানী। 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর ধর্মচেতনা বিষয়ে কৃষ্ণদাস পাল বলেছিলেন—তাব ধর্ম রিলিজিয়ন অব হার্ট, হৃদয়ের ধর্ম। আপন ঘরই তার কাছে মন্দির, সে নিজেই তার পুরোহিত। যে সুগন্ধি ধূপে আমোদিত তার ঘর তার নাম আন্তরিকতা, আর অর্ঘ্য তার—ভালবাসা। সৌভ্রাতৃ সুলভ সে-প্রেম সর্বজনীন, স্বর্গীয়। শিষ্য প্যারীচাঁদ মিত্র এবং কিশোরীচাঁদ মিত্রের ধর্ম সম্বন্ধীয় আলোচনাতেও একই উদার মানবধর্মের প্রতিধ্বনি। সুতরাং, ডিরোজিওর উইল এবং টেস্টামেন্টে কোনও বিশেষ ধর্মের প্রতি আস্থার কথা থাকা না-থাকার মধ্যে কিছু পার্থক্য হয়তো নিশ্চয়ই খুঁজে পেতেন তাঁর প্রিয় শিষ্যবর্গ, সংশয় আর সন্দেহের দোলায় সেদিন দোদুল্যমান যাঁদের হৃদয় মন। তাই বলছিলাম, আপাতদৃষ্টিতে অকিঞ্চিৎকর হলেও ডিরোজিওর এই শেষ ইচ্ছাপত্র বোধহয় তাঁর অনুরাগীদের কাছে একেবারে তাৎপর্যহীন নয়।

উইলের কথা আপাতত এখানেই শেষ। কিন্তু তারপর? আমরা জানি, ডিরোজিওর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর রণধ্বনি হাওয়ায় বিলীন হয়ে যায়নি। কেননা, নিছক একটা হুজুগ নয়। 'ইয়ং বেঙ্গল' কেবলই নিষিদ্ধ খাদ্য আর মদ্য নয়। ডিরোজিও এবং তাঁর অনুরাগীরা যে বাতাস থেকে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন তাতে নানা সুবাস।

ফরাসী বিপ্লব। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ। ইংল্যাণ্ডে র‍্যাডিকেল-ইজম-এর অভ্যুদয়। ভাসতে ভাসতে দূর গঙ্গাতীরেও এসে পৌঁছেছিল প্রস্ফুটিত সেই সব পুষ্পের রেণু। 'ইয়ং বেঙ্গল হার্ড ড্রিঙ্কিং' আর 'ইয়ং বেঙ্গল হার্ড রিডিং'কে দুটি আলাদাভাবে ভাগ করেছেন একজন ডিরোজিয়ান। দ্বিতীয় দলের হাতে হাতে ফিরছে তখন বেকন, হিউম, টম পেইন। 'এজ অব রিজন'-এর জন্য কাড়াকাড়ি লেগে যায় তাদের মধ্যে। ডিরোজিওর আকস্মিক মৃত্যু, সন্দেহ নেই, তাঁদের পক্ষে প্রচণ্ড এক আঘাত, কিন্তু তবু তাঁরা রণভঙ্গ দিলেন না, এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন সামনের দিকে। পেছনে তাকালে আজকের সন্ধানীর যেমন চোখ এড়াবে না ডিরোজিওর আবির্ভাবের অব্যবহিত আগে রামমোহনের আন্দোলনের ফলে রচিত পট-ভূমিখানি ঠিক তেমনই ডিরোজিওর পরবর্তী অধ্যায়ের দিকে পা-বাড়াতে চাইলে তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় অবহেলা ভরে 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীটিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া। কোনও কোনও পর্যবেক্ষক মনে করেন ডিরোজিও এদেশে প্রথম জাতীয়তাবাদী। তিনি এদেশের প্রথম দেশপ্রেমিক। তাঁর মৃত্যুর পর ডিরোজিও শিষ্যরাও কিন্তু অগ্রণী নানা ক্ষেত্রে। 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'-এর তৎপরতা অবশ্য বন্ধ হয়ে যায় ডিরোজিওর জীবতকালেই। ১৮৩৮ সনে ও'রা স্থাপন করেন 'সোসাইটি ফর অ্যাকুইজিশন অব জেনারেল নলেজ' বা 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'। ১৮৩৮ সনে তাঁদের উদ্যোগেই স্থাপিত হয় 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' পরবর্তী কালে যা রূপান্তরিত হয় 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' এ। সমসাময়িক ল্যাণ্ড-হোল্ডারস অ্যাসোসিয়েশন বা জমিদারীসভা যদি পয়সাওয়ালাদের আড্ডা, তবে এ'দের গড়া প্রথম সংগঠনটিতে মাথাওয়ালাদেরই ভিড়। এই সব সংগঠনের ঐতিহাসিক ভূমিকা অস্বীকার করতে পারেন না কেউ। বস্তুত দাস বিরোধী আন্দোলনের নেতা জর্জ টমসনকে নিয়ে কলকাতায় যে হৈ-হল্লা তার পুরোভাগে যেমন 'ইয়ং বেঙ্গল', তেমনই ধর্মের নামে চড়কে নিষ্ঠুরতা, বা হোলিতে অসভ্যতা থেকে শুরু করে অন্তর্জলির মতো প্রথার বিরুদ্ধেও তারাই মুখর। স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারে কিংবা বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে—কোথায় নেই ও'রা? ও'দের মুখপত্র 'এনকোয়ারার', 'জ্ঞানান্বেষণ' কিংবা 'বেঙ্গল স্পেকটেটর'-এর সওয়ালধারা, যুক্তির তীক্ষ্ণতা এবং দৃষ্টিভঙ্গীর উদারতা দেখলে বোধহয় সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে,

ডিরোজিওর সার্থক উত্তরাধিকারী ছিলেন ও'রা। মৃত্যুর পরও ডিরোজিও অনেকদিন বেঁচেছিলেন ওঁদের মধ্যে।

কিন্তু উইলের পাত্রপাত্রীরা? ডিরোজিওর পরিজন পরিবার? তাঁদের কান্না কিন্তু ১৮৩১ সনের সেই শীতের সকালেই শেষ হয়ে যায়নি। ওঁদের দুঃখের রজনী অতি দীর্ঘ। সত্যি বলতে কী, সে রাত্রি কোনও দিন আর ভোর হয়নি ১৫৫ নম্বর লোয়ার সার্কুলার রোডের ওই বাড়িটিতে, ওঁদের পারিবারিক ভদ্রাসনে, যেখানে হেনরির জন্ম এবং মৃত্যু।

শোকের আঘাত সামলাতে না সামলাতে ওঁদের চোখের সামনে পলকে তছনছ হয়ে গেল সব। হেনরির স্মৃতিরক্ষা তো পরের কথা, অতঃপর নিজেদেরও বুঝি আর রক্ষা করা যাবে না। উইলের মতোই মর্মান্তিক তার পরের অধ্যায়। সে-কাহিনীর আগে ডিরোজিওর স্মৃতিরক্ষা উপলক্ষে বন্ধু এবং শিষ্যদের যে বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা হয়েছিল প্রসঙ্গত তাও উল্লেখযোগ্য।

ডিরোজিওর তিরোভাবের মাত্র কয়দিন পরে শহরে আয়োজিত হয় এক বিরাট শোকসভার। ১৮৩২ সনের ১১ জানুয়ারি 'সমাচার দর্পণ' জানাচ্ছে: 'গত ৫ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে মৃত ড্রজু সাহেবের স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপনকরণ বিষয়ে পারেন্তাল আকাদেমিতে অনেকের সমাগম হয়। তাহাতে শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষ এই প্রস্তাব করিলেন যে, সরকারী চাঁদার দ্বারা যে মৃত ড্রজু সাহেবের বিষয়ে আমরা সকলেই এইক্ষণে খেদার্ণবে মগ্ন তাহার চিরস্মরণার্থ চিহ্নস্বরূপ এক প্রস্তরময় কবর নির্মাণ করা যায় এবং তদুপরি তদপ্রযুক্ত কথা-প্রবন্ধ ক্ষোদিত থাকে, তাহাতে শ্রীযুত উএল বর্ণ সাহেব পৌষ্টিকতা করিলেন এবং আরও সকলে সম্মত হইলেন। তৎপর এই প্রস্তাব হইল যে, কবরের খরচ করিয়া যদি চাঁদার টাকা কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তবে তাহা ড্রজু সাহেবের পরিজনেরদিগকে প্রদানার্থ প্রস্তাব করা যায়। তদনন্তর চাঁদা বহী সকলকে দর্শান গেল এবং সেই স্থানেই ৯০০ টাকার স্বাক্ষর হইল।'

১৮৩২ সনের ৯ জানুয়ারি তারিখে 'ক্যালকাটা গেজেট'এ এই সভার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। সভার সভাপতিত্ব করেছিলেন

আসলে ইউরেসিয়ান অথবা অ্যাংগলো ইণ্ডিয়ান নেতা জে ডব্লিউ রিকেটস। মহেশচন্দ্র ঘোষ স্মরণচিহ্ন স্থাপন বিষয়ক প্রস্তাবের উত্থাপক। ডিরোজিও শিষ্যদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় স্মৃতিরক্ষা কমিটিতে ছিলেন। ছিলেন ডেভিড হেয়ারও। সভায় মিঃ স্টেপলটন নামে একজন শিল্পীর একখানি চিঠি পড়ে শোনানো হয়েছিল। তাতে তিনি জানিয়েছিলেন স্মৃতি তহবিলের জন্য ডিরোজিওর একখানা লিথোগ্রাফিক প্রতিকৃতি তিনি তৈরি করে দেবেন।

কোথায় গেল সেই প্রতিকৃতি, কোথায়ই বা স্মৃতিচিহ্ন। আমরা ডিরোজিওর যে ছবিটি দেখে অভ্যস্ত সেটি নাকি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪৩ সনের অক্টোবরের 'দি বেংগল ম্যাগাজিন'-এ। ও'রা জানিয়েছিলেন ওটা বিশ্বস্ত প্রতিকৃতি। এ'কেছিলেন মিঃ জে বেনেট, লিথোগ্রাফিক প্রক্রিয়ায় তা থেকে মুদ্রিত করেছেন মিঃ এইচ এম স্মিথ। স্টেপলটন সাহেবের লিথোগ্রাফ তবে কোথায় গেল? স্মরণচিহ্ন স্থাপন সম্পর্কে ওই কাগজে এবং ১৮৪৮ সনে প্রকাশিত 'বেঙ্গল অবিচুয়ারি'-তে বলা হয়েছে —চাঁদা উঠেছিল আটশ টাকা। কে বা কারা সে অর্থ আত্মসাৎ করে। ফলে ডিরোজিওর কবর হারিয়ে আছে সাউথ পার্ক স্ট্রীটের গোরস্থানে অসংখ্য কবরের ভিড়ে। অথচ ১৮৩২ সনে এপ্রিলেও দেখি উদ্যোক্তারা হাল ছেড়ে দেননি তখনও। 'সমাচার দর্পণ' লিখছে—'......যে কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা চাঁদার স্বাক্ষরকারী মহাশয়দিগকে জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, তাঁহার কবরস্থানোপরি চণ্ডালগড়ের প্রস্তর নির্মিত এক স্তম্ভ প্রস্তুত হওনার্থ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ঐ স্তম্ভ গ্রন্থনের ব্যয় ১৫২৪ টাকা ১০ আনা ৮ পাই হইবে। আমরা শুনিয়া কিঞ্চিচ্চমৎকৃত হইলাম যে, ১৫৫৪ টাকার চাঁদা হইয়াছে বটে, কিন্তু তন্মধ্যে কেবল ৬১৪ টাকা আদায় হইয়াছে।......' সে অংক হয়তো আটশতে পৌঁছেছিল, কিন্তু তস্করেরা সব পরিকল্পনা ভেস্তে দিল। অথচ 'বেংগল পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেণ্ট' (জানুয়ারি জুলাই, ১৯১০) জানাচ্ছেন—কল্পিত সেই স্তম্ভে কী লেখা থাকবে, তাও স্থির হয়ে গিয়েছিল। ১৮৩২ সনের ২৯ মার্চ তারিখের 'গভর্ণমেণ্ট গেজেট' থেকে প্রস্তাবিত শিলালেখাটিও উদ্ধার করে প্রকাশ করেছেন ও'রা। তবু এমনই মন্দ কপাল ডিরোজিও-অনুরাগীদের

যে, দীর্ঘ ষাট বছর ধরে ডিরোজিওর কবর ছিল অবহেলিত—অচিহ্নিত। শেষ পর্যন্ত সে কলঙ্ক মোচন করেন উকিল দুর্গামোহন দাস। নিজের পয়সায় তিনি তার ওপর একটি বেদী নির্মাণ করে তাতে সংক্ষিপ্ত পরিচয়-লিপি খোদাই করেন। সেটি জীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর ১৯০৯ সনে ডিরোজিওর জন্মশতবার্ষিকীতে সংস্কারের কাজে হাত দেন খ্রিশ্চিয়ান বেরিয়াল বোর্ডের সেক্রেটারি মিঃ জর্জ ওকোনেল। কবরের চারপাশে বসানো হয় রেলিং। রেলিং ঘিরে বাহারি গাছপালার সারি। আর মাঝখানে কবরের বুকে শ্বেতপাথরে খোদাই করা সংক্ষিপ্ত স্মৃতিলিপি। সবই করেছিলেন তিনি ডিরোজির প্রতি ব্যক্তিগত অনুরাগবশত, নিজের অর্থ ব্যয়ে। সে শিলালিপিও আজ অপহৃত।

১৫৫ নম্বর লোয়ার সার্কুলার রোডের ইতিবৃত্ত বোধহয় আরও করুণ। ১৮৩১ সন থেকে ১৯০৯ সন পর্যন্ত বাড়িটি কীভাবে হাত বদল হয়েছে তার ফিরিস্তি দিয়েছেন ওয়াল্টার ম্যাজ। এখন হয়তো সে বাড়ি অন্য হাতে। অথচ ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত নানা ঘরবাড়ি গ্রহণের উদ্যোগ যে আদৌ দেখা যায়নি এমন নয়। কিন্তু নব্য বাংলার দীক্ষাগুরু ডিরোজিওর এইসব স্পর্শগ্রাহ্য স্মৃতিচিহ্নগুলোকে যেন বেমালুম ভুলে গেছি আমরা। ডিরোজিওর না আছে কোনও মূর্তি, না কোনও ভাল প্রতিকৃতি। এমনকি স্মৃতিরক্ষার যে সরলতম পথ বেছে নিয়েছিলাম আমরা, অর্থাৎ পথের নামবদল, ডিরোজিওর বেলায় সেখানেও দেখি বিস্ময়কর কার্পণ্য। অথচ তাঁর প্রাপ্য ছিল কিন্তু অনেক।

ডিরোজিওর জীবনীকার এডোয়ার্ড লিখেছেন—হেনরির মৃত্যুর পর দেখতে না দেখতে সব লণ্ডভণ্ড। লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়ি, কসাই টোলার কাগজের অফিস তো বটেই, এমন কি ডিরোজিও পরিবার পর্যন্ত ছত্রখান। ডিরোজিওর কাগজ এবং পরিবার পরিজন নাকি এমন একজনের হাতে পড়েছিল যে, তাদের বাঁচিয়ে রাখে এমন সাধ্য কারও ছিল না। কিছুকাল পরে অ্যামেলিয়ার সঙ্গে কৃষ্ণমোহনের হঠাৎ নাকি দেখা হয়েছিল শ্রীরামপুরে। তারপর যে কোথায় হারিয়ে গেল মেয়েটি, কে জানে!

ম্যাজ অনেক পরিশ্রম করে ডিরোজিওর মা ও ভাইবোনদের সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। ভাই ক্লডিয়াসের কথা আগেই বলা

হয়েছে। তাকে পাঠানো হয়েছিল বিলাতে। ফিরে এসে মৃত্যু। কলকাতার বাড়ি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর মিসেস ডিরোজিও অ্যামেলিয়াকে নিয়ে চলে যান শ্রীরামপুরে। তবে তার আগে ও'রা যে কলকাতায় থাকবার চেষ্টা করেছেন সেটাও ঠিক। মিসেস ডিরোজিও কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন—ছাত্র চাই। অ্যামেলিয়া বিজ্ঞাপনে জানিয়েছিলেন—তিনি তাঁর ভাইয়ের এক স্মৃতিকথা প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছেন, জনসাধারণের সহযোগিতা চান। মনে হয় দু'জনের উদ্যোগই ব্যর্থ হয়ে যায়। চোখের জল মুছতে মুছতে নিঃশব্দে ও'রা চলে যান শ্রীরামপুরে। সেখানেই ১৮৩৩ সনের ২৫ অক্টোবর অ্যামেলিয়ার সঙ্গে অর্থার ডিরোজিও জনসনের বিয়ে হয়ে গেল। জনসন ছিলেন ও'র 'ফাস্ট কাজিন'। তিনি কোটার মহারাজার শিক্ষক এবং একান্ত সচিব নিযুক্ত হলেন। অ্যামেলিয়াকে নিয়ে চলে গেলেন দূর রাজপুতনায়। সেখানেই ১৮৩৫ সনে অ্যামেলিয়ার মৃত্যু। তাঁর বয়স তখন মোটে বাইশ। তিনি সন্তানেরও জননী হয়েছিলেন। কিন্তু সেও বাঁচেনি। মিসেস ডিরোজিও অবশ্য মারা গেছেন অনেক পরে, ১৮৫১ সনে, হাওড়ায়। ডিরোজিও পরিবারের ইতিহাস এখানে শেষ।

পরিবারটির ভাগ্য বিপর্যয়ের ইতিহাস কিন্তু উইল সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্রেও রীতিমত স্পষ্ট। আগেই বলা হয়েছে উইলের কর্মকারকদের একজন ড্যানিয়েল মিকিনস্ কিং অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে আদালতে সেটি পেশ করেন পরদিন (৩০ ডিসেম্বর)। আদালত থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়—ছ' মাসের মধ্যে ডিরোজিওর বিষয়-আশয়ের বিবরণ আদালতে পেশ করতে হবে। ১৮৩২ সনের ডিসেম্বরের মধ্যে দাখিল করতে হবে হিসাবপত্র। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে ডিরোজিওর উইলের সঙ্গে এই সব নথিপত্রও রক্ষিত আছে। দলিলগুলো খুঁটিয়ে পড়লে অনেক তথ্যই মিলতে পারে।

কিং সাহেব আদালতে ডিরোজিওর সম্পত্তির যে তালিকা পেশ করেছেন, তার মধ্যে ছিল—

ছাপাখানা এবং টাইপ। (তবে তিনি জানাচ্ছেন জনৈক তারকনাথ চ্যাটার্জির সঙ্গে তাঁর মামলার ফলে এসব শেরিফের হুকুমে দখল করে নেওয়া হয়েছে।)

constitute and appoint James Calder
Esquire Francis Macklin Esquire and
...... Standish Gilbert ......
Esquire when he shall attain the
age twenty one years, my Executors
to this my last will and Testament
hereby revoking all former wills
and testaments by me at any time to
... made.

Signed sealed and
Delivered in
the presence of us
who each of us
at Calcutta this ......
...... day of ......
One thousand eight
hundred and thirty one

...... Derozio

ডিরোজিওর উইল । ( ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সৌজন্যে )

শেষ পৃষ্ঠা

[illegible]

'ডিরোজিওর সম্পত্তির তালিকা

লাইব্রেরি ( এটিও শেরিফের লোকেরা দখল করে নিয়েছে । )
গাড়ি ঘোড়া এবং অন্যান্য সাজসরঞ্জাম ।
চারটি চিত্র ।
চারটি টেবিল ।
দুই ডজন চেয়ার ।
একটা পুরানো স্ট্যানহোপ, বগি এব ঘোড়া ।
একটা সাইডবোর্ড ।
একটা ব্রেড বাসকেট ।
চারটি পুরানো টুল ।
একটা পুরানো বুক শেলফ ।
একটা পুবানো ওয়াস স্ট্যাণ্ড ।
এক সেট ওয়াল সেড ।
একখানা টেবিল ।
কিছু ছাপার কাগজ ।
ব্যস, ফর্দ এখানেই শেষ ।

কিং এই তালিকা পেশ করেন ১৮৩৩ সনের ১৬ই মার্চ তারিখে । বোঝা যাচ্ছে, ইতিমধ্যে ভাগীরথী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে । কসাইটোলার (বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট) 'দি ইস্ট ইণ্ডিয়ান' কাগজের ছাপাখানা জব্দ । কিং মামলা করেও শেরিফের লোকদের ঠেকাতে পারেন নি । তালিকার শেষে অসহায়ের মতো তিনি জানাচ্ছেন, ডিরোজিওর হিসাবপত্র সব তাঁর সরকার মদনগোপাল বোসের কাছে আছে । তিনি তাঁর হদিশ পাচ্ছেন না । মিসেস ডিরোজিও কিংবা ডিরোজিওর বেনিয়ান পার্বতীর কাছ থেকে ওঁর বাড়ির ঠিকানা জানা যেতে পারে ।

মনে হয় যেন লুটের বাজার । যার যেমন ইচ্ছা—তাই করছেন । কিং একটা জমাখরচের হিসাবও দাখিল করেছেন আদালতে । খরচের তালিকায় আছে—ছাপাখানার কর্মীদের বেতন ও অন্যান্য খরচ ৬০০০ টাকা । প্রেসের জন্য জল-নিরোধক কাপড়—২০ টাকা, ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন—১৫ টাকা, ব্যারিস্টারের জন্য মিঃ ম্যাকলিওডকে দেওয়া

হয়েছে—২৪ টাকা, ডাক—২৫০ টাকা, মোমবাতি এবং অফিসের জন্য —১০০ টাকা, পিওনের বেতন এবং লিখবার কাগজ—২০ টাকা, সহিস —৪০ টাকা, সার্কুলার রোডে গুদাম ভাড়া—৬০ টাকা, বরকন্দাজদের মাইনে—৩৬ টাকা, উইলের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে মিঃ ম্যাকলিওডকে দেওয়া হয়েছে—৭৯ টাকা, শেষকৃত্য বাবদে রেঃ মিঃ ইয়েলসকে দেওয়া হয়েছে —৮২ টাকা, কোচম্যানের বেতন—২৮ টাকা, কসাইটোলায় বাড়ি ভাড়া —৫৮০ টাকা, কুলি ভাড়া—৫ টাকা, বেয়ারাদের বেতন—৫০ টাকা, দারোয়ানদের বেতন—৫০ টাকা ১০ আনা, কসাইটোলায় বাড়ি ভাড়া —২৪০ টাকা, এস অ্যান্ড্রুকে দেয় বাড়তি বেতন—১৬ টাকা, দপ্তরির বেতন—৪০ টাকা, জে ডেরুজকে দেয় বাড়তি বেতন—২৪৪ টাকা, দপ্তরির বেতন—২০ টাকা, ই ফ্লিনকে দেয় বাড়তি বেতন—১৭ টাকা ৮ আনা, কসাইটোলায় বাড়ি ভাড়া—১২০ টাকা, বার্নার্ড—২৫ টাকা, এস বাওয়ার —১৪ টাকা, এ লরেন্স—৪৫ টাকা ৬ আনা ৬ পাই, জে উইলিয়ামস —১৬ টাকা, এ লরেন্স—১৩ টাকা ৯ আনা ৬ পাই, ঐ—২০ টাকা ( এসব সব বাড়তি বেতন পেয়েছেন ) মিঃ হাডসনের ছাপার কাজের জন্য বাড়তি লোকের বাবদে—৩০ টাকা, ক্যাপ্টেন স্মিথের জন্য—৫০ টাকা, মিঃ রিডের জন্য—৩০ টাকা।

জমার ঘরে আছে ঃ

বই বিক্রি—৩০ টাকা, ফার্নিচার—৪০ টাকা, শেরিফ যে সব বই আটক করেছিল, সেগুলি বিক্রি করে পাওয়া গেছে—৫০ টাকা, গাড়ি এবং ঘোড়া বিক্রি—১২০ টাকা, ফার্নিচার বিক্রি—৫০ টাকা, স্ট্যানহোপ-ঘোড়া-ছবি--টেবিল—১৩৫ টাকা, পুরানো আসবাবপত্র—৫০ টাকা, ঐ—২০ টাকা, চেয়ার এবং ছাপার কাগজ ইত্যাদি—৩৪ টাকা, ক্যাপ্টেন স্মিথ ছাপা বাবদে দিয়েছেন—১৭৬ টাকা, মিঃ রিড দিয়েছেন—১১৫ টাকা। জমার অঙ্ক এখানেই শেষ। সুতরাং উইলের কর্মকারক ড্যানিয়েল মেকিনস কিং জানাচ্ছেন তিনি পাবেন—৮৪৩৬ টাকা ৭ আনা ৬ পাই।

নিয়তি কোন্‌দিকে ঠেলে দিচ্ছে ডিরোজিও পরিবারকে বুঝতে কোনও অসুবিধা নেই। একই দিনে আদালতে দেয় কী তার দীর্ঘ তালিকাও পেশ

করেছেন কিং। প্রাপ্তিযোগের ঘর বলতে গেলে প্রায় শূন্য। জানাচ্ছেন ৯০ টাকা পাওয়া যাবে 'এনকোয়ারার' সম্পাদক কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জীর কাছ থেকে। বেনিয়ান পার্বতী কত টাকার বিল আদায় করেছে তাঁর জানা নেই। সরকার মদনগোপাল ঘোষ সম্পর্কেও একই কথা। অথচ টাকা পাবে অনেকেই। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রেস এবং কিছু বাঙালীর নাম। গভর্নমেণ্ট গেজেটকে দিতে হবে নাকি ১১৩ টাকা ৬ আনা ৬ পাই, ইণ্ডিয়া গেজেট প্রেসকে—১১৪ টাকা, ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসকে—১২৫২ টাকা ২ আনা ৬ পাই, চার্চ মিশন প্রেসকে ৮১ টাকা, জন বুল-এর মালিকদের —১৬ টাকা। বাঙালীদের মধ্যে টাকা পেয়েছেন দেখছি—মদন সরকার— ১২০০ টাকা আর গোপীকৃষ্ণ বসু—৫০০ টাকা। কয়েকজন পাওনাদার বিশেষভাবে আকর্ষণ করে আমাদের। যেমন ওসটেল ব্রিটিশ লাইব্রেরি পাবে ১০০ টাকার মতো। ডিরোজিও কি বই কিনতেন ওঁদের কাছ থেকে? মুনু দরজি পাবে—১৫ টাকা ৮ আনা। ডিরোজিও কী পোশাক তৈরী করিয়েছিলেন ওর কাছে? ওয়াচমেকার গ্রে পাবেন—২২ টাকা। ডিরোজিও কী তাঁর ঘড়ি সারাই করাতেন ওঁকে দিয়ে? একজায়গায় শুধু দেখছি ডিরোজিওর মায়ের নামে ধরা আছে—২৫০ টাকা। ভদ্রমহিলা কি এই সামান্য অর্থই পেয়েছিলেন? মনে হয় না কিং ডিরোজিও পরিবারকে তার চেয়ে বেশী কিছু দিয়েছিলেন বা দিতে পেরেছিলেন। কারণ, তাঁর দাখিল করা দেয়-তালিকায় শেষ যোগফল—৩০৭৮৪ টাকা ১০ আনা। এই অঙ্কটি কিন্তু পেনসিলে-লেখা।

বস্তুত, এমন এলোমেলো হিসাব কদাচিৎ দেখা যায়। কীসের সঙ্গে কী জুড়ে দিচ্ছেন কিং তার ঠিক ঠিকানা নেই। বোঝা যায়, মৃত্যুর পরদিন থেকেই ডিরোজিও পরিবার অগাধ জলে, ভরাডুবির আর দেরি নেই। তবু এই সব এলোপাথাড়ি হিসাব, প্রাণহীন অঙ্কে থেকে থেকে কিন্তু আমরা ডিরোজিওর দেখা পাই; দেখা পাই প্রাণবন্ত সেই তরুণের যিনি কবি, সাংবাদিক, শিক্ষক, নায়ক। গ্রন্থকৃধার মতোই প্রসিদ্ধ যাঁর বিলাসিতা আর বাবুয়ানার কথা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা লিখে গেছেন—ডিরোজিও খুবই বাবু ছিলেন।

তিনি জাঁকজমকপূর্ণ বাহারি পোশাক পরতেন। তাঁর অনেক শিষ্যের বৈশিষ্ট্য ছিল এটা। ও'রা বিশিষ্ট হতে চাইতেন। চাইতেন নিজেদের স্বাতন্ত্র্য দেখাতে। মৃত্যুর পর ঘোড়াসমেত যে স্ট্যানহোপ গাড়িটি বিক্রী হয়ে গেল—১৩৫ টাকায় ( তৎসহ ফাউ হিসাবে কিছু ছবি, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি ), একজন দর্শক লিখেছেন ডিরোজিও যখন সেজেগুজে ওই হলুদ রঙের গাড়িটি চড়ে পথে বের হতেন, তখন দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো দৃশ্য বই কি। তিনি মাথায় কখনও টুপি পরতেন না, ঝাঁকরা চুল মাঝখানে দুভাগ করা ছোটখাটো এই মানুষটিই যখন হাটু পর্যন্ত বুট পরে তেজী আরবি ঘোড়ার পিঠে চেপে ময়দানে হাওয়া খেতে বের হতেন, তখন তাঁকে দেখলে নাকি হাসি চেপে রাখা দায়। সে ঘোড়াও কিং-এর হিসাবের খাতায় একটি দুই অঙ্কের সংখ্যা মাত্র।

হিন্দু কলেজে ডিরোজিও মাসে মাইনে পেতেন দেড়শ টাকা। কিন্তু খরচপত্রের ব্যাপারে ধনীদের সঙ্গে পাল্লা দিতেন তিনি। বাড়িতে তাঁর এলাহি ব্যাপার। সকলের জন্য খোলা তাঁর দরজা, খাওয়ার টেবিলে প্রত্যহ অতিথির ঝাঁক। সুতরাং, ঋণ তো হতেই পারে। নেশা ছিল তাঁর বই কেনা। বই পড়া। হিসাবের খাতায় তারও নিশানা। ঋণের দায়ে লাইব্রেরী চলে গেল। কী বই ছিল সেখানে? কিং নামগুলো টুকে রাখা প্রয়োজন মনে করেননি। বইয়ের দোকানকে কী বইয়ের জন্য টাকা দিতে হবে তাঁর হিসাবে তাও উহ্য। আমরা শুধু জানতে পারছি ঘরে তাঁর বই ছিল, ছবি ছিল। আস্তাবলে ছিল একাধিক গাড়ি, ঘোড়া। অনুমানে বুঝতে পারছি যে দুটি কবিতার বই প্রকাশ করেছিলেন তিনি তার জন্য ছাপাখানার বকেয়া টাকা তখনও মেটাতে পারেন নি। ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস ছাড়াও আরও ছাপাখানার কাছে অনেক দেনা তাঁর। অথচ এই বইগুলো নিয়ে চারিদিকে কত না সোরগোল। এমন কি বিলাতেও নাকি মৃদু তরঙ্গ। কিং-এর হিসাব-পত্রগুলো নাড়া চাড়া করতে বসলে চোখে জল এসে যায়। এমন নিষ্ঠুর দলিল বোধহয় সত্যিই বেশী দেখা যায় না। তবু ভাল লাগে যখন দেখি মৃত্যুর পরেও কেউ কেউ আসছেন, বিক্রির আর কী আছে তার খোঁজ নিতে নয়, কবিতার বই পাওয়া যেতে পারে কি না-তা-ই জানতে।

কিং শুধু বাড়ি গাড়ী আসবাব নয়, কবিতার বইও বিক্রি করেছেন তিরিশ টাকায়! লোয়ার সার্কুলার রোডের বাসিন্দা ডিরোজিওর শেষ উইলের এক্সিকিউটার ড্যানিয়েল মিকিনস্ কিং কি জানতেন বাইশ বছর বয়সের এই কবি যাঁর বই হেলাফেলা করে বিক্রি করে দিচ্ছেন তিনি একদিন বন্দিত হবেন নবযুগের নবচেতনার প্রথম কবি হিসাবে? স্বাধীনতার প্রথম স্বপ্ন দেখার গৌরবে একদিন ভূষিত হবেন এই কবি?

# কবি কিশোর ডিরোজিও

## অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' শীর্ষক যুগজীবনীতে ডিরোজিও বিষয়ে সমীক্ষণের শেষে স্বতঃসিদ্ধান্তের ভঙ্গিতে লিখেছেন, 'শিক্ষকশ্রেষ্ঠ ডিরোজিওর প্রতিভার জ্যোতির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া হিন্দু কলেজের যুবক ছাত্রগণ কিরূপ তাঁহাকে আবেষ্টন করিয়াছিল এবং তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিয়াছিল আশা করি তাহা সকলে এক প্রকার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন।' এই 'শিক্ষকশ্রেষ্ঠ' বা গুরুর 'প্রতিভার জ্যোতি'র স্বরূপ উন্মোচন করতে গিয়ে অবশ্যই তিনি টমাস এডোয়ার্ডস-এর প্রতিবেদন থেকে সাহিত্যশিক্ষক হিসেবেও ডিরোজিওর কৃতিত্বদ্যোতক অংশ উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু একবারও তাঁর স্বকীয় শিল্প-সত্তার উল্লেখ করেন নি।

বলা বাহুল্য, এই আদর্শ যুগপুরুষের মহিমার কোন অবমূল্যায়ন ঘটাতে চান নি অপর যুগপুরুষ শিবনাথ শাস্ত্রী। আসল কথা এই যে, ডিরোজিও তাঁর স্বকালে একজন সংস্কারক হিসেবেই সুচিহ্নিত হয়েছিলেন। আর

তাঁর সেই ভূমিকা ছিল এতই ভাস্বর যে তাঁর বিচিত্রপথসঞ্চারী প্রতিভার অন্যতর পরিচয়টি তেমন করে চোখে পড়বার কথা ছিল না।

ডিরোজিওর কবিতা পড়ে আজকের পাঠকের কাছে প্রতিভাত হয়, এই কবিও সমকালের জন্যে তাঁর শিল্পীপরিচিতি প্রকাশ করতে চান নি তেমন। তিনি চেয়েছিলেন সমীপসময় তাঁকে সংগঠক হিসাবে জানুক এবং উত্তরকাল তাঁকে একজন কবি বলে মেনে নিক।

কবি ও সংস্কারকের এরকম বিভাজন আমাদের পরিচিত আর কোন সংগঠকের মধ্যেই আমরা দেখতে পাই না। উনিশ শতকের সর্বাগ্রণী সংস্কারকেরা শিল্পকে আপেক্ষিক মাধ্যমে পরিণত করেছিলেন। তাঁদের কাছে শিল্প কোন স্বনির্ভর গরিমা নিয়ে মূর্ত হবার অধিকার পায়নি। সেই কারণেই ভাবতে অবাক লাগে, অকালমৃত্যুর আগেই কীভাবে কবি-কিশোর ডিরোজিও যুগসময়ের অপরাপর গঠনাত্মক উদাম উদ্যোগ থেকে কবিতাকে বিবিক্ত করে নিতে শিখেছিলেন।

তাঁর প্রসঙ্গে অনেকেই রবার্ট সাদের অনুষঙ্গ এনেছেন। সাদের কবি-অভিপ্রায় ধরতে পারলে ডিরোজিওর স্বাতন্ত্র্যগুণ স্পষ্ট হবে। সাদে এক অর্থে একজন ভ্রান্ত ভারতপথিক ছিলেন। অলীক এক ভারতীয়তার সন্ধানে তিনি মগ্ন থেকে গিয়েছিলেন এবং বন্দিত অনেক ভারততাত্ত্বিকের মতই সেই স্বপ্নার্ত সন্ধানে এতটুকু চিড় লাগলেই তিনি ভারতীয়তাকে আঘাত করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। জর্জ বিয়ার্স সাদের এই বিপন্ন রোমান্টিকতা সম্পর্কে British Attitudes Towards India 1784 1858 (১৯৬১) নির্মোহ আলোচনা করেছেন। বিয়ার্স উল্লেখ করেছেন সাদের রচনায় সতীদাহ অথবা রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে কোলাহল কী বীভৎসতায় বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে, আমরা লক্ষ্য করি, প্রচলিত বহুবিধ প্রথা ও ব্যবস্থা সম্পর্কে চূড়ান্ত প্রতিরোধীর মনোভঙ্গি থাকা সত্ত্বেও কবিতায় ডিরোজিও সেই সমস্ত ভাবাসঙ্গ এলেও কখনও ঘৃণার শিকার হন নি। 'দি ফকির অফ জঙ্গিরা' আখ্যানকাব্যের অন্যতম বিভাব সতীদাহ বিরোধিতা অথবা হিন্দুমুসলমান মৈত্রী যেভাবেই ব্যাখ্যাত হোক না কেন, রচনার কোন পর্যায়েই কবি তাঁর উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপিত হতে দেন

নি। পল্লব সেনগুপ্ত যথার্থই বলেছেন, 'সহমরণের পূর্বে চিতাপ্রদক্ষিণ, বেদমন্ত্রপাঠ, স্ত্রী-আচার, মুখাগ্নি, ভবিষ্যদ্বাণী প্রমুখ যাবৎ ধর্মানুষ্ঠানের এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি ডিরোজিও এঁকেছেন, যাতে তাঁর অভিনিবিষ্ট এবং পূর্ণায়ত একটি সামাজিক দৃষ্টির পরিচয় স্পস্ট হয়' ( ঝড়ের পাখি ; কবি ডিরোজিও পৃঃ ২০ )। এই 'পূর্ণায়ত' দৃষ্টি থাকার দরুনই প্রথানুগত সমাজের পুরোধাবর্গকে তিনি তিরস্কারে জর্জরিত করেন নি। পক্ষান্তরে, সতীদাহ প্রথার নৃশংস ব্যবস্থাপকের বিশ্বাসের জগৎটিকেও অন্যনিরপেক্ষ শিল্পলাবণ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই কাব্যের প্রথম সর্গের নবম স্তোত্রটি প্রধান ব্রাহ্মণের উদাত্ত উচ্চারণ হিসেবে স্মৃতিধার্য :

সূর্য ! তোমার আলোর অয়নপথে
কখনোও দ্যাখোনি এমন জ্যোতিষ্মতী
আর কোন নারী যেজন অচিরে হবে
সংবৃত এক অশর্ত বৈভবে ;
শোন সেবকের আর্তি উর্ধ্বপুরে,
হে রাজন্ ঐ নীল দিগন্ত জুড়ে !
ভ্রমগুলের শীর্ষে কিরীট আর
এখন তোমার মুখের শোভা অপার,
তোমার দ্যুতি ও তোমার শক্তি আর
এই প্রহরের গরিমা আর তোমার
প্রতি আমাদের অর্চনানুষ্ঠান
মনে রেখে তুমি সুচির বিবস্বান্ !
শোন সন্ততিবর্গের এ বিনতি
এ নারীকে দাও তোমার শরণাগতি !

সাদে যদি এই স্তোত্র রচনার ভার নিতেন, তাহলে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র সম্পর্কে শ্লেষাত্মক কিছু পংক্তি আমরা পেতাম ঠিকই, এবং তার দ্বারা এই ভয়াবহ প্রথার প্রবক্তাদের সম্পর্কে আমাদের বক্তব্যও চরিতার্থ হত সন্দেহ নেই, কিন্তু উচ্চাবচ নির্বিশেষে এরকম অসামান্য সহানুভূতির সৌন্দর্যে আমরা কখনোই অভিষিক্ত হতে পারতাম না।

এই সহানুভূতিই তাঁর কবিতার কেন্দ্রশক্তি, টমাস এডোয়ার্ডস-এর Henry Derozio the Eurasian Poet, Teacher, and Journalist (১৮৮৪) বই থেকে আমরা আঁচ করে নিতে পারি। তিনি এই প্রসঙ্গে 'প্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির সহানুভূতি' ( Sympathy between Nature and Human Nature ) সূত্রটি উপহার দিয়ে আমাদের জানিয়েছেন: 'আমাদের মনে হয় যে ডিরোজিওর কবিতা এক নিবিড় অনুভূতি ও আবেগে দ্রব হয়ে আছে। এরি সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে রয়েছে সুন্দর চিন্তনের ঐশ্বর্য-সম্ভার, হয়ত বা একটু বেশি পরিমাণেই অবাস্তব···সমস্ত প্রকৃত কবির সঙ্গে তার এই জায়গায় মিল দেখা যায় যে ডিরোজিও শুধু সঞ্চারী মর্জি-মুহূর্ত ও মানবজীবনের সঙ্গে পরিবর্তমান প্রকৃতির বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে আত্মীয়তা অনুভব এবং প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হন নি, সৃষ্ট সমস্ত-কিছুর ভিতরে একটি সহানুভূতির সংযোগসূত্র পেয়ে গিয়েছেন। সেটাই প্রকৃতিকে ঘিরে মানবিক প্রেমের উষ্ণ কিরণজাল রচনা করে (পৃঃ ২০৩)।'

'দি ফকির অফ্ জঙ্গিরা'র পিছনে ডিরোজিওর সংগৃহীত কিছু কাহিনী কাজ করেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু এই কাব্যকাহিনীর উদ্দীপন ও আলম্বন ভাগলপুরে দেখা গাঙ্গেয় নিসর্গ। এই নিসর্গকে শিশুর মতই ভালবেসে-ছিলেন তিনি এবং কাহিনীর নরনারী যেন তাঁর প্রিয় এই প্রকৃতি থেকেই সঞ্জাত হয়েছে। 'দি ফকির অফ্ জঙ্গিরা'য় অবশ্যই একটি স্পর্শগ্রাহ্য কাহিনী-সূত্র রয়েছে, কিন্তু কবি-কাহিনীকার প্রায়শই গল্পের খেই যেন হারিয়ে ফেলেছেন আর তখন উপমাপ্লাবী বন পাহাড় কীট-পতঙ্গ নদী ও আকাশের অসম দাক্ষিণ্যকে ধরে রেখেছেন তিনি বিভিন্ন মাপের ফ্রেমে। কবিতায় এরকম ল্যাণ্ডস্কেপ তাঁর সময়ের আর কোন ভারতীয় কবির রচনায় আমরা দেখি না। ডিরোজিওর প্রকৃতিচিত্রণে একটি প্রধান বিশেষত্ব এর অন্তর্লীন বিষাদযোগ। এই কারণেই তাঁর হাতে সন্ধ্যা বা রাত্রির চিত্রলহরী সহজেই ধরা দিয়েছে—

নিশীথের ছায়াপুঞ্জ নেমে আসে ; গোধূলিও মরে ;
পাখি উড়ে যায় তার পাতাঢাকা আশ্রয়বিবরে ;
চন্দ্রলেখা উঠে আসে ম্লায়মান ; শিশির পতন

আশীর্বাদের মত ; আর গুণে রাখার মতন
অদূর গগনে ক্ষুদ্র, দীপ্র, ঝিকিমিকি তারা রয়,
চিন্ময় সুখের দ্বীপ, ক্ষমাস্পদদের দিব্যালয় !

( অগস্টের সন্ধ্যা, Evening in August )

সেমিকোলন দিয়ে বিভাজিত স্পষ্টরেখায়িত বিষণ্ণ হৃদয়ের এই মানচিত্রটি আমাদের ধরে রাখে। এই স্তব্ধতা প্রমাণ করে, স্তরে স্তরে তাঁর বেদনাকে সুবিন্যস্ত করতে চেয়েছিলেন তিনি। চিত্রার্পিত আবেগের প্রত্যক্ষতা রচনায় এখানে উপমার অপব্যয় ঘটেনি এবং এরকম অনতিরেকের সাহায্যে তিনি আধুনিক পাঠকের হৃদয় জয় করে নেন। সদ্যোদ্ধৃত কবিতার শুরুতেই গঙ্গার স্রোতে মুকুরিত অস্তসূর্যের এই উপমা ছবি আছে :

Smiling, like Hope's ray—and then it dies

আশার এই রেখা 'দি ফকির অফ জঙ্গিরা'র উপসংহারে 'অন্তিম রশ্মিপাত' (hope's latest ray, ২-২২ ) হয়ে যখন এসেছে তখন 'Hope' শব্দটি 'hope' হিসেবে লেখা হয়েছে, আশা তার রূপকঋদ্ধি পরিহার করে একটি নশ্বর চরিত্রশরীর অর্জন করেছে। এরই মাঝখানে কখনও সূর্য কখনও চন্দ্রের কাছ থেকে এই রশ্মি ঋণ করা হয়েছে। এক-এক জায়গায় অরূপ রূপক ও উপমেয়কে দুই চরিত্রের সন্নিবেশে যুক্ত করা হয়েছে। এর সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ :

Hope's and the moon's rays quiver o'er them still (২-১০).

আমার এক ডিরোজিওভক্ত তরুণ বন্ধু রমাপ্রসাদ দে তাঁর বইটির এই জায়গাটির ঠিক নিচে 'সোনার তরী'র নিকষোপম পংক্তিটি লিখে রেখেছেন :

চঞ্চল আলো আশার মতন/কাঁপিছে জলে।

এই সাদৃশ্যের প্রতিভাস যতই তীব্র হোক, দুই কবির প্রতিভা বা প্রবণতার মধ্যে তুলনায়নের প্রলোভন অচিরেই নিবৃত্ত হতে বাধ্য। ডিরোজিওর নিরুদ্দেশ যাত্রায় স্বগত স্বভাবের নিঃশর্ত সমর্পণ নেই। সন্দেহ নেই, প্রথম-পর্যায়ী রবীন্দ্রনাথের মতই তাঁর কবিতায় রাত্রির এলাকা ও নৈরাশ্য-বিবেকের ক্ষমতা প্রসারিত হয়ে চলেছিল, কিন্তু ডিরোজিও বারংবার তাঁর

নষ্ট নিরাশাকে অত্যন্ত বিশদভাবে বুঝতে চেয়েছেন এবং সেই কারণেই ঐ আবেগের দ্বারা অধিকৃত হবার মুহূর্তে তাকে সমান্তর কয়েকটি চূর্ণালেখ্যে পরিণত করেছেন। একথা ঠিকই, কোন মতবাদের খণ্ডনকরে তিনি তাঁর নৈরাশ্যনিসর্গকে ব্যবহার করেন নি। হিন্দু কলেজ থেকে বিতাড়নের পর উইলসনকে তিনি তাঁর দৃঢ়নিষ্ঠ অজ্ঞেয়বাদের ধরনটি এভাবে জানিয়েছিলেন: বিশ্বাস করুন আমার মনে মিশে আছে এক অনপনেয় মানবিক অজ্ঞতার বোধ আর বিভিন্ন ধ্যানধারণার চিরন্তন বিপর্যয়ের ব্যাপারটি। এর ফলে তুচ্ছতম বিষয় সম্পর্কেও যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস নিয়ে আমি কোন রায় দিতে পারি না। সংশয় আর অনিশ্চয়তা আমাদের মানস এতই জুড়ে রয়েছে যে পাথুরে কোন তাত্ত্বিকতাকে সন্ধানী মনে অনুপ্রবেশের অধিকার দেওয়া সম্ভব নয়। (২৬ এপ্রিল, ১৮৩১)।' এই 'মানবিক অজ্ঞতা' তাঁর কবিতার মর্মে মর্মে ওতপ্রোত হয়ে আছে। তাকেই তিনি তাঁর স্বল্পায়ত-শিল্পজীবনে নিপুণ মিতালেখ্যের সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করেছেন। পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথের কাছে অনুরূপ ভাবনা কখনই নিয়ন্ত্রীর মর্যাদা পায় নি, তিনি কবিস্বভাবের দুর্জ্ঞেয় রূপান্তরের ছন্দে তাকে অনবরতই ক্রমবিসারী বিবর্তনের দিকে নিয়ে গিয়েছেন।

স্বদেশ বিষয়ে প্রাণিত অথবা তাঁর ছাত্রদের জন্যে প্রণীত সনেটগুলিতে ডিরোজিও তাঁর শিল্পভাবনার দৃপ্ত কিছু নিদর্শন রেখে গিয়েছেন। কিন্তু এসব ক্ষেত্রেও সংস্কারকের 'প্রভুসম্মিত' ভূমিকা তিনি প্রদর্শন করেন নি। আশা-নিরাশায় স্পন্দমান এই সব কবিতায় ধরা আছে সৎ শিল্পীর সৌজন্য। এদের মধ্যেও এই শিল্পীর স্বভাবসুলভ সহানুভূতির ছাপ অব্যক্ত থাকে নি। বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে হৃদয়কে সনাক্ত করার এরকম সুবিনীত উদাহরণ আমাদের পরিচিত দেশাত্মবোধক বা উপলক্ষভিত্তিক কবিতায় খুব বেশি নেই। কিন্তু মহৎ শিল্পী বিষয় এবং বিষয়ীকে মিলিয়ে দেবার পরেও তদ্গত ও স্বগত যাবতীয় বর্গীকরণ অতিক্রম করে অন্যতর উত্তরণের দিকে চলে যান। সৎ শিল্পী ডিরোজিওর বাইশ বছরের শীর্ণায়ু জীবনের কাছে মহত্ত্বের সেই প্রত্যাশা অবশ্যই শিল্পসম্মত নয়।

# নীল আন্দোলন ও ডিরোজিও

তপোবিজয় ঘোষ

নব্য বঙ্গের অন্যতম নির্মাতা হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) ড্রামণ্ড সাহেবের 'ধর্মতলা একাডেমি' থেকে পাঠ গ্রহণ সমাপ্ত করে যখন পিতার কর্মস্থল 'জেমস স্কট এণ্ড কোম্পানী' নামক সদাগরী প্রতিষ্ঠানে করণিকের কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন (১৮২৩)—তখন বাংলা-বিহারে নীলের চাষ সমৃদ্ধ অবস্থায় পৌঁছেছে এবং গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য নীলকুঠি গড়ে উঠেছে। যথারীতি নীলকরদের অত্যাচারও প্রবলাকার ধারণ করেছে। ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লবের ফলে ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে এবং বিকল্প রপ্তানী-বাণিজ্যরূপে নীলের চাহিদা অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অবস্থায় বাংলা বিহারের কৃষকদের দিয়ে বলপূর্বক নীল চাষ করানো অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে। ১৮১৮ সাল থেকে বাংলা সংবাদপত্র সমূহ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দৃষ্টিও নীল চাষ ও নীলকর-অত্যাচারের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। যতদূর জানা যায়, মার্শম্যান সম্পাদিত 'সমাচার দর্পন' পত্রিকাই প্রথম নীল বিষয়ক নানা তথ্য ও নীলকর-অত্যাচারের কথা প্রকাশ করেন। ঐ পত্রিকার ১৮২১, ২৪ এপ্রিল

সংখ্যা থেকে জানা যায় 'মোং কলকাতা হইতে মার্চ মাসের প্রথম দিন অবধি ৩১ রোজ পর্যন্ত যে যে দ্রব্য রপ্তানী হয়েছে তাতে নীলের পরিমাণ হল ৩১৩৬ মণ। ১৮২৭ সালের ১৫ ডিসেম্বর সংখ্যা থেকে দেখা যায়—এ দেশ হইতে রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে নীল প্রধান রূপে গণ্য— তাহা ১৭৯২ সালে ৭২৬৬ মণ মাত্র এখান হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানী হয় এবং বর্তমান বৎসরে যে নীল রপ্তানী হইবে তা প্রায় এক লক্ষ মনের অধিক হইবে কিন্তু অন্য পক্ষে বস্ত্রের বিষয়ে রপ্তানীর অতি অল্পতা হইয়াছে যেহেতুক ১৭৮২ সালে এ দেশ হইতে বার লক্ষ তেইশ হাজার থান কাপড় ইংলণ্ডে যায়, তৎপরে এই বাণিজ্য এমন পতিত হয় যে ১৮২২ সালে কেবল এক লক্ষ থান কাপড় এদেশ হইতে হয়। ইহাতে দেখা যায় যে ইহার ত্রিশ বৎসর পূর্বে যত রপ্তানী হইত তাহার বার ভাগের একভাগ এক্ষণে রপ্তানী হয়।' —বস্ত্রের বিকল্প বাণিজ্যবস্তু রূপে নীলের গুরুত্ব বৃদ্ধির ফলে শ্বেতাঙ্গ বণিকেরা দলে দলে নীলচাষের জন্য বাংলার উর্বর জমিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং কৃষকদের উপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু করেছিল। উনিশ শতকের শুরু থেকেই এই অত্যাচার এমন তীব্র আকার ধারণ করে যে ১৮০৭ সালে কৃষ্ণনগরের নীল কৃষকেরা ক্রুদ্ধ হয়ে ফেডারিক মেটল্যাণ্ড আর্নট নামে একজন নৃশংস প্রকৃতির নীলকরকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলে। ১৮১০ সালে প্রজা বিক্ষোভের আশঙ্কায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী— যারা সকল অবস্থায় নীলকরদের স্বার্থরক্ষক ছিলেন—এবং নানাসূত্রে নীল ব্যবসায়ে জড়িত ছিলেন— তারাও বাধ্য হয়ে চারজন অত্যাচারী নীলকরের লাইসেন্স কেড়ে নেন এবং একটি সরকারী সার্কুলার বা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে নীলকরদের 'সংযত' করার চেষ্টা করেন। ১৮১০ সালের ১৩ই জুলাই প্রচারিত এই সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে সরকার নিজেই স্বীকার করেন যে, নীলকরেরা কৃষকের উপর নানা ধরণের অত্যাচার করে থাকে, যেমন—১, নীল চাষীর উপর এমন অত্যাচার করা হয় যার ফলে তার মৃত্যু হয়—একে নরহত্যার পর্যায়েই ফেলা যায় ২, বকী নীল আদায়ের জন্য নীল চাষীদের ধরে এনে নীল গুদামে আটক রাখা হয় ৩, নীলচাষে অনিচ্ছুক চাষীদের নীলকর-বাহিনীর লাঠিয়ালরা ভয় দেখায় বা হুমকি দেয় ৪, বেতের উপর চামড়া দিয়ে মোড়া এক ধরণের বিশেষ লাঠি (পরবর্তীকালে 'নীলদর্পণ' নাটকে বা 'শ্যামচাঁদ' নামে অভিহিত)

দিয়ে রায়তকে প্রহার করা হয়। —নীলচাষের প্রশ্রয়দাতা ও স্বার্থরক্ষক হয়েও স্বয়ং সরকার যখন প্রকাশ্য সার্কুলারে নীলকর-অত্যাচারের কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়—তখন বোঝা যায় ১৮১০ সালের মধ্যেই নীলকর-দুর্বৃত্তদের অত্যাচার কি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল।

১৮২২ সালের ১৮ মে সংখ্যা 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় 'নীলকারকদের দৌরাত্ম্য' বিষয়ক যে সংবাদ প্রকাশিত হয় তাতেও দেখা যায় যে—'যে প্রজা নীলের দাদন না লয় (নীলকরেরা) তাহারদিগের প্রতি ক্রোধ করিয়া থাকেন ও খালাসীদিগকে কহিয়া রাখেন যে ঐ সকল প্রজার গরু নীলের নিকট আইলে সে গরু ধরিয়া কুঠিতে আনিবা। ......এবং নীলের দাদন যে প্রজা লয় তাহার মরণ পর্যন্ত খালাস নাই যেহেতু হিসাব-রফা হয় না প্রতি সনেই দাদন সময়ে বাঁকীদার কহিয়া ধরিয়া কএদ রাখে তাহাতে প্রজারা ভীত হইয়া হালবকয়া বাঁকী লিখিয়া দিয়া দাদন লইয়া যায়। এইরূপ যাবৎ গো-বৎসাদি থাকে তাবৎ ভিটায় থাকে তাহার অন্যথা হইলে স্থানত্যাগ করে যেহেতু দাদন থাকিতে অন্যশস্য আবাদ করিয়া নির্বাহ করিতে পারে না।' 'সমাচার দর্পণ' এই সংবাদ 'সমাচার চন্দ্রিকা'র দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। এতে বোঝা যায় 'সমাচার চন্দ্রিকা'র সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও নীলকর-অত্যাচারের বিষয়ে সজাগ হয়ে উঠেছিলেন। অন্যদিকে 'সমাচার দর্পণ' মার্শম্যানের নামে সম্পাদিত হলেও পত্রিকার সম্পাদনার মূল-দায়িত্ব এদেশীয় পণ্ডিতদের উপরেই ন্যস্ত ছিল—যার মধ্যে জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

একদিকে নীলকরদের অত্যাচার যখন প্রবল হয়ে উঠেছে এবং 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকার সঙ্গে সংশিল্ষ্ট বাঙালি বুদ্ধিজীবীগণ সেই অত্যাচারের বিষয়ে সংবাদপত্রে সংবাদ পরিবেশন করে জনসাধারণকে অবহিত করার চেষ্টা করেছেন—এই সময় 'কলোনাইজেসন'—বিতর্কে যোগ দিয়ে রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর প্রমুখ বুদ্ধিজীবী নীলকরদের প্রশংসা শুরু করেন। ডিরোজিও তখন ভাগলপুরের কর্মজীবন সমাপ্ত করে হিন্দু কলেজের শিক্ষকতায় নিযুক্ত আছেন (১৮২৬–৩১)।

১৮৩৩ সালে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'র সনদ পরবর্তী ২০ বৎসরের জন্য মঞ্জুর করার কয়েক বৎসর আগে থেকেই এই দেশে এবং ইংল্যাণ্ডে 'কলোনাইজেসন' বিতর্ক শুরু হয়। এ যাবৎ ভারতে বাণিজ্য করার একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে আসছিল 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'র বণিকেরা। অন্য শ্রেণীর ইউরোপীয় বণিকদেব বাণিজ্য করাব বা এদেশে জমিজমা ক্রয় করে বসবাস করাব অধিকার ছিল না। ১৮১৩ সালের সনদে অন্য ইংরেজ বণিকেরা শর্তাধীনে ভারতে বাণিজ্যাধিকাব লাভ করে। এই সময় থেকে ইংলণ্ডে ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। শিল্প-বিপ্লবোত্তব নতুন বৃটিশ-পুঁজির অন্তর্গত শিল্প বণিকেরা স্বভাবতই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকার ভেঙে দিয়ে ভারতসহ সমগ্র প্রাচ্যখণ্ডকে অবাধ মৃগয়ার ক্ষেত্রে পরিণত করতে চায়। এদের প্রতিনিধি লর্ড গ্রেনভিল্ কোম্পানির শাসনের পরিবর্তে ভারতে সরাসরি বৃটিশ সরকারের শাসন দাবি করে পার্লামেন্টে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এরপরেও চীনদেশে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার নিয়ে কোম্পানী আরো বিশ বছর টিকে যায় বটে কিন্তু ১৮৩৩ সালের সনদ-দানের কয়েক বৎসর পূর্ব থেকেই কোম্পানীর বিরুদ্ধে শিল্প বণিকদের আক্রমণ প্রচণ্ড মারমুখী হয়ে ওঠে। পার্লামেন্টে বিরোধী দল ভারতে কোম্পানীর শাসনের সম্পূর্ণ অবসান দাবী করে। ভারতে সকল শ্রেণীর ইউরোপীয় বণিকের বসবাস, অবাধ বাণিজ্য, জমিজমা ক্রয়ের অধিকার দাবি করা হয়। স্বভাবতই কোম্পানী-আশ্রিত বণিকেরা এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের পরাজয় ঘটে। ১৮৩৩ সালের সনদে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার লুপ্ত হয় এবং ভারতে তারা মাত্র প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী হয়। ইউরোপীয়রা এদেশে জমিজমা ক্রয়ের অধিকার লাভ করে এবং মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থা বা free trade প্রচলিত হয়। তখন রামমোহন বা ডিরোজিও কেউই অবশ্য জীবিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁদের জীবিতকালেই ১৮৩৩ সালের আসন্ন সনদ-দানকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষেও তুমুল বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। সংক্ষেপে এই বিতর্কই হল 'কলোনাইজেসন'-বিতর্ক। বাঙালী বুদ্ধিজীবীরাও দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। রামমোহন-দ্বারকানাথ-প্রসন্নকুমার ঠাকুরেরা চাইছিলেন—

ভারতে ইউরোপীয়দের অবাধ বসবাস ও বাধামুক্ত বাণিজ্য। কিন্তু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বঙ্গীয় জমিদার সমাজের এক বিরাট অংশ এর বিরুদ্ধতা করেছিলেন। বাংলাদেশের পত্রপত্রিকাগুলিও এই সময় দ্বিধা বিভক্ত হয়ে একপক্ষ কলোনাইজেসন নীতি সমর্থন করেছিল—অন্য পক্ষ বিরোধিতা করেছিল।

রামমোহন রায় বিশ্বাস করেছিলেন কলোনাইজেসনের ফলে, অর্থাৎ ইউরোপীয়রা জমিজমা কিনে এদেশে বসবাস শুরু করলে ও মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থা প্রচলিত হলে সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভারতবাসীর উন্নতি হবে। দ্বারকানাথ ও প্রসন্নকুমারও এই মতের সমর্থক ছিলেন। ১৮২৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় (এই সভা কলোনাইজেসনের সমর্থকদের দ্বারা আহ্বান করা হয়েছিল এবং এর সভাপতি ছিলেন বিখ্যাত 'পামার এণ্ড কোং'-এর সর্বাধ্যক্ষ জন পামার সাহেব—যাঁর বাংলাদেশ জুড়ে নীলের চাষ ছিল এবং ৬টি জাহাজ ছিল। (এ দেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যাধিকারের বিরুদ্ধে পামার-কোম্পানী ছিল এক প্রবল প্রতিপক্ষ) রামমোহন রায় খুব খোলাখুলিভাবেই বলেন, : I am impressed with the conviction that the greater our intercourse with European gentlemen, the greater will be our improvement in literary, social and political affairs. এই প্রসঙ্গে তিনি গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী নীলকরদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন এবং দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, তাদের সান্নিধ্যে এসে আমরা উপকৃতই হয়েছি। রামমোহন বলেন, 'বাংলা ও বিহারের বহু জেলা পরিভ্রমণ করে আমি দেখেছি যে, যে-সকল অঞ্চলে নীলকুঠি গড়ে উঠেছে ও শ্বেতাঙ্গ নীলকরেরা বসবাস করছে সে-সব অঞ্চলে মানুষদের জীবন যাত্রার মান, যে সব অঞ্চলে নীলকুঠি গড়ে ওঠে নি তার তুলনায় উন্নত।'

ঐ একই সভায় দ্বারকানাথ ঠাকুরও ইউরোপীয়দের স্থায়ীভাবে বসবাস ও অবাধ বাণিজ্যের সমর্থন করতে গিয়ে নীলকরদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেন, 'I have found the cultivation of indigo

and residence of Europeans have considerably benefited the country and the community at large......'

নীলকরেরা অত্যাচারী ছিল কিনা এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে রামমোহন বলেন, 'কোনো কোনো ক্ষেত্রে নীলকরদের অত্যাচারের কথা শোনা গেলেও তা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং নীলকরেরা রায়তের মন্দ অপেক্ষা ভালই বেশী করছে।' আর দ্বারকানাথ ঠাকুর বলেন, 'There may be a few exceptions as regard the general conduct of indigo-planters but they are, extremely limited, and are comperatively speaking of the most trifling importance— এইভাবে ১৮২৯ সালে রামমোহন-দ্বারকানাথের মত বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী যখন কলোনাইজেসনের জন্য ব্যাকুল হয়ে অত্যাচারী নীলকরদের প্রশংসা করছিলেন তখন বাংলাদেশের আর এক বরেণ্য বুদ্ধিজীবী হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ? নীলকর ও নীলচাষে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল ? 'কলোনাইজেসন' বিষয়ে তিনি কি ভেবেছিলেন ? তিনি কি ভারতের মাটিতে ইউরোপীয় বণিকগণের স্থায়ীভাবে বসবাস ও মুক্ত বাণিজ্যের পক্ষে ছিলেন, অথবা বিপক্ষে ? অত্যাচারিত নীল কৃষকের দুর্দশা এই মানবতাবাদী কবি-মানুষটিকে কি কোনোভাবে পীড়িত করেছিল ? —এ যাবৎ সম্পূর্ণ অনালোচিত এইসব বিষয়ের উপর সাধ্যমত আলোকপাতের জন্যই এই প্রবন্ধ। কিন্তু মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বেই বলে রাখা ভাল যে, ডিরোজিওর জীবনের সমস্ত তথ্য আজ আর পাওয়া যায় না, এমন কি তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাগুলি—যার মাধ্যমে তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক মতামত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছিল—তার ফাইলও সম্পূর্ণ দুষ্প্রাপ্য। এই অবস্থায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ অপেক্ষা পরোক্ষ প্রমাণের উপরেই আমাদের বেশী নির্ভর করতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুমানমূলক সিদ্ধান্তও গৃহীত হবে। তথাপি এই আলোচনার সূত্রপাত করা হল এই আশায় যে ভবিষ্যতে ডিরোজিও গবেষকগণ বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে অনুসন্ধান ও তথ্যাদি সংগ্রহে রতী হবেন।

ডিরোজিওর জীবনী থেকে দেখা যায় যে, ১৮২২ সালে মাত্র চৌদ্দ

বছর বয়সে ছাত্রজীবন সম্পূর্ণ করে তিনি কলকাতার 'জেমস স্কট এণ্ড কোম্পানী'তে করণিকের কাজ গ্রহণ করেন ( ১৮২৩ )। কিছুদিন এই কাজ করার পর তিনি ভাগলপুরের তারাপুর গ্রামে তাঁর মেসোমশাই ( এবং মামাও ) আর্থার জনসনের নিকট চলে যান। জনসন ছিলেন একজন নীলকর এবং তারাপুরে তাঁর নীলের চাষ এবং নীলকুঠি ছিল। 'বিদ্রোহী ডিরোজিও' গ্রন্থে বিনয় ঘোষ লিখেছেন, 'নীলচাষের বড় কেন্দ্র ছিল তখন ভাগলপুর অঞ্চল। নীল ব্যবসায় মুনাফাও ছিল যথেষ্ট। কুঠিয়াল জনসনের অর্থের অভাব ছিল না।' ডিরোজিও কলকাতা ছেড়ে কেন ভাগলপুরে জনসনের নিকট গিয়েছিলেন এ বিষয়ে পরস্পরবিরোধী মত পাওয়া যায়। বিনয় ঘোষ বলেছেন, চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী হয়ে কেরাণির কলম-পেষার কাজ তাঁর ভাল লাগে নি বলেই তিনি ভাগলপুরে মাসীমার নিকট বেড়াতে চলে যান। কিন্তু 'ডিরোজিও' গ্রন্থে যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন, কলকাতায় করণিকের কাজ করতে করতে ডিরোজিও অসুস্থ হয়ে পড়লে স্বাস্থ্য-উদ্ধারের জন্য তিনি ভাগলপুরে যান। সেখান থেকে করণিকের কর্মে তিনি আর ফিরে আসেন নি। জনসনের নীলকুঠির কাজে যোগ দিয়েছিলেন। নব্য বঙ্গের অন্যতম নির্মাতা মানবতাবাদী ও স্বদেশপ্রেমিক কবি ডিরোজিও নীলকুঠির কর্মচারী হয়েছিলেন—এ কথা ভাবতেও বিস্ময় লাগে। ডিরোজিও যে নিয়মিত নীলকুঠির কাজকর্ম করতেন—এ কথা যোগেশচন্দ্র বলেছেন। তিনি কত দিন এই কাজ করেছিলেন ? এ বিষয়ে প্রামাণ্য তথ্য বিনয় ঘোষ দিতে পারেন নি। টমাস এডওয়ার্ড্স্ লিখিত ডিরোজিওর জীবনীগ্রন্থ ও যোগেশচন্দ্রের গ্রন্থ থেকে দেখা যায়, ডিরোজিও প্রায় তিন বৎসর কাল ভাগলপুরের তারাপুর নীলকুঠির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং 'কুঠির কাজকর্মেও একান্তভাবে লিপ্ত' হয়ে পড়েছিলেন। ডিরোজিও নিজেও তাঁর 'দি ফকীর অব জঙ্গীরা' কাব্যের টীকা অংশে বলেছেন, '**Although I once lived nearly three years in the vicinity of Jungheera, I had but one opportunity of seeing the beautiful and truly romantic spot.** 'জঙ্গীরা' একটি পাহাড়ের নাম। ভাগলপুরস্থ তারাপুর গ্রামের অদূরেই ছিল গঙ্গানদী। নদীর কয়েকটি বাঁক ফিরলেই মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে প্রায় ৭০ ফুট উঁচু জঙ্গীরা পাহাড়। পাহাড়ের উপরে কিছু ছোট

ঘরবাড়ির সঙ্গে একটি ফকিরের আশ্রমও ছিল। এই পাহাড় ও ফকিরের আশ্রমকে কবি-কল্পনায় রূপান্তরিত করে তিনি লিখেছিলেন 'দি ফকির অব্ জঙ্গীরা'— কাব্য। উপরে উদ্ধৃত ডিরোজিওর নিজের উক্তি থেকেই দেখা যায় তিনি প্রায় তিন বৎসর (nearly three years) ভাগলপুরে ছিলেন। যোগেশচন্দ্র এই উক্তির আলোকে হিসেব করে দেখিয়েছেন, 'ধর্মতলা একাডেমি' ছাড়ার পর এবং হিন্দু কলেজের শিক্ষকতা গ্রহণের মধ্যে সময়কাল হ'ল তিন বৎসর চার মাস (১৮২৩ থেকে ১৮২৬ সালের মে মাস পর্যন্ত, ১ মে ১৮২৬ সালে ডিরোজিও হিন্দু কলেজে শিক্ষক নিযুক্ত হন)। এই তিন বৎসর চারমাসের মধ্যে ডিরোজিও প্রায় তিন বছর ভাগলপুরে কাটান, কাজেই তিনি যে এক বছরেরও কম সময় কলকাতায় পূর্বোক্ত সদাগরী আপিসে কেরাণিকের কাজ করেছিলেন— এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

ডিরোজিও যখন ভাগলপুরের নীলকুঠিতে কাজ করেছিলেন—তখন ভাগলপুরসহ সমগ্র বিহার অঞ্চলেই নীলের চাষ বিস্তার লাভ করেছিল। ভাগলপুর নীল চাষের সমৃদ্ধ কেন্দ্র ছিল। ডাঃ ফ্রান্সিস বুকানন ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশ ও উত্তরভারতে যে সমীক্ষাকার্য চালান তার মধ্যে ভাগলপুর জেলাও ছিল। সাত বৎসর ধরে এই সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। সেই সময়ই ফ্রান্সিস বুকানন ভাগলপুরের ইউরোপীয় বণিক-গণের দ্বারা নীলের সমৃদ্ধ চাষ লক্ষ্য করেছিলেন। উইলিয়ম হাণ্টার তাঁর বিখ্যাত 'The Indian Empire' গ্রন্থে বিহারে নীলচাষের যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে দেখা যায়, সেখানে নীলের চাষ বাংলাদেশের মত 'রায়তী প্রথা'—নির্ভর ছিল না অর্থাৎ দাদন দিয়ে রায়তের জমিতে রায়তের গরু লাঙ্গল পরিশ্রমে নীল চাষ বেশী করানো হত না। দাদনী ব্যবস্থার পরিবর্তে নীলকরেরা পারিশ্রমিকের চুক্তিতে মজুর রেখে নীল চাষ করাত। নীলের জন্য জমি নীলকরেরা পত্তনী নিত অথবা ১৮৩৩ সালের পরে সরাসরি ক্রয় করত। এই অবস্থাতে কৃষক নির্যাতন যে কিছুমাত্র কম ছিল না, হাণ্টারের উক্তি থেকেই বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যায়। তিনি লিখেছেন, 'This system has however, its own complications and for a time gave rise to strained relations between the

planters, the native landholders, and the cultivators.'

আর্থার জনসনের নীলকুঠিতে কি কৃষক নির্যাতন হত? নীলশ্রমিকরা কি বেতের উপর চামড়ায় মোড়া 'শ্যামচাঁদে'-র আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হত? —এ প্রশ্নের প্রামাণ্য উত্তর আমাদের জানা নেই। তবে 'যেখানেই নীলচাষ সেখানেই অত্যাচার'—এটা ছিল একটা 'সাধারণ সত্য' এবং এই কারণেই নীল-কমিশনে (১৮৬০) সাক্ষ্য দিতে এসে ফরিদপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট্ E. Dealtour সাহেব বলেছিলেন, 'মানুষের রক্তে মাখামাখি না হয়ে এক বাক্স নীলও ইংলণ্ডে রপ্তানী হয় না' ('Not a chest of indigo reached England without being stained with human blood)। নীলকুঠির কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে ডিরোজিও যে সাংবাদিকতার বৃত্তি গ্রহণ করে কলকাতার অনিশ্চিত জীবনে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এর কারণ কি শুধু সাহিত্য ও সাংবাদিকতাব আন্তর-তাগিদ? অথবা তাঁর মত সুকুমার-মনোবৃত্তিব অধিকারী, মানবতাবাদী মানুষের পক্ষে নীলকুঠির পরিবেশ অসহ্য হয়ে উঠেছিল? নীলকুঠির কাজে অর্থ ছিল, স্বাচ্ছন্দ্যও ছিল। উপরন্তু নীল-কুঠিয়াল জনগণ তাঁর নিকট-আত্মীয় ছিলেন। এসব কিছু ত্যাগ কবে, প্রতাপ ও প্রাচুর্যের সম্ভাবনায় কর্মক্ষেত্র থেকে স্বেচ্ছায় প্রত্যাবৃত্ত হয়ে তিনি কেন নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন দারিদ্র কণ্টকিত, সমস্যা-প্রপীড়িত সংগ্রামের জীবনাবর্তে? স্বভাবতই এসব প্রশ্নের উত্তর এখন আর সঠিক-ভাবে জানার উপায় নেই। তাঁর জীবনী থেকে জানা যায়, ভাগলপুরে থাকা কালে তিনি 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ জন গ্রান্টের নিকট শুধু কবিতাই পাঠাতেন না—ব্যক্তিগত চিঠিপত্রও লিখতেন। তাঁর পিতা ফ্রান্সিসও তখন জীবিত ছিলেন। তাঁকেও হয়ত চিঠিপত্র লিখতেন। এসব চিঠি উদ্ধার করা গেলে ডিরোজিওর মানসিক অবস্থা সম্পর্কে এবং তারাপুরের নীলকুঠিতে তাঁর কর্মজীবন ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে নতুন তথ্য জানা যেত। গ্রাণ্ট এবং ডিরোজিওর মধ্যে লিখিত পত্রাবলী পাওয়া যায় নি বলে ডিরোজিও-জীবনীকার এডওয়ার্ডসও আক্ষেপ করেছেন।

যা-হোক, ডিরোজিওর পক্ষে নীলকুঠির কাজ করা সম্ভব হ'ল না। সম্ভব ছিলও না। তাঁর মানসিক গঠন এই কাজের সম্পূর্ণ প্রতিকূল ছিল।

'ধর্মতলা একাডেমিতে তিনি যে শিক্ষকের নিকট পাঠ গ্রহণ করেছিলেন—সেই ডেভিড ড্রামণ্ডের ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছিল তাঁর উপর অত্যধিক। ড্রামণ্ড ছিলেন যুক্তিবাদী, সত্যনিষ্ঠ, মানবপ্রেমিক শিক্ষক। স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত দার্শনিক ডেভিড হিউমের (১৭১১-৭৬) আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত ছিলেন। পরোপকার, মানবসেবা প্রভৃতি ছিল হিউমের ধর্ম। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কেও হিউম ছিলেন সংশয়বাদী। ড্রামণ্ডের মধ্যেও এই গুণগুলি দেখা গিয়েছিল এবং শিক্ষকের আদর্শে তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ডিরোজিয়োও হিউমের মতবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। সত্যনিষ্ঠা, যুক্তিবাদ, স্বদেশপ্রাণতা, মানবপ্রেম—ডিরোজিওর চরিত্রে মূর্ত হয়ে উঠেছিল সেই কৈশোর কালেই। তাঁর খণ্ড কবিতাগুলিই তার প্রমাণ বহন করে। তার অনেকগুলিই ভাগলপুরে থাকতে লিখিত হয়েছিল। এ রকম চরিত্রের মানুষের পক্ষে আর্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের লোভে নীলকুঠির কাজে আবদ্ধ হয়ে থাকা সম্ভব ছিল না।

কাজেই ডিরোজিও ১৮২৬ সালে কলকাতা ফিরলেন। জীবনীকারগণ বলেছেন, কলকাতায় ফিরে তিনি অন্তত দুই-তিন মাস 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রিকার সাব্ এডিটররূপে কাজ করেন। তারপর ১লা মে (১৮২৬) হিন্দু কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন। যোগেশচন্দ্র বলেছেন,' শিক্ষকপদে নিয়োগের পরেও যে তিনি সহ-সম্পাদকের কার্যে রত ছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। দুই তিন বৎসর পরে কলেজের কাজ বাড়িয়া গেলে তিনি বেতনভোগীরূপে গেজেটের (ইণ্ডিয়া গেজেট) সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিনা, বলিতে পারি না। তবে ইহার সঙ্গে তাঁহার সংযোগ বরাবরই ছিল।'

'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ জন গ্রাণ্ট ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাক্তার ছিলেন। পত্রপত্রিকার ইতিহাস থেকে দেখা যায়, 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রিকাটি ১৭৭৪ সালে 'first official organ of the Indian Government' রূপে প্রকাশিত হয়। প্রথমে ছিল সাপ্তাহিক, ১৮২২ সাল থেকে সপ্তাহে দু'বার এবং ১৮৩০ সাল থেকে সপ্তাহে তিনবার প্রকাশিত হতে থাকে। পরে দৈনিক পত্রিকাতে রূপান্তরিত হয়। পত্রিকাটির চরিত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে—'Its politics approached of even the radical party. It was however,

distinguished for the general gentlemanliness of its tone.'

কলোনাইজেসন-বিতর্ককালে এই পত্রিকাটি স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করে। ডিরোজিওর মানসিকতার সঙ্গে এই উদারপন্থী পত্রিকাটির যথেষ্ট মেল-বন্ধন ঘটেছিল।

১৮২৭ সালে ডিবোজিও প্রকাশ করেন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দি পোয়েমস্'। ১৮২৮ সালে 'দি ফকীর অব জঙ্গীরা'।

ডিরোজিওর কবিতাবলীর মধ্যে 'ক্রীতদাসের মুক্তি' ('ফ্রিডম টু দি শ্লেভ') নামে একটি কবিতা আছে। এ কবিতাটি রচনার তাৎপর্য কি এবং এর পেছনে তারাপুব নীলকুঠির নীল-ক্রীতদাসদের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা কি কোন ভাবে কাজ করছে? বিষয়টি একটু বিশ্লেষণের যোগ্য। এই কবিতায় কবি বলেছেন –

How felt he when he first was told
A slave he ceased to be ;
How proudly beat his heart, when first
He knew that he was free '—

কীবতাটিব মর্মার্থ সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন বিনয় ঘোষ তাঁর 'বিদ্রোহী ডিরোজিও' গ্রন্থে—'কবি ডিরোজিও বলেছেন, গোলাম যখন জানতে পারল যে সে তার দাসত্বের নির্বাসনদণ্ড থেকে মুক্ত, তখন তার অন্তরাত্মা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। যখন স্বাধীন জীবনের স্বাদ পেল, তখন মুক্ত মানুষের উন্নত চিন্তাভাবনাগুলিও তার মনের অনন্ত আকাশে তারার মত ঝিকমিক করতে লাগল। কারও কাছে সে আর নতজানু হবে না, মাথা হেঁট করবে না, মাথা উঁচু করে উচ্চচিন্তা করবে নির্ভীক বীরের মত। এই কথা ভাবতে ভাবতে একবার সে আকাশের দিকে মুখ তুলে চেয়ে দেখল, মুক্ত হাওয়া হাত বুলিয়ে গেল তার মাথায়। আনন্দে আত্মহারা হয়ে মুক্ত-বিহঙ্গের ডানা ঝাপটানি সে দেখতে লাগল। বহমান নদীর দিকে চেয়ে রইল এক দৃষ্টিতে। ভাবতে লাগল—এই আকাশ, এই বাতাস, এই পাখি, এই নদী—এদের মতো আমিও স্বাধীন, আমিও মুক্ত। মুক্তি ও স্বাধীনতা

কথার মধ্যে না জানি কি ঐন্দ্রজালিক মোহ আছে। তার নাম করলেই যেন আত্মার বেদীমূলে আলোক-প্রদীপ জ্বলে ওঠে, অনির্বাণ তার দীপশিখা। 'স্বাধীনতা' নামের মাহাত্ম্য এমন, যে-দেশপ্রেমিক তার পবিত্র নামে সংকল্প করে তরবারি কোষমুক্ত করেন, তাঁর পরাজয় হয় না। যে-বক্ষ থেকে রক্ত ঝরে পড়ে, আত্মোৎসর্গের গৌরবে সেই বক্ষই টানটান হয়ে ফুলে ওঠে। যে হাত অত্যাচারীর শৃংখল ছিন্ন করে পরাধীন লাঞ্ছিত মানুষকে আত্মমর্যাদা দান করতে পারে—সে হাত ধন্য।'

আমরা জানি, কবিতা কবির ব্যক্তিমনের সৃষ্টি হলেও সেই 'ব্যক্তি মন' আসলে 'সামাজিকমন'—বহমান সমাজের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় যা সব সময় আন্দোলিত। কবিতা কবির সামাজিক-অভিজ্ঞতারই ছন্দোময় ফসল। 'ক্রীতদাসের মুক্তি' কবিতা রচনার পশ্চাতে ডিরোজিওর যে সামাজিক মন ক্রিয়াশীল ছিল তার বস্তুভিত্তি হিসেবে বিনয় ঘোষ কলকাতা শহরের বুকে প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত গোলামির ব্যবসাকে নির্দেশ করেছেন। এই নিষ্ঠুর দাস ব্যবসা রদ করার জন্য তখন পর্যন্ত কোনো আইন হয় নি। সংবাদপত্রে প্রকাশ্যে বিজ্ঞাপন দিয়ে গোলাম ক্রয়-বিক্রয় হত। রামমোহন বা দ্বারকানাথ এই ঘৃণ্য ব্যবসার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ আন্দোলন করেন নি। ডিরোজিওর তীক্ষ্ণ সমাজ সচেতন মন দাস জীবনের দুঃখ কষ্ট সম্পর্কে সংবেদনশীল হয়ে উঠেছিল। তারই পরিণতি ঐ কবিতা। কিন্তু শুধু কলকাতা শহরের দাস ব্যবসার নারকীয়তাই কি এর সঙ্গে যুক্ত? ১৮২৭ সালে আঠার বছর বয়সে কবি-ডিরোজিও যখন এই কবিতা লেখেন তখন তাঁর স্মৃতিপটে সদ্য ছেড়ে-আসা ভাগলপুরের নীল শ্রমিক বা নীল চাষীর কথা কি উদয় হয় নি? আমাদের বিশ্বাস, হয়েছিল। কিন্তু সে কথা কেউ উল্লেখ করেন নি। বস্তুত, কলকাতা শহরে গোলামীর ব্যবসাকে ডিরোজিও দেখেছিলেন দূর থেকে, অসম্পৃক্ত ভাবে। এ দেখা অনেকটাই ছিল নৈর্ব্যক্তিক দেখা। কিন্তু ভাগলপুরের কর্মজীবনে, নীলকুঠিতে, নীলের জমিতে তিনি গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন কৃষক জীবনের সঙ্গে—যাদের অবস্থা গোলামের চেয়ে কোনো অংশে উন্নত ছিল না। জীবিকাসূত্রে আপন অভিজ্ঞতা দ্বারা লব্ধ দাস জীবনের সেই প্রাত্যহিক যন্ত্রণা কবিমনে গভীরভাবে ছাপ ফেলেছিল বলেই তাদের জন্য মুক্তির আকুলতাও এমন

আন্তরিক উচ্চারণে উৎসারিত হয়েছে।

কবিতাটির মধ্যে মুক্ত জীবনের অনুষঙ্গবাহী হয়ে যে সব প্রাকৃতিক উপাদান উপস্থিত হয়েছে, যেমন—মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস, বহমান নদী, বন্য পাখির উড়ন্ত ঝাঁক ইত্যাদি—এসব কিছুই ভাগলপুরের গঙ্গা-তীরবর্তী গ্রাম-জীবনের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশকেই যেন মনে করিয়ে দেয়।

'He looked above—the breath of Heaven
Around him freshly blew
He smiled exultingly to see
The wild birds as they flew,
He looked upon the running stream
That 'neath him rolled away ;
Then thought on winds, and birds, and floods
And cried, 'I am free as they !'

—এ কবিতার মূলে কোনো তাৎক্ষণিক ঘটনার উত্তেজনা কাজ করেছিল বলে জানা যায় না। এ রকম একটি কবিতা তিনি অবশ্য লিখেছিলেন, 'On the Abolition of Sutte'। ১৮২৯ সালের ৪ জানুয়ারী বেন্টিক কর্তৃক সতীদাহ নিবারণ আইন জারি হওয়ার অব্যবহিত পরে আনন্দ প্রকাশ করে। 'ক্রীতদাসের মুক্তি' কবিতাটি যদি সে ভাবেও লিখিত হয়ে থাকে তাহলেও কবির মানস-প্রক্রিয়ার মধ্যে কলকাতার দাস জীবনের ছবির সঙ্গে ভাগলপুরের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা এক সূত্রে মিশে যাওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। ডিরোজিওর জীবনীকারেরা ( টমাস এডয়ার্ড'স, এলিয়ট ওয়ালটার ম্যাজ ) বলেছেন, ভাগলপুরে থাকা কালেই ডিরোজিও মানুষ ও প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। তাঁদের অনুসরণ করে যোগেশচন্দ্রও লিখেছেন—'ডিরোজিওর নিকট কলিকাতা যে অতি প্রিয় ছিল তাহা আর বলার দরকার করে না! তথাপি তারাপুরে পোঁছিয়া তিনি এক নতুন জগতের সন্ধান পাইলেন। কলিকাতা ও তারাপুর, দুইয়ে মিলিয়া তাঁহার নিকট স্বদেশের একটি পরিপূর্ণ রূপ উদ্ভাসিত হইল। পল্লীর পরিবেশ, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ ও মনুষ্যেতর

প্রাণী যেন মিলিয়া গিয়াছে। সাধারণ মানুষ সহজ ভাবে চলাফেরা করে, চাষ আবাদে লাগিয়া যায়, দিনান্তে ঘরে ফিরিয়া ক্লান্তি দূর করে। শিশুরা ধুলা মাটি মাখিয়া নগ্ন দেহে খেলায় মাতিয়া যায়। নারী পুরুষ দুইয়ে মিলিয়া কাজ করে। রাখাল স-বৎস গরু মহিষ মাঠে চরায়। কত বিচিত্র রকমের পাখি আকাশে উড়িয়া যায়। নিচের দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ শস্যক্ষেত্র, উপরে সীমাহীন উন্মুক্ত আকাশ। সবে মিলিয়া ডিরোজিওর কবিচিত্তে এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনা জাগায়। কঠোর খাটাখাটুনি সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশা ঘুচিতেছে না। বলাই বাহুল্য ইহা দেখিয়া ডিরোজিও খুবই ব্যথিত হন।'

প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের মধ্যেও ডিরোজিও কখনো মানুষের দুঃখ দারিদ্র শোষণ বঞ্চনার কথা ভোলেন নি। এখানে থাকাকালেই স্বদেশের হৃত গৌরব ভগ্নজীর্ণ যে মূর্তি তাঁর দৃষ্টিতে উদ্ঘাটিত হয়েছিল তার বেদনাকেই তো ভাষা দিয়েছেন 'To India, My Native land' কবিতায়। অন্যদিকে প্রকৃতির নির্বাধ মুক্ত জগতের সঙ্গে মুক্ত ক্রীতদাসের আনন্দকে একসূত্রে গেঁথে তারাপুরের অভিজ্ঞতার স্মৃতিকেই যেন কলকাতার দাস ব্যবসার পটভূমিতে জাগ্রত করে তুলেছেন কবি ডিরোজিও। এ কবিতা বস্তুত এক মিশ্র প্রতিক্রিয়ার ফসল।

কলকাতায় হিন্দু কলেজের শিক্ষকতার জীবনে ডিরোজিও নিজেকে যুক্ত করেছেন বহুমুখী কর্মধারার সঙ্গে। কলোনাইজেসন বিতর্কেও যে যোগ দিয়েছেন তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণ দুই-ই পাওয়া যায়। নীলকর অত্যাচার ও জমিদার কর্তৃক কৃষক নির্যাতনের বিষয়েও এই সময় তিনি সজাগ হয়ে উঠেছিলেন—তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর সম্পাদিত 'The Kaleidoscope' পত্রিকা থেকে। কিন্তু তার কথা পরে।

১৮৩০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী ডিরোজিওর ছাত্ররা ( কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রমুখ ) প্রকাশ করেন 'পার্থিনন' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। এ পত্রিকাটি ছিল ডিরোজিও প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক বিতর্ক সভা 'একাডেমিক এসোসিয়েশন'-এর মুখপত্র। (১৮২৮ সালের

প্রথমে বাঁ মধ্যভাগে এই ঐতিহাসিক সভাটি জন্মলাভ করেছিল বলে যোগেশচন্দ্র জানিয়েছেন)। গোঁড়া হিন্দু সমাজের আক্রমণে পত্রিকার দুটির বেশী সংখ্যা প্রকাশিত হতে পারে না এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটিও ঠিকমত বিলি করা যায় না। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই দুই বিতর্কিত বিষয়ের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয। একটি স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক, অন্যটি কলোনাইজেসন বিষয়ক। সমকালীন কলোনাইজেসন বিতর্কের প্রতিক্রিয়াতেই যে ঐ প্রবন্ধটি লিখিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। লেখাটি ডিরোজিওর হতে পারে, না-ও হতে পারে। পত্রিকার ফাইল পাওয়া যায় না—কাজেই এ বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলা সম্ভব নয়। ছাত্রদের মধ্যে কেউ লিখে থাকলে শিক্ষক ডিরোজিও তা সংশোধন করতে পারেন। তবে 'কলোনাইজেসন' বিষয়ে যে প্রবন্ধ 'পার্থিনন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল—তার বক্তব্যের সঙ্গে ছাত্র শিক্ষক একমত ছিলেন বলেই মনে হয়। বিশেষত, এ পত্রিকা যখন 'একাডেমিক এসোসিয়েশনে'র মুখপত্র ছিল এবং ডিরোজিও স্বয়ং তার সভাপতি ও মূল কর্ণধার ছিলেন তখন ডিরোজিওর পরামর্শ ও অনুমোদনক্রমেই যে কলোনাইজেসন বিষয়ে বক্তব্য প্রচারিত হয়েছিল—এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। কিন্তু সে বক্তব্য কি ছিল? 'Kaleidoscope' পত্রিকার আলোকেই তার উত্তর আমাদের খুঁজে নিতে হবে।

হিন্দু কলেজ থেকে কর্মচ্যুত হবার পর ডিরোজিও প্রকাশ করেছিলেন 'The East Indian' নামক পত্রিকা (১৮৩১, ১লা জুন)। 'পার্থিনন' পত্রিকার সম্পাদক ডিরোজিও ছিলেন না। তাঁর ছাত্ররাই এই কাগজ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান' কাগজ ডিরোজিওর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়ান বলতে তখন ইউরেশিয়ান বা ফিরিঙ্গিদের বোঝাত। ডিরোজিও নিজেও এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ভারতীয়দের মত ফিরিঙ্গিদেরও তখন কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। 'নেটিভ'-দের মত তাদেরও কোনো সরকারী পদে গ্রহণ করা হত না, স্থলবাহিনীর কোন কাজও দেওয়া হত না। ১৮২৪ সালে সরকারি-নীতির কিছু পরিবর্তন ঘটলে ভারতীয়রা ছোট খাটো সরকারি পদে নিযুক্ত হতে থাকে। কিন্তু ফিরিঙ্গি সম্প্রদায়ের নিকট অল্প বেতনের ঐ সকল কাজ গ্রহণযোগ্য হয় না। ডিরোজিওর কনিষ্ঠ ভ্রাতা উচ্চশিক্ষার জন্য স্কটল্যাণ্ডে

প্রেরিত হয়েছিলেন। ভারতে ফিরে এলে তাঁর যথাযোগ্য কর্মসংস্থান হবে না ভেবে ভ্রাতার উদ্দেশে একটি মর্মস্পর্শী কবিতা লিখেছিলেন ডিরোজিও। ইউরোপীয়দের নিকট অবজ্ঞা ও অপমানজনক ব্যবহার লাভের ফলেই তৎকালে ফিরিঙ্গিরা মিশ্র রক্তের মানুষ হযেও ভারতকে তাঁদের জন্মভূমি ভাবতে শিখেছিলেন। ডিরোজিওর মধ্যে এই চেতনা প্রবল হযে উঠেছিল যার প্রকাশ 'To India, My Native Land' কবিতায় লক্ষ্য করা গেছে। ফিরিঙ্গি-সম্প্রদায়ের নানা অভাব-অভিযোগ প্রতিকারের জন্য তিনি 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান' কাগজ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এটি একটি সম্প্রদায়-বিশেষের কাগজ মাত্র ছিল না। কাগজটির অনুষ্ঠান পত্রে ( prospectus of the East Indian, Daily News paper ) লেখা হযেছিল—'It will advocate the just rights of all classes of the community'. সকল মানুষের অধিকার রক্ষার বিষযেই কাগজটি তৎপর থাকবে—এই ছিল তার ঘোষিত নীতি। এই দায়িত্ব পত্রিকাটি নিশ্চয়ই সুষ্ঠুভাবে পালন করেছিল। কিন্তু এই পত্রিকাও সম্পূর্ণ দুষ্প্রাপ্য বলে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না।

কলোনাইজেসন, নীলচাষ, নীলকর ইত্যাদি সম্পর্কে ডিরোজিওর দৃষ্টিভঙ্গী হয়ত আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই থাকত—যদি না 'The Kaleidoscope' পত্রিকার ফাইল আবিষ্কৃত হত। সুখের বিষয়, অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় কিছুদিন পূর্বে এই পত্রিকার ফাইল উদ্ধার করেছেন এবং অন্যান্য দলিলের সঙ্গে তাঁর সম্পাদিত 'Bengal : Early Nineteenth Century' গ্রন্থে ( জুন, ১৯৭৮ ) মুদ্রিত করেছেন। ডিরোজিও কর্তৃক সম্পাদিত এই পত্রিকাটির কথা নানা সূত্রেই শোনা গেছে। *১৮২৯.

* পত্রিকাটি ডিরোজিওর সম্পাদনা, এমন কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। তবে পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা ডিরোজিওর সনেট 'To the Pupils' দিয়ে শুরু এবং 'সম্পাদকীয়' লেখা হয়েছে কবিতায়— এ থেকে পরোক্ষভাবে ধরে নেওয়া যায় স্বয়ং সম্পাদক না হলেও পত্রিকাটির সাথে ডিরোজিওর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল। গৌতম চট্টোপাধ্যায় অবশ্য দৃঢ়তার সঙ্গেই জানিয়েছেন—Kaleidoscope—edited by Derozio himself, যদিও জীবনীকার এডোয়ার্ডের মতে ডিরোজিও ছিলেন contributor to the Kaleidoscope. —সম্পাদক

সালের আগষ্ট মাসে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল এবং ১৮৩০ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত এর আয়ুষ্কাল ছিল। এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন রচনায় ডিরোজিও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, গ্রাম বাংলায় কৃষকের অবস্থা, ইষ্ট ইন্ডিয়ান বা ফিরিঙ্গিদের দুরবস্থা,

THE

# KALEIDOSCOPE.

## *No.* 1.—*August*, 1829.

ADDRESS

*Prefatory, Explanatory, Expostulatory, and Dedicatory.*

I

A CUSTOM 'tis at each important meeting
(Be it about diplomacy or not)
To greet with plaguy ceremonious greeting,
And so by us it shall not be forgot —
Therefore we're bowing, scraping, and retreating,
Looking quite *non plused*, and we know not what—
Fearing, most mighty PUBLIC! how to meet you,
And almost hardly knowing how to greet you.

II

But salutations now are quite the way
Of those who stand to meet the public eye,
And offer up themselves as willing prey
To every ill-willed fiend's malignity,
So that we too must even say our say,
And to get creditably off we'll try,
'Tis all we can · but if the gods don't bless,
' 'Tis not in mortals to command success '

Kaleidoscope পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠা

কলোনাইজেসন, ফি ট্রেড, নীলকর প্রসঙ্গ প্রভৃতি উত্থাপন ও কোনো কোনোটির উপর বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ডিরোজিওর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতামত জানার পক্ষে এখন এই পত্রিকা-পাঠ অপরিহার্য।

১৮২৮-২৯ সালে কলোনাইজেসন বিতর্ক প্রবলাকার ধারণ করেছিল, এ কথা পূর্বে বলেছি। রামমোহন রায়ের 'সম্বাদ কৌমুদী', রামমোহন-দ্বারকানাথের স্বত্বাধিকারযুক্ত 'বঙ্গদূত' পত্রিকা, জে. সি. মার্শম্যান সম্পাদিত 'সমাচার দর্পণ', ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সমাচার চন্দ্রিকা' ইত্যাদি বাংলা পত্রিকা এবং 'বেঙ্গল হরকরা', 'জনবুল' 'ক্যালকাটা জার্নাল' ইত্যাদি ইংরেজী-পত্রিকা—সকলেই কলোনাইজেসনের পক্ষে বা বিপক্ষে অবতীর্ণ হয়েছিল। কলোনাইজেসনের পক্ষে ও বিপক্ষে বৃটিশ পার্লামেণ্টের নিকট দরখাস্ত সমূহ প্রেরিত হচ্ছিল। ১৮২৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে কলকাতার টাউন হলে জন পামারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যে-সভাটির কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে—সেই সভা থেকেই কলোনাইজেসনের সপক্ষে একটি আবেদনপত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় —যার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন রামমোহন-দ্বারকানাথ। বঙ্গীয় জমিদারগণ কলোনাইজেসনের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্রভাবে আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। কোম্পানীর শাসনের অবসান এবং ব্রিটিশ সরকারের অধীনে নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন রামমোহন-দ্বারকানাথের কাম্য ছিল। অন্যদিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রাণপণে তাদের বাণিজ্য-অধিকার ও শাসন ক্ষমতা অক্ষত রাখার চেষ্টা করছিল। এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধে এবার ডিরোজিওকে খোলাখুলি ভাবেই দেখা গেল—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে এবং কলোনাইজেসন ও ফ্রি-ট্রেডের বিরুদ্ধে।

'The Kaleidoscope' পত্রিকার বিভিন্ন রচনায় ডিরোজিওর যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতামত প্রকাশিত হয়েছে তা এ-যাবৎ প্রচারিত ডিরোজিও চরিত্রের সঙ্গে সর্বত্র সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কিন্তু তার বিশ্লেষণ স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়। আমি এখন তাঁর মতামতগুলি সংক্ষেপে শুধু উল্লেখ করছি।

কলোনাইজেসন বিতর্কে যোগ দিয়ে ডিরোজিও পরিষ্কারভাবে বলেছেন, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতের শাসন ক্ষমতা বৃটিশ রাজা বা পার্লামেণ্টের হাতে তুলে দিলে এ দেশের অবস্থার কোনো পরিবর্তনই ঘটবে না—এর প্রমাণ বৃটিশ শাসনাধীন অন্যান্য কলোনীগুলি। সেখানে কি ঘটছে? ডিরোজিওর ভাষায়—

'Despotism, rigour, and cruelty exist there in their worst form, men are deemed mere animals, who may be plundered and hunted down...' তুলনামূলকভাবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন তাঁর কাছে অধিকতর কাম্য মনে হয়েছে। তিনি 'The East India Company's Charter' নামক দীর্ঘ রচনায় (যা দুই কিস্তিতে ১৮২৯ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল) বলেছেন, মুসলমান যুগের অরাজকতার পরিবর্তে কোম্পানীর শাসন শান্তি ও শৃংখলা ফিরিয়ে এনেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু অবিচার বা দুর্নীতি দেখা গেলেও 'For one man who has perhaps suffered injustice there are thousands reposing in peace and security.' মুসলমান আমলের চরম বিশৃংখলার জগতে যে কোম্পানীর শাসন শান্তি-শৃঙ্খলা এনেছে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা বা তার বাণিজ্য অধিকার কেড়ে নেওয়া ডিরোজিওর কাছে রীতিমত অন্যায় বলে মনে হয়েছে। কোম্পানীর 'জন বুল' কাগজ যে সুরে ও যে-ভাষায় কোম্পানীর স্বার্থরক্ষায় তৎপর হয়েছিল—ডিরোজিও-ও একই ভাষায় প্রশ্ন করেছেন, 'And for all these blessings do the Company deserve nothing but the severest reprobation that is continually heaped upon thems ?'

মুক্ত বাণিজ্য বা ফ্রি-ট্রেড সম্পর্কে ডিরোজিওর বক্তব্যও কোম্পানীর একচেটিয়া কারবারের স্বার্থরক্ষাকারী। ঐ একই প্রবন্ধে এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

'The abrogation of the Company's monopoly would, we are told, lead to the opening of the Free Trade, which would be highly beneficial to the interests of both England and India. It is a fallacy to suppose so. What would be gained by one party would inevitably be lost by the other—that is, the advantage would rest on the side of purchasers, while speculators would be the sufferers. When a speculative scheme is confined to within a limited circle, it

thrives much better, than when it is shared by a great number.

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন সম্পর্কে ডিরোজিওর প্রশস্তিমূলক মনোভাব এবং মুক্ত বাণিজ্য সম্পর্কে তাঁর অদ্ভুত যুক্তি আমাদের কাছে বিস্ময়কর বলেই মনে হয়। ইউরোপীয়দের অবাধ বসবাস সম্পর্কে এরপর তিনি প্রবল আপত্তি তুলেছেন। এবং এই প্রসঙ্গে নীলকর-প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে এটাই বিশেষভাবে আমাদের ইতিবাচক উপার্জন। যিনি 'কলোনাইজেসনে'র বিরুদ্ধতা করেন তাঁর পক্ষে কৌশলগত কারণেই নীলকরদের প্রশংসা করা সম্ভব নয়। কারণ গ্রাম-বাংলায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা শ্বেতাঙ্গ নীলকরেরা ভাল এ কথা বললে, ইউরোপীয়দের বসবাস এদেশের পক্ষে কল্যাণকর বলে প্রমাণিত হয়। বস্তুত কলোনাইজেসনের প্রশ্নে নীলকরেরা 'উদাহরণস্বরূপ' ব্যবহৃত হয়েছে উভয় পক্ষের কাছেই এবং বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে। অর্থাৎ কলোনাইজেসনের সমর্থন-কারীরা নীলকরদের টেনে এনে প্রশংসা করেছেন (যেমন রামমোহন, দ্বারকানাথ), আবার বিরুদ্ধবাদীরা নীলকরদের অত্যাচারী বলে প্রতিপন্ন করেছেন। নীলকরদের অত্যাচারের বিষয়টি অন্য-নিরপেক্ষভাবে তখনো বাঙালি বুদ্ধিজীবীর কাছে তেমন গুরুত্ব অর্জন করে নি। এর জন্য আরো কিছুদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে।

ডিরোজিও কলোনাইজেসন প্রসঙ্গে নীলকরদের উদাহরণ টেনে বলেছেন, ইউরোপীয়দের বসবাস এদেশের পক্ষে শুধু অকল্যাণকর নয়, বিপজ্জনকও বটে।

'On the Colonization of India by Europeans' নামক রচনাটি এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। গ্রন্থ-ভূমিকায় ( Bengal : Early Nineteenth Century ) সম্পাদক এই রচনাটিকে ডিরোজিওর বলেই নির্দেশ করেছেন। পত্রিকার অন্যান্য প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে এর সাদৃশ্যও গভীর—সুতরাং এটি ডিরোজিওর রচনা হতে বাধা নেই। ১৮২৯ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় এর বিরুদ্ধে '২০০ মাইল দূরবর্তী' কোন লেখকের প্রতিবাদও প্রকাশিত হয়। 'On the Colonization of India by

Europeans' রচনায় মূলত চারটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছেঃ ১। ভারতে ইউরোপীয়দের অবাধ বসবাস বৃটিশ-রাজত্বের পক্ষে কি ক্ষতিকর হবে? ২। এর ফলে ভারতবাসীরা কি উপকৃত হবে? ৩। এর দ্বারা ইন্দো-বৃটেন সমাজ (অর্থাৎ ফিরিঙ্গি সমাজ) কি কোন ভাবে লাভবান হবে এবং ৪। এর দ্বারা কি পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞান প্রসার লাভ করবে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, অধিক সংখ্যক ইউরোপীয় এদেশে বসবাস করলে এদেশে বৃটিশ-শক্তি সংহত হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে—এর দ্বারা 'নেটিভ'রা মোটেই খুশি হবে না এবং এর ফলও শুভ হবে না। ১৮১৩ সালে কোম্পানীর সনদ নবীকরণের কালে ওয়ারেন হেস্টিংস 'হাউস অফ্ কমন্সে' বলেছিলেন, 'that an intimate intercourse of Europeans with Natives would lead the former to treat them so as to endanger the Country by Causing rebellion.'

ডিরোজিও নিজেও এই মত সমর্থন করেছেন এবং নীলকর-অত্যাচার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেছেন, 'It corroborated by the observations which Bishop Heber makes upon the cruelty and oppressions which the natives suffer from the indigo planters, in those provinces where they have been suffered to locate themselves; and my own inquiries convince me that the conduct of Europeans to their indigenous fellow subjects would tend to alienate them, and ultimately lead to serious consequences. Besides which, I entertain strong doubts whether Europeans can settle in the country without gradually dispossessing the natives of their lands, and causing thereby incalculable misery and dissatisfaction, which, together with the inimical spirit by which I have stated they are at present actuated, would surely be anything but beneficial to the country.'

এখানে শুধু নীলকরদের কথা নয়, সাধারণ ভাবে গ্রামে গঞ্জে ইউ-

রোপীয়ান মাত্রেরই বসবাস সম্পর্কে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। ইতি-মধ্যে যে সকল অঞ্চলে তারা বসবাস শুরু করেছে—সেখানেই যে সাধারণ মানুষের পক্ষে দুঃখ দুর্দশা ও নির্যাতনের কারণ হয়ে উঠেছে—এ কথাও বলা হয়েছে। এ বক্তব্য রামমোহন-দ্বারকানাথের বিপরীত বক্তব্য। গ্রামাঞ্চলে নীলকর বা সমগোত্রীয় বৃটিশ কুঠিয়ালদের অত্যাচার সম্পর্কে রামমোহন-দ্বারকানাথ সচেতন ছিলেন না (অথবা সচেতন থেকেও সত্য গোপন করেছিলেন)। কিন্তু ডিরোজিও কলোনাইজেসনের বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন-ব্যবস্থার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেও গ্রামীণ-কৃষকদের উপর নীলকরসহ অন্যান্য ইউরোপীয়দের নির্যাতনের কথা কখনো বিস্মৃত হন নি। আবার একই সঙ্গে এ কথাও তিনি মনে রেখেছেন যে ভারতবর্ষের মানুষ প্রসন্ন মনে কোম্পানীর শাসন মেনে নেয় নি। তাদের মনে এই শাসনের বিরুদ্ধে চাপা বিক্ষোভ আছে। এই দেশ শাসিত হয় সৈন্যের দ্বারা, এবং সেনাবাহিনী প্রত্যাহৃত হলেই জনগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। উক্ত 'On the Colonization' ইত্যাদি রচনায় তিনি স্পষ্টতঃই বলেছেন, 'The most superficial observer must perceive that India is maintained in subjection only by Military Force. Withdraw it, and the boasted opinion of the natives, instead of supporting, would immediately prove the cause of the utter subversion of the empire. এই প্রসঙ্গে লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকার সংবাদের কথা উল্লিখিত হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে, গত মহরমের সময় মুসলমানেরা প্রকাশ্যভাবেই কোম্পানীর রাজত্বের ধ্বংস কামনা করে প্রার্থনা জানিয়েছে। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য, উত্তর ভারতে এই সময় বৃটিশ-বিরোধী ওয়াহাবী আন্দোলন ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এবং বাংলাদেশেও এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছিল—এই পর্বে বাংলাদেশে যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিতুমীর, 'বাঁশের কেল্লা'র যুদ্ধে বৃটিশ-বাহিনীর কামানের গোলায় যিনি প্রাণ দেন ডিরোজিওর মৃত্যুর সমসময়েই (১৮৩১)। ডিরোজিও কি এই ওয়াহাবী-আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করেছিলেন? তাঁর লেখা থেকে এ বিষয়ে কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

ডিরোজিও শুধু যে গ্রামবাংলায় নীলকর বা অন্য শ্রেণীর ইউরোপীয়ান-

দের অত্যাচার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন—তা নয়, দেশীয় জমিদারের কৃষক নির্যাতনের বিষয়েও তাঁর সচেতনতার প্রমাণ এবার স্পষ্ট ভাবেই পাওয়া গেল উক্ত Kaleidoscope পত্রিকা থেকে। পত্রিকার ১৮৩০ সালের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত 'Cultivation of Hindoosthan' নামক প্রবন্ধে জমিদারদের সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে—'One of the most lazy folks in the world.' জমিদার কর্তৃক কৃষক নির্যাতনের বিষয়ে বলা হয়েছে—Of their cruelties towards the ryots little needs to be said, as they are pretty generally known.' এরপর জমিদার, দারোগা, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদির দ্বারা কৃষকের চরম দুরবস্থার বিবরণও প্রদত্ত হয়েছে। বাংলাদেশে 'তত্ত্ববোধিনী', 'সোমপ্রকাশ', 'সম্বাদ ভাস্কর' ইত্যাদি পত্রিকা (যাতে কৃষক নির্যাতনের ধারাবাহিক বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল) প্রকাশের বহু পূর্বে ১৮২৯-৩০ সালে ডিরোজিও সম্পাদিত এই পত্রিকাটি এ বিষয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

অবশ্য এই পত্রিকার কিছু রচনা যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর। এর কারণ পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের সমাবেশ। সমস্ত রচনাই ডিরোজিওর কিনা—এ বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ থাকে। পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে ডিরোজিওর সঙ্গে আর কারা যুক্ত ছিলেন, এর আর্থিক দায়িত্ব কে বহন করতেন, 'একাডেমিক এসোসিয়েশন' বা ডিরোজিওর প্রিয় ছাত্রদের সঙ্গে এই পত্রিকাটির কতখানি যোগাযোগ ছিল—এ সব বিষয়ে সম্পাদকের ভূমিকা থেকেও কিছু জানা যায় না। এ জন্য নানা ক্ষেত্রেই সংশয়ের অবকাশ থেকে যায়। আশা করা যায়, ভবিষ্যৎ গবেষণায় ডিরোজিও এবং তাঁর পত্র-পত্রিকা সম্পর্কে আরো তথ্য আবিষ্কৃত হবে।

# নূতন যুগের ভোরে

## গৌতম চট্টোপাধ্যায়

১৮২৬ এ মাত্র ১৭ বছর বয়সে হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা করতে আসেন। উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর বয়সের তফাৎ অল্পই ছিল। ফলে গুরুর ভূমিকার বদলে, তিনি হয়ে ওঠেন ঐ উৎসুক ছাত্রগোষ্ঠীর অগ্রজ বন্ধু ও উৎসাহদাতা। ১৮২৯-এর আগস্ট মাসে ক্যালেইডোস্কোপ পত্রিকার লেখা কবিতায় ডিরোজিও ঘোষণা করেন যে আদর্শবাদীর জয়মাল্য একদিন না একদিন তাঁর ছাত্ররা পাবেই আর সেই-দিন তাঁর মনে হবে যে তাঁর জীবন সার্থক।১

১৮২৮-এ ডিরোজিও তাঁর উৎসাহী ছাত্রদের নিয়ে গড়ে তুললেন একটি আলোচনা সভা: অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন। এক অর্থে এটিই আমাদের দেশের প্রথম ছাত্র সংগঠন। এই সংস্থাটির চরিত্র নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বহু বছর পরে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে লেখেন: "এই সংগঠনের সভাগুলিতেই, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, কলকাতার সেরা তরুণেরা তৎকালীন প্রধান প্রধান সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতেন। প্রচলিত ধর্মীয় অন্ধ সংস্কার ও রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহই ছিল তাঁদের আলোচনার মূল সুর।"২

১৮২৯ এই হিন্দু কলেজের প্রগতিশীল ছাত্রগোষ্ঠী পার্থেনন বলে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তার দ্বিতীয় সংখ্যাটি যখন ছাপতে গেছে, তখন কলেজের কর্তৃপক্ষ পত্রিকাটির প্রকাশ নিষিদ্ধ করেন। প্রগতিশীল এই ছাত্র পত্রিকাটির অপমৃত্যুতে একই সঙ্গে উল্লাস জানালেন কড়া ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী মুখপত্র জন বুল্ ও হিন্দু রক্ষণশীলদের কাগজ সমাচার চন্দ্রিকা। ১৮৩০-এর ডিসেম্বরে জন বুল লিখল ঃ

"পার্থেনন কর্তৃক বিপজ্জনক মত প্রচার করা বন্ধ হয়েছে। এদেশীয় ছাত্রদের একচুল স্বাধীনতা দিলে, তারা মাথায় চেপে বসতে চায়। তাদের এই এঁচোড়ে পাকা বাড়াবাড়ি বন্ধ করে তাদের অভিভাবকরা ভাল কাজই করেছেন।"৩

পার্থেনন-এর কণ্ঠরোধ করা হল, ডিরোজিও কার্যত শিক্ষকতার পদ থেকে বিতাড়িতই হলেন, কিন্তু প্রগতিশীল চেতনা বেড়েই চললো। কলকাতার একটি নামকরা ইংরেজি মাসিকপত্রে হিন্দু কলেজের একজন ছাত্র চিঠি লিখে প্রশ্ন করলেন যে ইংরেজরা ভারতবর্ষ জয় করার আগে, এদেশে বর্বরতার স্তরে ছিল, ইংরেজদের এ কথা মনে করার অধিকার কে দিয়েছে? ভারত ছিল একটি শিল্পসমৃদ্ধ, উন্নত সভ্য দেশ এবং আমেরিকার দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে যে ইংরেজদের পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারলে, তবেই ভারতবাসীর দুর্গতি মোচন সম্ভব হবে।৪

তখনকার দিনে সংবাদপত্রের অজস্র টুকরো খবর থেকেও একথা আমরা জানতে পারি যে টম পেইনের 'রাইট্স্ অফ ম্যান' বা বেন্থামের 'ইমানসিপেট দি কলোনিজ' প্রভৃতি বই কলকাতায় এলে ২।৪ দিনে তার কয়েকশত কপি ছাত্রদের মধ্যে বিক্রী হয়ে নিঃশেষ হয়ে যেত। ছাত্রদের তৎকালীন মনোভাব বুঝতে এটা খুবই সাহায্য করে।

ডিরোজিও যে সব পত্র-পত্রিকার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ক্যালেইডোস্কোপ। ১৮২৯-এ এই পত্রিকার একটি প্রবন্ধে লেখা হয় যে 'নিতান্ত উপর উপর যাঁরা বিচার করেন, তাঁরাও নিশ্চিত বুঝতে পারবেন যে শুধুমাত্র সামরিক শক্তির জোরেই ভারতকে পরাধীন রাখা সম্ভব হয়েছে। সৈন্য সরিয়ে নাও, অমনি দেখবে ইংরেজ

শাসনের প্রতি অনুরাগের বদলে, তাদের মেরে তাড়াবার উদ্যোগই নিচ্ছে ভারতবাসীরা।'৫

১৮৩৫-এর ৫ জানুয়ারী কলকাতার টাউন হলে ইংরেজ শাসনের অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার দাবী করে একটি বড় সভা হয়। ডিরোজিওর ছাত্র, দ্বিভাষিক জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকার সম্পাদক ও ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর তরুণ নেতা রসিককৃষ্ণ মল্লিক ঐ সভাতে এক ধারালো ভাষণে বলেন: "গরীব ভারতবাসীর কষ্টার্জিত অর্থ কেন কেড়ে নেওয়া হবে? তারা নিরন্ন ও অর্ধ উলঙ্গ থাকবে, আর বিদেশী শাসনের ও বিজাতীয় ধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তনের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় করা হবে কেন?"৬

ঐ বছর, অর্থাৎ ১৮৩৫, হিন্দু কলেজের ১৬ বছরের ছাত্র কৈলাশচন্দ্র দত্ত "শতবর্ষ পরে তোমার কল্পনার ভারতবর্ষ" এই প্রতিযোগিতায় একটি কল্পিত রোজনামচা লিখে প্রথম স্থান অধিকার করেন। লেখাটির নাম '১৯৪৫-এ ৪৮ ঘণ্টার রোজনামচা"! তাতে একেবারে আধুনিক সশস্ত্র সংগ্রামীর ভাষায় তিনি বর্ণনা দেন কেমন করে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের বর্বর অত্যাচার অসহ্য হওয়ায়, ভারতীয়রা সশস্ত্র গণবিদ্রোহ করে ইংরেজ বড়লাট লর্ড ফেল বুচারকে গদিচ্যুত করে দেশের সেরা দেশভক্তদের নিয়ে এক জাতীয় সরকার গঠন করলেন; শেষ পর্যন্ত কি ভাবে বিদ্রোহ পরাজিত হল, এবং তারপর বিদ্রোহের তরুণ বাঙালী নেতা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে জহ্লাদের হাতে প্রাণ দেবার আগে সর্বসমক্ষে ঘোষণা করলেন যে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য আত্মদানের চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছু হতে পারে না।৭

১৮৩৭, কলকাতার অন্য একটি উদারপন্থী পত্রিকায়, ইংরেজ শাসনে ভারতের অর্থনৈতিক দুর্গতির কথা বলে লেখা হল: "১৮৩৩-এর সনদ গৃহীত হবার দুবছরের মধ্যেই বাংলা প্রেসিডেন্সী থেকে ৬ কোটি টাকা রাজস্ব বিলাতে প্রেরিত হয়েছে এবং আগামী বছরগুলিতে তা বেড়েই চলবে ......এর এক ভগ্নাংশও খরচ করা হচ্ছে না রাস্তাঘাট নির্মাণে, স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠায় বা অন্য কোনও জনকল্যাণকর কাজে।"৮

সামান্য একটু পিছিয়ে যাব। ১৮৩৩-এর সূচনায় হিন্দু কলেজের কয়েকজন উৎসাহী ছাত্র মিলে প্রতিষ্ঠা করলেন সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা।

জন্মলগ্নেই সংগঠকরা ঘোষণা করলেন যে মাতৃভাষা বাংলার বঙ্গসাহিত্যের ও সমাজের উন্নতিই তাঁদের লক্ষ্য হবে এবং এই সংগঠনের সমস্ত কাজকর্ম চালানো হবে শুধুমাত্র বাংলাভাষার মাধ্যমেই। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে আমরা নাম পাচ্ছি রমাপ্রসাদ রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বারকানাথ মিত্র, নবীন মাধব দে, শ্যামাচরণ গুপ্ত প্রভৃতির।৯

১৮৩৩-এ আর একদল ছাত্র বের করলেন বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতে একটি বিজ্ঞান সংক্রান্ত মাসিক পত্র—বিজ্ঞান-সার সংগ্রহ। তার প্রথম সংখ্যাতেই ইংরাজিতে লেখা মুখবন্ধে প্রকাশকরা জানালেন ঃ

"ইউরোপের বিজ্ঞান চর্চার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানকে বাংলাদেশের মানুষদের মধ্যে প্রচার করাই এই পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য, যাতে করে মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য তাঁরা সোৎসাহে কাজে নামেন। ......আমাদের প্রধান লক্ষ্য পাঠকদের আনন্দ দেওয়া নয়, তাদের শিক্ষা দেওয়া, তাদের আত্মসন্তুষ্ট করা নয়, তাদের মহত্তর কর্মযজ্ঞে উদ্দীপিত করা।"১০

১৮৩৮-এর ২০ ফেব্রুয়ারি, ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর ৫ জন বিশিষ্ট প্রতিনিধি—তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও রাজকৃষ্ণ দে—যুক্তকরে স্বাক্ষর করে এক আবেদনপত্র প্রচার করেন। তাতে বলা ছিল যে দেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়মিত আলোচনার জন্য তাঁরা একটি সংগঠন গড়তে চান ও সেই উদ্দেশ্যে ১৮৩৮ এর ২২ মার্চ সংস্কৃত কলেজে তাঁরা একটি সভা ডেকেছেন। সভায় ২০০ ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন, যাঁদের অধিকাংশই ছাত্র। তাঁরা সর্বসম্মতভাবে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা বা Society for the Acquisition of General Knoweldge বলে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন।১১ সংগঠনের ১৮৪০, ১৮৪২ ও ১৮৪৩-এর ছাপানো সভ্যতালিকা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশই ছিলেন ছাত্র, প্রধানতঃ হিন্দু কলেজের। পরবর্তী কালে বাংলার জাগরণে যাঁরা প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই এই সংগঠনের সদস্য ছিলেন যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যাসাগর), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাম-

গোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি।১২

১৮৪১-এ ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর অনেকে আর এক কদম এগিয়ে গঠন করলেন একটি আধা-রাজনৈতিক সংগঠন—দেশহিতৈষণী সভা। হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও তৎকালীন একটি স্কুলের শিক্ষক সারদা-প্রসাদ ঘোষ ছিলেন এই উদ্যমের অন্যতম প্রধান পুরুষ। প্রতিষ্ঠা-সভায় ভাষণ প্রসঙ্গে সারদাপ্রসাদ বলেন: "ইংরেজ-রাজত্বের গোড়া থেকেই আমাদের শাসক-শ্রেণীর মতলব ছিল আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা। আর এই স্বাধীনতাহীনতাই আমাদের সমস্ত দুর্দশার মূল কারণ। তাই আমার প্রস্তাব এই যে দেশের দুর্গতি মোচনের জন্য আমাদের প্রথমত ঐক্যবদ্ধ হতে হবে; দ্বিতীয়ত দেশকে ভালবাসতে হবে; দেশ-প্রেমই হবে ঐক্যের ভিত্তি এবং সেই সঙ্ঘশক্তিকে পরিচালনা করতে হবে জাতীয় কল্যাণের পথে।"১৩ এই সংগঠনের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে এর দরজা খোলা ছিল জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত ভারতীয়র জন্যই।১৪

দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাতে গেলে তাঁর মারফত আমন্ত্রণ জানিয়ে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী ক্রীতদাসত্ব বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম জর্জ টমসনকে কলকাতায় আনান। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকার সভার অনেকগুলি অধি-বেশনে ১৮৪২-৪৩-এ টমসন বক্তৃতা করেন। সবকটি বক্তৃতাই ইয়ং বেঙ্গলের দ্বিভাষিক মুখপত্র বেঙ্গল স্পেক্টেটরে ছেপে বের করা হয়।১৫

১৮৪৩ এর ১৩ এপ্রিল ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর শতাধিক প্রতিনিধির সভায় জর্জ টমসনের উপস্থিতিতে ভারতের জনসাধারণের বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ ও অভাব-অভিযোগসমূহ রাজদরবারে পেশ করবার উদ্দেশ্যে একটি নতুন রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা হল—বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি। এর সভাপতি হলেন জর্জ টমসন, সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্র ও কোষাধ্যক্ষ রামগোপাল ঘোষ।১৬

১৮৪৩-এর মে মাসে এই সংগঠনের মধ্যে একটি নতুন প্রগতিশীল ঝোঁক দেখা দিল—চাষীদের সপক্ষে। বেঙ্গল স্পেক্টেটরের পাতায় একটি প্রশ্নমালা ছাপা হল যাতে চাষের ও চাষীদের দুর্গতির কারণ খুঁটিয়ে বোঝার চেষ্টা করা হল।১৭ তবে এ উদ্যোগ বেশী দিন টিকল না।

সামাজিক রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধেও ইয়ং বেঙ্গলের অগ্রণী অংশ ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। ১৮৩১এ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সামাজিকভাবে প্রগতিশীল একটি ইংরেজী নাটক লিখেছিলেন—দি পারসিকিউটেড। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার অধিবেশনে তরুণ মহেশচন্দ্র দেব বিধবা-বিবাহের সপক্ষে প্রবন্ধ পড়েছিলেন, বিদ্যাসাগর কলম ধরার এক দশক আগে। তবে তার বেশী তাঁরা কিছু করে উঠতে পারেন নি।

'ইয়ং বেঙ্গল' সম্বন্ধে আমাদের সামগ্রিক মূল্যায়ন তাহলে কি ধরণের হবে? খ্যাতিমান বাঙালী সমাজবিজ্ঞানী নির্মলকুমার বসু বলেছেন: "ইয়ং বেঙ্গলের দুই উপাস্য দেবতা ছিলেন, স্বাধীনতা ও যুক্তিবাদ।"১৮ সন্দেহ নেই, কিন্তু ইয়ং বেঙ্গলের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে তিনি যেন কিছুটা একদেশদর্শিতা দেখিয়েছেন। সেদিক থেকে অধ্যাপক সুশোভন সরকার তাঁর প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ "ডিরোজিও অ্যাণ্ড ইয়ং বেঙ্গল"-এ মনে হয় অনেক যথাযথ মূল্যায়ন করেছেন। তাঁরই উদ্ধৃতি দিয়ে তাই এ প্রবন্ধ শেষ করছি:

"ইয়ং বেঙ্গলের বহু সংস্কার সীমাবদ্ধতা তাঁদের একার নয়, আমাদের সমগ্র নবজাগরণেরই সীমাবদ্ধতা। উনিশ শতকের শিক্ষিত সমাজ বিদেশী ইংরেজ শাসকদের ভারতের বুকে শোষণকারী ভূমিকাটি বুঝতে পারেন নি, তাঁদের চোখ ছিল তাৎক্ষণিক লাভগুলির দিকে; দেশের মানুষদের সঙ্গে নবজাগরণের হোতাদের প্রায় কোনও সংযোগ ছিল না বললেই চলে। প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্যের গরিমা নিয়ে আচ্ছন্ন থাকায় মুসলিম দেশবাসীর সঙ্গে তাঁদের একটা দূরত্বের প্রাচীর ছিল। আমাদের নবজাগরণের ঐতিহ্যের এইসব দুর্বলতার ফলে আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রগতির পথে গুরুতর বাধা সৃষ্টি হয়েছিল।"১৯

---

১। ক্যালেইডোস্কোপ, কলকাতা, ১ আগষ্ট ১৮২৯ (ব্রিটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত)।

২। লালবিহারী দে: রিকলেকশন্‌স্ অফ আলেকজাণ্ডার ডাফ, লণ্ডন, ১৮৭৯।

৩। এশিয়াটিক জার্নাল, কলকাতা, ৩য় খন্ড, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৩০, পৃঃ ৫।

৪। ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল, ফেব্রুয়ারী, ১৮৩১।

৫। ক্যালেইডোস্কোপ, ২ সেপ্টেম্বর, ১৮২৯।

৬। বেঙ্গল হরকরা, ক্রোড়পত্র, কলকাতা, ৬ জানুয়ারী, ১৮৩৫।

৭। ক্যালকাটা লিটারেরি গেজেট, ৬ জুন, ১৮৩৫।

৮। রিফর্মার, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭ পুনরুদ্ধৃত আলেকজান্ডার'স ইষ্ট ইন্ডিয়া অ্যাণ্ড কলোনিয়াল ম্যাগাজিন, লন্ডন, জুলাই-ডিসেম্বর ১৮৩৮, পৃঃ ৩৮ ৩৯।

৯। সম্বাদ কৌমুদী, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারী, ১৮৩৩, পুনরুদ্ধৃত রিফর্মার, ৭ ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৩।

১০। ক্যালকাটা ম্যাগাজিন, ১৮৩৩, পৃঃ ১৭৬।

১১। সিলেকসন অফ ডিসকোর্সে'স ডেলিভারড এ্যাট দি মিটিংস অফ দি সোসাইটি ফর দি অ্যাকুইজিসন অফ জেনারেল নলেজ, প্রথম খন্ড, কলকাতা, ১৮৪০, মুখবন্ধ পুনঃমুদ্রিত ঃ গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ) অ্যাওয়েকনিং ইন বেঙ্গল, কলকাতা, ১৯৬৫।

১২। ঐ।

১৩। ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল, নভেম্বর, ১৮৪১।

১৪। ঐ।

১৫। বেংগল স্পেক্টেটর, কলকাতা, ১, ৮, ১৫ ও ২৪ মার্চ, ১৮৪৩।

১৬। বেংগল স্পেক্টেটর ২৫ এপ্রিল, ১৮৪৩।

১৭। ঐ, ১৭ মে ১৮৪৩।

১৮। এন, কে, বসু ঃ মডার্ন বেংগল, কলকাতা ১৯৫৯, পৃঃ ৪৭।

১৯। সুশোভন সরকার ঃ বেংগল রেনেসাঁস অ্যাণ্ড আদার এসেজ, নয়াদিল্লী, ১৯৭০, পৃঃ ১২১।

# ডিরোজিওর জন্মসন: একটি বিতর্কের অবসান

রমাপ্রসাদ দে

---

টমাস এডোযার্ড'স উনিশ শতকেব পটভূমিকায ডিবোজিওব কৃতি ও কৃতিত্বেব মূল্যাযন কবেন ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁব Henry Derozio আজও দ্বিতীয-বহিত উৎসগ্রন্থ। তিনটি তাবিখেব ভ্রান্তি ছিল তাঁব বইতে। ডিবোজিওব জন্ম, মৃত্যু ও হিন্দুকলেজে যোগদানেব তাবিখ। বলা বাহুল্য প্রথম জীবনীগ্রন্থ হিসেবে এ ধবণেব ভ্রান্তি অস্বাভাবিক নয। এডোযার্ডসেব মতেঃ

ডিবোজিওব জন্মঃ ১০ এপ্রিল ১৮০৯
হিন্দু কলেজে নিযুক্তিঃ ১৮২৮
এবং মৃত্যুঃ ২৩ ডিসেম্বব ১৮৩১

১৯০৩-এ শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁব বিখ্যাত বই 'বামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজে' লেখেনঃ

'ডিবোজিও তিন বৎসব মাত্র হিন্দুকালেজে ছিলেন।' বোঝা যায, এ বিবৃতি এডোযার্ডসেব ভ্রান্তির প্রতিধ্বনি। ১৮০৫-এ প্রকাশিত হল

Henry Derozio the Eurasian Poet and Reformer। বইটিতে ইলিয়ট ওয়ালটার ম্যাজ উল্লিখিত তিনটি ভ্রান্তির সংশোধন করে লিখলেন :

ডিরোজিওর জন্ম : ১৮ এপ্রিল ১৮০৯
হিন্দু কলেজে নিযুক্তি : ১৮২৬
এবং মৃত্যু : ২৬ ডিসেম্বর ১৮৩১

ডিরোজিওর হিন্দুকলেজে যোগদানের সন হিসেবে ১৮২৬-এর সমর্থন পাওয়া যায় ১৩ মে ১৮২৬-এর সমাচার দর্পণে :

"ইংরাজী পাঠশালায় ডিনরম্যান নামক একজন গোরা আর ডি রোজী সাহেব এই দুই নূতন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন।"

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত ওবিচুয়ারি নোটিশ থেকে জানা যায় মৃত্যু তারিখ :

"ড্রোজু সাহেবের মরণ। আমরা খেদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি গত ২৬ ডিসেম্বর সোমবার বেলা দশ ঘণ্টাতীত সময়ে ড্রোজু সাহেবের মরণ হইয়াছে। ইহাতে আমরা দুঃখিত হইয়াছি যেহেতুক (পৃঃ ৩২)।..."

আর ম্যাজ ডিরোজিওর জন্ম তারিখের সন্ধান জেনেছিলেন বর্তমানে অপ্রাপ্য Vide Bengal Directory for 1810 (list of birth during previous year) পুঁথিটিতে। সুতরাং তিনটি তারিখ সম্পর্কেই ম্যাজের সংশোধন সন্তোষজনক বলা যায়। তবু দেখা গেল ম্যাজ তাঁর পরবর্তী আলোচকদের প্রভাবিত করতে পারলেন না। এডোয়ার্ডসের ভুলগুলোই স্থায়িত্ব পেল। ম্যাজের গ্রন্থ প্রকাশের ১২ বছর পরে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ ডিরোজিও শিষ্য দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের জীবনীগ্রন্থ লেখেন। বইটিতে 'ডিরোজিওর বিচিত্র শিক্ষাপ্রণালী ও প্রভাব' শীর্ষক আলোচনায় তিনি লিখেছেন—

"মিষ্টার টমাস এডওয়ার্ডস্ ও মদীয় পরলোকগত বন্ধু মিস্টার ই. ডব্লিউ ম্যাজ ডিরোজিওর এক একখানি সুন্দর জীবনচরিত প্রকাশ করিয়াছেন...।" (পৃঃ ১৩)

ম্যাজের রচনার সঙ্গে লেখক পরিচিত ছিলেন সেটা তাঁর কথা থেকেই বোঝা যায়। অথচ সেই লেখকই যখন ডিরোজিওর মৃত্যু সম্পর্কে বলেন—

"১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে ডিসেম্বর দিবসে ২৩ বৎসর বয়সে ওলাউঠা রোগে এই অসাধারণ য়ুরেশীয় মনীষী পরলোকগমন করেন।" (পৃঃ ২২)

-তখন বোঝা যায় পরলোকগত বন্ধু ম্যাজ তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেন নি। এডোয়ার্ডসই এঁর কাছে অনন্য মনে হয়েছে। এমন কি একালের বিনয় ঘোষ তাঁর 'বিদ্রোহী ডিরোজিও' গ্রন্থের ১৯৮০-র সংস্করণেও এডোয়ার্ডসের অনুস্মৃতির স্বাক্ষর মুছে ফেলতে পারেন নি। ডিরোজিওর মৃত্যুদিন সম্পর্কে বিনয় ঘোষ লিখছেন—

"১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে (২৬ ডিসেম্বর, সোমবার) তাঁর মৃত্যু হয়, বাইশ বছর বয়সে।" (পৃঃ ২১)

আবার এই গ্রন্থেই অন্যত্র লিখছেন—

"১৮৩১, ২৩ ডিসেম্বর কয়েকদিনের অসুখে ডিরোজিওর মৃত্যু হয়। এঁর বয়স তখন বাইশ বছর আট মাস।" (পৃঃ ১২৪)

ডিরোজিওর জন্ম তারিখ সম্পর্কে বিনয় ঘোষ লিখেছেন—

"একটি পোর্তুগীজ ফিরিঙ্গি পরিবারে ডিরোজিও জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১০ এপ্রিল (অথবা ১৮ এপ্রিল) ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে।" (পৃঃ ২১)

দেখা যাচ্ছে বিনয় ঘোষ মনস্থির করতে পারেন নি। কখনও এডোয়ার্ডস কখনও ম্যাজের সিদ্ধান্তের দিকে ঝুঁকেছেন। ফলে একই বইতে জন্মদিন অথবা মৃত্যুদিনের দুরকম তারিখ তুলে ধরেছেন।

অবশ্য ডিরোজিওর জন্মসন যে ১৮০৯—এ বিষয়ে এই লেখকদের মধ্যে কোন দ্বিমত ছিল না। সমীপসময়ে সেই জন্মসনকেও বিচলিত করলেন কলকাতা পুরসভা। পার্ক স্ট্রীট সমাধিভূমির পাশ দিয়ে যেতে যেতে একজন পথিক এখন পড়বেন :

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও
(১৮০৮—১৮৩১)

এখানে শায়িত আছেন সেই অনন্য মানবতা ডিরোজিও
সোক্রাতেসের মত যাঁর পাশে সমবেত হয়েছিল এ

দেশের অগ্রণী যৌবন যাদের জাগ্রত চেতনা, অগ্রসর
লেখনী সূচিত করেছিল যুক্তিনিষ্ঠ কুসংস্কার বিরোধী
প্রবল প্রাণ নবযুগের।

২৬শে ডিসেম্বর ১৯৮১

কলকাতা পুরসভা

উৎকীর্ণ বাক্যের পদবিন্যাস বিশ শতকের বাংলা গদ্যের নিদর্শন ভাবতে কষ্ট হয়। তবে আমাদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু ঐ বন্ধনী নির্দেশিত সংখ্যা যা থেকে আমরা জানতে পারি ডিরোজিওর জীবনকাল, জানতে পারি ডিরোজিও জন্মেছিলেন ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে।

সত্যি কি ডিরোজিও জন্মেছিলেন ১৮০৮-এ? ডিরোজিওর যাঁরা আদি জীবনীকার তাঁরা তো জানিয়েছেন—১৮০৯। তবু কেন কলকাতা পুরসভা ডিরোজিওর বয়স এক বছর বাড়িয়ে দিয়ে একটি বিতর্কের সূত্রপাত করলেন?

যতদূর জানা যায়, এই বিতর্কের জনক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। ২৮।৪।১৯৭৮ তারিখে 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে দেখছি: ১৮ এপ্রিল, ১৯৭৮ কলকাতায় দক্ষিণ পার্ক স্ট্রীটের সমাধিক্ষেত্রে এক বৃষ্টিভেজা বিকেলে ডিরোজিওর ১৭০তম জন্মদিবসে প্রধান অতিথি ডঃ মজুমদার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ করা হয়। তিনি ডিরোজিওর জন্মতারিখ সম্পর্কে সঠিক ঐতিহাসিক তথ্য দেন...।' ঐ সঠিক ঐতিহাসিক তথ্য কী, প্রতিবেদনে তার উল্লেখ নেই, কিন্তু অনুমান করা যায় আমাদের রেখাঙ্কিত ১৭০-সংখ্যা থেকে। অর্থাৎ ডিরোজিওর জন্মসন ১৮০৮ ধরলেই ১৯৭৮-এ ১৭০-তম জন্মদিবস পালন সম্ভব। আমাদের এ ধারণা আরও স্পষ্ট হয় যখন ডঃ মজুমদারের Renascent India গ্রন্থের ২৫২ পৃষ্ঠা খুলে বসি। এখানে লেখা আছে—

**......One day while casually going through the Selections from Calcutta Gazette, 1824-1832, my eyes fell upon the following obituary notice P. 700, Monday evening, December 26, 1831.**

At Calcutta, on the Death, 26th December, Henry Louis Vivian Derozio, Esq. age 23 yrs. 8 months and 8 days.

It is impossible to deny the authenticity of this statement recorded within a few hours of his death and the exact specification of the years, months and days of his life leave no-doubt that the writer had access to his family records. It would thus appear that Derozio died on 26th and not 23rd December and was born in 1808 and not 1809, on 18 April and not on 10 April or any other date as suggested by various writers.

সম্প্রতি আরও একটি পত্রিকায় হুবহু ঐ একই বয়ানে ডিরোজিওর মৃত্যুখবর আমার নজরে এসেছে। ডিরোজিওর মৃত্যুদিনে সন্ধ্যায় প্রকাশিত দি গভর্নমেন্ট গেজেটেও ( No. 1060 Vol. XVII ) খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল। ক্যালকাটা গেজেট কিংবা গভর্নমেন্ট গেজেটে উল্লিখিত বয়স ২৩ বছর ৮ মাস ৮ দিন অর্থাৎ যে বয়সকে আমরা বলি ২৪ বছর। অথচ ডিরোজিওর বয়স সম্পর্কে ম্যাজ লিখেছেন : Destined to end his career when others are but begining theirs, he wanted some four months to complete twenty-three years.' ম্যাজের উক্তি পরিষ্কার সাক্ষ্য দিচ্ছে ডিরোজিও তাঁর জীবনের ২৩ বছর পূর্ণ করতে পারেন নি। প্রাসঙ্গিক একটি গল্পকথাও তুলে ধরেছেন তিনি : "In this connection an interesting anecdote was related to me by an Indian Gentleman. On one of Derozio's pupils introducing him to a Sunnyasee the latter is said to have remarked to the pupil : 'I am sorry your teacher will not remain much longer with us. I don't know his name, but one thing I can tell you—he will not live more than there are letters in his name.' The sum of the letters comprising 'Henry Louis Vivian Derozio' makes up twenty-three and Derozio died in his twenty-third year." ডিরোজিওর বয়স ২৩ বছর ছাড়িয়ে গেলে ম্যাজ নিশ্চিত এই গল্পটির অবতারণা করতেন না। ডঃ রমেশচন্দ্রের কলমে অবশ্য এ গল্প দ্বিধার মতো ভর করে নি। তিনি

দৃঢ়প্রত্যয় ঃ 'It is impossible to deny the authenticity of this statement recorded within a few hours of his death.'

তবু কারও কারও মনে ঘনায় সন্দেহের ছায়া। পুরসভারই একটি পত্রিকা 'কলকাতা পুরশ্রী'তে এ নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক চলে। সে বিতর্কের বাদ ও প্রতিবাদের সার-সংকলন করেছেন পুরশ্রী-সম্পাদক সমরেশ চট্টোপাধ্যায় ঃ "হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর ১৫০-তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে গত ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৮১ কলকাতা পৌরসংস্থা ১৫৫নং জগদীশ বসু রোডে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি স্মারক প্রস্তরফলক উন্মোচন করে। ঐ প্রস্তর ফলকে ডিরোজিওর জন্মসন উৎকীর্ণ হয়েছে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দ। প্রখ্যাত গবেষক রাধারমণ মিত্র মহাশয় উৎকীর্ণ তারিখ সম্পর্কে তাঁর মৌখিক আপত্তি জানান। কিন্তু, এ বিষয়ে তিনি কোন লিখিত তথ্যের সন্ধান দেন নি। ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৮১ তারিখের 'কলকাতা পুরশ্রী'তে প্রকাশিত 'চেতনার অগ্রদূত ঃ হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও' প্রবন্ধে শ্রী দেবাশিস বসু লেখেন ডিরোজিওর জন্ম তারিখ ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ এপ্রিল। অধ্যাপিকা শ্রীমতী জয়শ্রী চক্রবর্তী 'কলকাতা পুরশ্রী', ২৪শে এপ্রিল ১৯৮২তে প্রকাশিত একটি চিঠিতে উল্লেখ করেন ডিরোজিওর জন্ম-তারিখ ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ এপ্রিল, প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দ সঠিক নয়। ঐ চিঠির নীচে সম্পাদকীয় মন্তব্যে জানান হয় বিষয়টি পৌর-সংস্থার গোচরে এসেছে এবং যথাযথ অনুসন্ধানের পর উপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হবে। এরপর ২৮শে আগষ্ট, ১৯৮২ পুরশ্রীতে প্রকাশিত একটি চিঠিতে শ্রী পীযূষকান্তি রায় কয়েকটি তথ্যসূত্র বিশ্লেষণ করে দেখান যে শ্রীমতী চক্রবর্তীর ধারণা সঠিক নয় এবং পৌর-সংস্থার প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ জন্মসনই সঠিক। প্রতিবাদে ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৮২-র সংখ্যায় তাঁর চিঠিতে শ্রী দেবাশিস বসু শ্রী রায়ের তথ্যাদি যে ভ্রান্ত তা প্রমাণ করার জন্য অন্যান্য তথ্যের অবতারণা করেন।" শ্রী রায় অতঃপর 'ডিরোজিওর জন্মতারিখ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে (কলকাতা পুরশ্রী, ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৮২) তাঁর মত পরিবর্তন করেন এবং St. John Church-এর নথিপত্র থেকে দেখান ডিরোজিওর জন্মসন ১৮০৯-ই সঠিক। এই প্রবন্ধ এবং প্রাগুক্ত বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পেলাম কলকাতা পৌর-সংস্থার তথ্য ও গণসংযোগ

Extract from the Register Books of Saint John's, Calcutta, within the Diocese of Calcutta

# Baptism solemnized at St. John's Church (Old Cathedral), Calcutta, A.D.

| When Baptised. | Said to be Born. | Child's Christian Name | Sex. | Parent's Name: Christian | Parent's Name: Surname. | Abode. | Quality, Trade or Profession. | By whom the Ceremony was performed. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1809 August ~~Seventeenth~~ Twelfth (12th) | 1809 April Eighteenth (18th) | Henry Louis Vivian | Male | Mr Francis<br>Mrs Sophia | DeRozario<br>Rozario | no record | no record | The Revd James Ward DD Junior Chaplain at the Residency of Fort William |



I, Revd V.E. Varghese, (Acting) Chaplain of the Parish Church of Saint John (Old Cathedral) Calcutta, do certify the foregoing to be a true copy of an Entry in the Register-Book of Baptism kept at the aforesaid Church of Saint John. Witness my hand this fourth day of December in the year of our LORD One Thousand Nine Hundred Eighty two

for Senior Chaplain of St. John's, Calcutta.

ডিরোজিওর জন্মতারিখ : গির্জার প্রমাণ

অধিকার কর্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞাপন : '……ডিরোজিওর জন্মসন ১৮০৮-এর পরিবর্তে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া চিহ্নিত করিবার প্রস্তাব করা হইতেছে। এই প্রস্তাবে যদি কোন ব্যক্তি বা সংস্থার কোন-রকম আপত্তি থাকে, তবে যথাযথ প্রমাণ সহকারে তাঁর বা তাঁদের বক্তব্য ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের মধ্যে পুরাধ্যক্ষের নিকট পেশ করিবার জন্য অনুরোধ জানানো হইতেছে।' সত্যের সন্ধানে একটি পত্রিকার প্রশংসনীয় উদ্যমের ফলশ্রুতি এই বিজ্ঞাপন। ডিরোজিও-চর্চায় এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

আবারও ইলিয়ট ওয়ালটার ম্যাজের শরণ নেয়া যাক। ম্যাজ লিখছেন, 'Henry Derozio was baptized in St. John's (Old Cathedral) on August 12, 1809, by the Rev. James Ward, D. D., the chaplain who at the same font on January 3, 1812, baptized William Makepeace Thackery. This little circumstance has never been pointed out before. —এই তথ্যের সূত্র ধরে শ্রীপীযূষকান্তি রায় উপস্থিত হন উল্লিখিত গির্জায়। বার বার চেষ্টা করে অবশেষে পেলেন একটি পঞ্জী যার শুরু ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের দীক্ষিতদের নামমালা দিয়ে। 'এ রোমাঞ্চকর নথীপঞ্জীটি খুঁজে একটি পাতায় পাওয়া গেল দুর্লভ সে তথ্যের সন্ধান' যাতে প্রমাণ হয় ডিরোজিও জন্মেছিলেন ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ এপ্রিল। তবু কিছু সন্দেহের অবকাশ থেকে গেল। পঞ্জীটিতে একই হাতের লেখা এবং একই কালি। কাগজ শক্ত, অবিকৃত। 'প্রায় দুশ বছরের ব্যবধানেও কাগজ এত শক্ত ও অবিকৃত থাকা সম্ভব নয়।' প্রবন্ধলেখক নিজেই সন্দেহ করছেন, 'তবে কি মূল নথী থেকে নকল করে প্রতিলিপি করা হয়েছে!' অর্থাৎ প্রামাণিক বলতে যা বোঝায় তার কাছাকাছি পেঁছেও একটি দ্বিধার সামনে দাঁড়াতে হল আমাদের।

সন্দেহাতীত একটা কিছু প্রমাণ কি পাওয়া যায় না? মনের মধ্যে অতৃপ্তি পীড়া দিচ্ছিল আমাকেও। এমন সময় একদিন যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র মৈত্রের কাছে গেলাম। উনিশ শতক সম্পর্কে কথা বললেন তিনি প্রত্যক্ষদর্শীর মতো, যেন এই মাত্র অতীত থেকে ঘুরে এলেন। কোন্ ঘটনা কবে ঘটল, তারপর দিন কাগজে কী লেখা হল, কোন্ পত্রলেখক তার প্রতিবাদ করলেন—এইসব অনুপুঙ্খ

কত সহজে বলে গেলেন। তারপর থেকে ঘন ঘন তাঁর সান্নিধ্যে এলাম। তাঁর সান্নিধ্য আমার উজ্জ্বল উপার্জন। ডিরোজিওব সঠিক জন্মসন সম্পর্কে এক সন্ধানসূত্র তিনিই আমার হাতে তুলে দিলেন। সকৃতজ্ঞ আমি অনুসন্ধান শুরু করলাম। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ একদিন ১৭৪ বছর আগেকার ক্যালকাটা গেজেটের বিবর্ণ পাতায় পেলাম ডিরোজিওব জন্মসংক্রান্ত announcementটি; যেন একটা শিহরণ খেলে গেল আমাব শরীরে, কীটসের কবিতায় কথিত বিজ্ঞানীর দৃষ্টিপথে নতুন নক্ষত্র যেন আমাকে ছুঁয়ে গেল !

বৃহস্পতিবার, ২৭শে এপ্রিল, ১৮০৯-এব ক্যালকাটা গেজেটেব ( Vol. LI No. 1313 ) আট পৃষ্ঠাব শেষ প্রান্তে বিবাহ-জন্ম-মৃত্যুব যে তালিকা আছে তাতে মালিকার মতো আদরেব একটি লাইন—On the 18th Instant Mrs. Francis Derozio, of a son। সম্পূর্ণ প্রমাণচিত্রটিই উপস্থিত করি :

## MARRIAGES.

On Sunday the 16th instant, at Serampore, Captain Rodom, of the Danish Service, to Miss Rauly; daughter of Monsr. Rauly, Commissary for the exchange of Spanish Prisoners.

On the 17th instant, Mr. Richard Pauling, to Miss Ann Lennox.

At Chandernagore, on the 20th instant, by the Rev. N. Forsyth, Mr. Joseph Strausenberg, to Mrs. Elizabeth Vanos, relict of the late Mr. Garritt Vanos.

## BIRTHS.

On the 10th inst. at Dacca, the Lady of Lieutenant Wilkie, of a Son.

On the 16th Ult. at Madras, Lady Barlow, of a Daughter.

At Berhampore on the 7th instant, the Lady of Brigade Major Sharp, of a Daughter.

On the 18th Instant, Mrs. Francis Derozio, of a Son.

## DEATHS

On Wednesday the 19th Instant, at Saulkeah, Mr. Arratoon Moratcan.

Mr. R.

প্রসঙ্গত একটি কথা, ডিরোজিওর পৈত্রিক উপাধি কি ছিল ডিরোজারিও? এডোয়ার্ডস অবশ্য তাই মনে করেন। গির্জার প্রমাণেও তা সমর্থিত হচ্ছে। তাই পীযূষকান্তি লেখেন, 'নিশ্চিত যে পরের পুরুষে ছেলে-মেয়েরা পদবী পরিবর্তন করে হন ডিরোজিও'। কিন্তু এ মত আমি মেনে নিতে পারি না। কারণ আমার উপস্থাপিত প্রমাণে পৈত্রিক উপাধি স্পষ্টত ছাপা দেখছি—ডিরোজিও।

শ্রদ্ধেয় সুরেশচন্দ্র মৈত্রের সৌজন্যে এই সর্বশেষ ও সর্বোত্তম প্রমাণ আমাদের হাতে আসার সাথে সাথে একটি বিতর্কের উপর যবনিকাপাত হল। ডিরোজিওর জন্মসন হিসেবে ১৮০৮ যে ভ্রান্ত এবং ১৮০৯ অভ্রান্ত—এ নিয়ে আর তর্ক চলবে না। 'তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়' ডিরোজিওর সঠিক জন্মসনের প্রমাণ এখন আমাদের হাতেই!

I feel I have not lived in vain.

—Derozio

# পরিশিষ্ট

## ডিরোজিও : একটি মূল্যায়ন

ডিরোজিওর মৃত্যুর তিন দিন পরে ২৯ ডিসেম্বর ১৮৩১-এর 'দি গভর্নমেণ্ট গেজেট' কবিকে জানিয়েছিল উষ্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলি। পুরনো পত্রিকা থেকে আমরা সম্পূর্ণ আলোচনাটি উদ্ধৃত করলাম।

There are, we feel assured, many of our readers who share our feelings of sincere concern at the premature death of Henry Derozio. When we look back, but a few brief years, and remember the intelligent and animated East Indian boy that gave such indubitable promise of something more than common-place talent ;--when we reflect on the formidable disadvantages he had to contend with, and the elasticity and success with which he bore up against them, even so as to "make for himself a name," our regret for departed genius is mingled with admiration at its buoyant energy. Destined to terminate his short career, when others are but commencing theirs ; he, nevertheless, lived long enough to acquire a reputation that is not likely to perish, and that is honourably associated with the literature, and the moral, social and political improvement of his countrymen.

The works of Mr. Derozio are familiar, we believe, to most of our readers. He began to write poetical effusions at the age of fourteen or fifteen, and most of these, as they were written, were originally published in India Gazette. They evinced a vigour of thought, an originality of conception, a play of fancy, and a delicacy of tone, which occasioned the more surprise when the reader came to know that the author was an East Indian boy, whose peregrinations had never extended beyond the limits of Bengal ; and whose *Alma Mater* had been a Calcutta School. At length, in 1827—he published a volume of poems, which attracted even the notice and excited the applause of a portion of the London Press. Ever since, his name has been before the public,

either as a contributor to various literary works, or the able and independent Editor of a Newspaper. Of a deligent and active turn, he was not a youth that could sit down content to eat the bread of idleness; nor had he any false fastidiousness as to the sphere in which he could usefully exert his talents, provided the opportunity for their beneficial exercise offered itself. Accordingly, our youthful poet became a teacher in the Hindoo College. It certainly, one would imagine, was not the situation a young and ardent mind like his would choose, had he a variety of choice. This, however, he had not—and he accordingly entered with alacrity and zeal upon his new duties.

Mr. Derozio's next publication was "the Fakeer of Jungheera'--a work that gave still further proofs of genius, and evinced an extraordinary command of language, and an acute perception of the beauties of Nature, and those idealities which form for the poet a world of his own. Of felicity in the thought, no less than the expression of that sympathy which the poetic mind holds with the world visible and invisible, some verses entitled "a walk by moonlight"—published two or three weeks before his death, furnish an example—for instance :

The moon stood silient in the sky,
And looked upon our earth ;
The clouds divided, passing by,
In homage to her worth.

There was a dance among the leaves
Rejoicing at her power,
Who robes for them of silver weaves
Within one mystic hour.

There was a song among the winds,
Hymning her influence—
That low-breathed ministrelsy which binds
The soul to thought intense.

How vague are all the mysteries
Which bind us to our earth ;
How far they send into the heart,
Their tones of holy mirth ;

How lovely are the phantoms dim
Which bless that better sight,
That man enjoys when proud he stands
In his own spirit's light ,

When, like a thing that is not ours,
This earthliness goes by,
And we *behold* the spiritualness
Of all that cannot die.

'Tis then we understand the voice
Which in the night-wind sings,
And feel the mystic melody
Played on the forest's strings, & etc.

That the interest which he took in the progress of his pupils, was as deep as it was generous and independent of all selfish motives, is sufficiently evident were there no other proof of it than the beautiful Sonnet addressed to the students at the Hindoo College, which he published in the Bengal Annual for 1831*—and which we cannot resist the temptation of giving again here.

Expanding like the petals of young flowers
I watch the gentle opening of your minds,
And the sweet loosening of the spell that binds
Your intellectual energies and powers,
That stretch ( like young birds in soft summer hours )
Their wings, to try their strength. O, how the winds
Of circumstances, and freshening April showers

*কবিতাটি এর আগে ক্যালেইডোস্কোপ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে। —স.

Of early knowledge, and unnumbered kinds
Of new perceptions shed their influence ;
And how you worship truth's omnipotence.
What joyance rains upon me, when I see
Fame in the mirror of futurity,
Weaving the chaplets you have yet to gain,
Ah then I feel I have not lived in vain.

In the course of time, however, circumstances impelled Mr. Derozio to resign the situation he had at the Hindoo College. Thus thrown upon his energies at a juncture when they were most needed—he soon struck out a new path for their exertion, by the establishment of the "East Indian" Newspaper, which, whatever other difference of opinion might exist among his contemporaries, as to the mode of conduting it--there could be none whatever as to the talents, the perfect honesty, and the unfettered views of the editor. The labour of conducting a daily paper in India must be obvious. Elastic and buoyant as was the character of Henry Derozio's mind, it could scarcely be expected, that the constant tension of his faculties, caused by his responsible connection with a daily paper of peculiar views, and the organ of a class ; no less than his anxiety on other points, not necessary to be delated on here, and perhaps disappointment of some of those hopes to which the aspiring child of genius is more especially subject : it is, we say, scarcely surprising that these should have affected his frame to a degree that he, himself probably was not aware of. To these may also be added a feeling of mortification at having been misconceived in his views, even when his intentions were the most single-hearted and devoted to what he considered the right. Youth and the consciousness of elastic and original powers of mind are apt to lead their possessor into some imprudence, and that he should have had his share of the rashness and impetuosity of both united, was

but natural. Now that he lies low, however, his friends may aver with pride, that if his speculations were not always conclusive, or his inferences always legitimately formed;—his moral character was irreproachable; his devotion to the spirit of what he deemed truth, even romantically uncompromising; his intensions unquestionably good and his conduct as a son, a brother, a friend, and a member of that Society, which it was his dearest wish to elevate and to improve—such as to reflect credit on his memory—and to make his death lamented by an extensive circle of friends and acquaintances.

No further seek his merits to disclose
Or draw his frailties from their drear abode,
There they alike in trembling hope repose
The bosom of his father and his God.

We cannot, perhaps, conclude these hastily written remarks better than by recalling to the reader's recollection those exquisite lines which the lamented author wrote in imitation of Lord Byron's celebrated opening ones to the "Bride of Abydos"—and which now are fraught with solemn reflections.

Know ye the land where the fountain is springing
Whose waters give life, and whose flow never ends;
Where cherub and seraph, in concert, are singing
The hymn that in odour and incense ascends?
Know ye the land where the sun cannot shine,
Where his light would be darken'd by glory divine;
Where the fields are all fair, and the flowret's young bloom
Never fades, while with sweetness each breath they perfume.
Where sighs are ne'er heard, and where tears are ne'er shed
From hearts that might elsewhere have broken, and bled:
Where grief is unfelt, where its name is unknown,
Where the music of gladness is heard in each tone,
Where melody vibrates from harps of pure gold,

Far brighter than mortal's weak eye can behold ;
Where the harpers are robed in a mantle of light,
More dazzling than diamonds, than silver more white ;
Where rays from a rainbow of emerald beam,
Where truth is no name, and where bliss is no dream ?—
'Tis the seat of our God !' 'tis the land of the the blest—
The kingdom of glory—the region of rest—
The boon that to man shall hereafter be given—
'Tis Love's hallowed empire—' tis Heaven ! 'tis Heaven !

Supplement to
The Government Gazette
Calcutta :—Thursday, December 29, 1831

## দুটি বিজ্ঞাপন

ডিরোজিওর স্মৃতিকথা রচনায় দেশবাসীর সহযোগিতা যাচ্ঞা করে কাগজে একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন প্রিয় বোন অ্যামেলিয়া। বিজ্ঞাপনটি ৩০ ডিসেম্বর ১৮৩১-এর ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত হয়ঃ—

"Encouraged by my friends and most of the East Indian community to publish the memoir of my late brother, Henry Louis Vivian Derozio, I bring myself befoie the public and solicit their patronage to the Above work.

AMELIA DEROZIO

দুঃখের বিষয়, এ স্মৃতিকথা দিনের মুখ দেখেনি। গভীরতর দুর্ভাগ্য ছায়া ফেলছিল মা ও বোনের ওপর। কয়েকদিন বাদেই ঐ একই কাগজে প্রকাশিত হল আর একটি বিজ্ঞাপনঃ—

'Private Tuition, Circular Road, Calcutta. In consequence of the lamented and untimely death of her son Henry, Mrs. Derozio thus early publishes her intentions without delay. She purposes receiving under her roof a few young ladies and instructing them in the following branches :— English and French, Reading and Writing, Geography, History, Arithmetic, the Elements of Mathematics, and Physical Science, Needlework and Domestic Economy. As Mrs. Derozio has enjoyed the benefit of the best Education in England, and as she will be assisted in the duties of teaching by a very competent individual, she hopes to afford every satisfaction to the parents and guardians of the children entrusted to her care. Being also anxious to give the female education a higher character than it has hitherto possessed in India, it will be her aim to realize that object to the best of her ability. Every possible attention will be paid to the health and morals of the young ladies. Music, dancing, and drawing at the usual charges.'

## প্রথম জাতীয় সঙ্গীত

মৃন্ময়ী নয়, চিন্ময়ী মূর্তিতে দেশকে দেখেছিলেন ডিরোজিও। তাঁর To India—My Native Land সনেট ভারতের প্রথম জাতীয় সঙ্গীত অভিধায় চিহ্নিত। সনেটটির একটি অনুবাদ করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাম্প্রতিক কালে আরও দুটি অনুবাদ আমাদের হাতে এসেছে। মূল সহ তিনটি অনুবাদই আমরা এখানে উদ্ধৃত করলাম।

### TO INDIA -MY NATIVE LAND

My Country! in thy day of glory past
A beautious halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast.
Where is that glory, where that reverence now?
Thy eagle pinion is chained at last
And grovelling in the lowly dust art thou:
Thy minstrel hath no wreath to weave for thee
Save the sad story of thy misery!
Well—let me dive into the depths of time,
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime,
Which human eye may never more behold;
And let the guerdon of my labour be
My fallen country! One Kind wish from thee!

"স্বদেশ আমার! কিবা জ্যোতির মণ্ডলী!
ভূষিত ললাট তব; অস্তে গেছে চলি
সেদিন তোমার; হায় সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে!

কোথায় সে বন্দ্যপদ ! মহিমা কোথায় !
গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায় ।
বন্দীগণ বিরচিত গীত উপহার
দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর ?
দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন
অন্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন
কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ
আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ ।
এ শ্রমের এইমাত্র পুরস্কার গণি,
তব শুভবাদ লোকে, অভাগা জননী !”

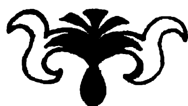
অনুবাদঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

“দূর অতীতের স্বর্ণপ্রহরে ঘিরেছিল মুখ বলয়রশ্মি
ভারত আমার ! গরীয়সী দেশ, ছিলে যে সেদিন দেবীরই মতো !
ঈগলের পাখা শৃঙ্খলে বাঁধা সে পড়ে রয়েছে পিছে সবার ঃ
ব্যথাটুকু ছাড়া চারণের কাছে নেই আর কোনো উপকরণ
গাঁথবার মতো কাহিনীরা সব হারিয়ে গিয়েছে ইতস্তত,
ধূলার গভীরে ডুবেছ ভারত, কালের ভূমিতে সমাধিলীন
আমাকেও সেই কালের ধূলায় ঝাঁপ দিতে দাও একটিবার,
খুঁজে নিয়ে আসি হারানো দিনের ভাঙা-চোরা কিছু নিদর্শন
চোখের সামনে নেই তারা আজ ঘুমায় নিবিড় সে সব সৃষ্টি
এই শ্রমটুকু দিয়ে বিনিময়ে অনভীপ্সিত মূল্যপ্রাপ্তি
তোমার মুখের আশীর্বচন, সেই শুধু হোক পুরস্কার ।।”

[ অনুবাদ ঃ পল্লব সেনগুপ্ত ]

"অতীত উজ্জ্বল দিনে স্বদেশ আমার
তোমার ললাটে ছিল জ্যোতির বলয়,
এবং পূজিত ছিলে মূর্তি প্রতিমার
কোথায় সে সগৌরব শ্রদ্ধার সঞ্চয় ?
তোমার ঈগল ডানা শৃঙ্খলের ভার
দীনতম পড়ে আছো করুণ মৃন্ময়
বন্দীরা গাঁথে না ফুল গানের মালায়
শুধু ব্যথা বুকে বাজে তোমার কথায় !
ভালো, তবে ডুব দিই সময়ে গভীর
তুলে আনি ভাঙাচোরা অন্তিম উদ্ধার
সমুন্নত জাহাজের—এই পৃথিবীর
এ ছবি অদৃশ্য হবে হয়তো আবার ।
বর দাও নিপতিত স্বদেশ আমায়
ধন্য কর সব শ্রম গাঢ় প্রত্যাশায় ।"

[ অনুবাদ ঃ রমাপ্রসাদ দে ।



## ডিরোজিওকে নিয়ে একটি ছোটগল্প

### নাম

বনফুল

আমাদের পাড়ায় নবাগত যতীনবাবু লোকটিকে এক হিসাবে অভদ্রই বলা চলে। সমাজের সাধারণ আইন-কানুন মেনে কিছুতেই চলবেন না ভদ্রলোক। কোথাও নিমন্ত্রণ করলে যান না, পাড়ার কারো খবর নেন না, বাড়িতে কেউ গেলে আপ্যায়িত হবার ভাব দেখান না বরং ভাব-ভঙ্গীতে প্রকাশ করেন যেন একটু বিরক্ত হয়েছেন। তবু আমরা প্রায় প্রত্যহ বৈকালে তাঁর বাড়িতে যাই এ সব সত্ত্বেও এবং নিয়মিতভাবে চা পান করে থাকি। যতীনবাবুর চরিত্রে যতই খুঁত থাক তাঁর বাড়ির চা-টি একেবারে নিখুঁত। সেদিন বিকেলে আমরা যখন গেলাম—আমরা মানে আমি মাধব বাবু আর পুণ্ডরীকাক্ষবাবু—তখন তিনি আর একজন কার সঙ্গে যেন গল্প করছিলেন। ভদ্রলোককে ইতিপূর্বে কোথাও দেখেছি বলে মনে হল না। যতীনবাবুর যা স্বভাব আমাদের দিকে এক নজর চেয়ে দেখলেন মাত্র কিন্তু মুখের ফাঁকে যে একবার 'আসুন' বা 'বসুন' বলা তা একবারও না, গল্পই করে যেতে লাগলেন। তবু আমরা বসলাম।

যতীনবাবু বলছিলেন —"ছেলেবেলা থেকেই ওই রকম। পাণ্ডাগিরি করে বেড়াত ইস্কুলে, আর সেই সময়েই মদ খেতে শেখে বোধ হয়—"

পুণ্ডরীকাক্ষবাবু আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না।

"আমাদের হেমবাবুর ছেলে ফটকের কথা বলছ বুঝি?"

যতীনবাবু এর কোনো জবাব দিলেন না, একটু হেসে সেই লোকটির দিকে চেয়ে বলে যেতে লাগলেন—"তারপর তার বাপ তাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিলে, অবশ্য ঠিক যে কেন ছাড়িয়ে নিলে তা বলা শক্ত, কিন্তু ছাড়িয়ে নিলে, ছাড়িয়ে পাঠিয়ে দিলে বেহারের এক শহরে তাঁর এক আত্মীয়ের কাছে। হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলেছি—ইতিমধ্যে ছোকরা কবিতা লিখতে শুরু করেছিল।"

মাধববাবু পুণ্ডরীকাক্ষবাবুর দিকে চেয়ে ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে বললেন, "আমাদের জগার কথা বলছেন, বুঝছ না—" বার দুই আই-এ ফেল

করে আমাদেব তপোনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র জগদীশ পরের পয়সায় মদ এবং সিনেমার কাগজে প্রেমের পদ্য লিখতে শুরু করেছিল, সম্প্রতি সে ছাপরাও গেছে মামাব বাড়িতে। মাধববাবুর অনুমান খুব অসঙ্গত নয়। যতীনবাবু কিন্তু সমর্থন বা প্রতিবাদ কিছুই করলেন না।

বলে যেতে লাগলেন—

"বেহারে গিয়ে তার কাব্যরোগ হু হু করে বেড়ে গেল। বেহাবে তার বাপ তাকে পাঠিয়েছিল আত্মীয়ের কাছে থেকে সেই আত্মীয়েরই কারবারে ওয়াকিবহাল হবার জন্যে। ছোকবা কারবারের ধার দিয়েও গেল না, লম্বা লম্বা কবিতা লিখে মাসিকে আব সাপ্তাহিকে পাঠাতে লাগল আর বাকি সময়টা ঘরের কোণে বসে কাটাতে লাগল যত সব বাজে বই পড়ে—"

অপরিচিত ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন--"বাজে বই মানে, কি বই—"

"দর্শন, কাব্য, সাহিত্য—এই সব আর কি, অর্থাৎ ইনডিগো সম্বন্ধে কোনো বই নয়—"

"ইনডিগো সম্বন্ধে বই মানে—"

"অর্থাৎ যে বই পড়লে ব্যবসার উপকাব হত। সেই আত্মীয় ভদ্রলোকের নীলের কারবার ছিল—"

"তারপর?"

"তারপর আর কি, উত্যক্ত হয়ে উঠলেন আত্মীয়টি ক্রমশ—"

চা এসে পড়ল। পুণ্ডরীকাক্ষ আপিঙের কৌটা বার করলেন। ইনডিগো শুনেই আমরা বুঝেছিলাম এ জগো নয় আর কেউ। মাধব ভাবছিলেন কে হতে পারে।

যতীন বাবু বললেন—"তারপর হল এক কাণ্ড। কোলকাতার এক সম্পাদক ডেকে পাঠালে ছোকরাকে, বললে তোমার প্রতিভায় আমি মুগ্ধ, তুমি আমার কাগজের সহকারী সম্পাদক হও আর তোমার কবিতাগুলো ছাপিয়ে ফেল—ছুটল ছোকরা কোলকাতায় আর জুটল গিয়ে সাহিত্যিক মহলে—"

অহিফেনের বটিকাটি গলাধঃকরণ করে পুণ্ডরীকাক্ষ বললেন—"আমাদের ক্ষীরোদচন্দ্র আর কি—" ক্ষীরোদের সঙ্গে এই ছোকরার একটু

মিল ছিল অবশ্য, ক্ষীরোদও একটা কাগজের সহকারী সম্পাদক হয়েছিল কিছুদিন।

যতীনবাবু বলতে লাগলেন—"ছোকরা কিন্তু জমিয়ে ফেললে কোলকাতায়- "

যদিও যতীনবাবু পুণ্ডরীকাক্ষের দিকে ফিরেও চান নি তবু পুণ্ডরী-কাক্ষ বললেন— "তাই না কি ?"

"খুব জমিয়ে ফেললে, সাহিত্যিক মহলে নাম তো হলই, অসাহিত্যিকরাও বলাবলি করতে লাগল তার বিষয়ে, ফলে একটা চাকরি জুটে গেল।"

অপরিচিত ভদ্রলোক বললেন—"কি চাকরি ?"

"ইস্কুল মাষ্টারি—"

"তারপর –"

"দিনকতক খুব নামডাকও হল খুব ভালো মাষ্টার, খুব ভাল মাষ্টার, কিন্তু অতিরিক্ত রকম বাহাদুরি করতে গিয়েই মল ছোকরা—"

"কি রকম—"

ছাত্রদের সঙ্গে খুব বেশিরকম মাখামাখি শুরু করে দিলে, ছাত্ররা হয়ে উঠল তার ইয়ার—"

মাধববাবু চা পানান্তে ময়লা রুমাল দিয়ে ঝোলা গোঁফ-জোড়া মুছছিলেন। তিনি এই কথায় একটু টিপ্পনী করলেন—"আজকালকার ছেলেদের ধরণ ধারণই ওই রকম, –বুঝতে পেরেছি আমাদের আশু মাস্টারের কথা বলছেন আপনি, ওর হিষ্ট্রি জানেন না কি ?

যতীনবাবু একটু হাসলেন মাত্র, কোন জবাব দিলেন না। আমাদের এখানকার স্কুলের নবাগত শিক্ষকটির বদনাম রটেছিল তিনি ছেলেদের সঙ্গে বড্ড বেশি মেশেন না কি।

অপরিচিত ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন—"তারপর—"

"তারপর আর কি, চাকরিটি গেল। নানারকম বদনাম রটতে লাগল, গার্জেনরা ভয় পেলেন ছেলেদের মতিগতি বিগড়ে যাবে, কমিটি তাড়িয়ে দিলে, মানে দিতে বাধ্য হল।"

"ছেলেদের মতিগতি বিগড়ে যাবে! কেন ?"

"ও ছেলেদের সঙ্গে মদ খেত, বলত ধর্মটর্ম সেকেলে বন মানুষের কাণ্ডকারখানা এ যুগে ওসব অচল। বলত কুসংস্কার তুলে দাও— ফেঞ্চ রেভলিউশনের গল্প করত, বেন্থাম মিল আওড়াত—"

"তারপর—"

"এদেশে আর কত 'তারপর' থাকবে, দিন কতক ভ্যারেণ্ডা ভেজে ভেজে ঘুরে বেড়ালে, বুড়োদের উপদেশ আর গালাগালি শুনলে, তারপর পট করে একদিন মরে গেল—"

"মরে গেল! কেন, কি হল -"

"কলেরা।"

মাধববাবু বললে—"বুঝেছি, নিপুব ভাগ্নেব কথা বলছেন, সেও কোলকাতায় মাষ্টারি করছিল, একটু বকাটে গোছেরই ছিল, বছরখানেক হল মারা গেছে। নিপুর ভাগ্নের কথাই বলছেন, নয়?"

পুণ্ডরীকাক্ষ প্রতিবাদ করলে—"নিপুর ভাগ্নে মদ খেত না। মদ খেত আমাদের ছিরে, মাষ্টারিও করত, কিন্তু সে মারা গেছে টাইফয়েডে, আপনি বোধ হয় ভুল খবর শুনেছেন যতীনবাবু--"

যতীনবাবু আবার একটু হাসলেন, জবাব দিলেন না। এমন অভদ্র কদাচিৎ চোখে পড়ে!

অপরিচিত লোকটির দিকে চেয়ে যতীনবাবু বললেন, "শ্রদ্ধা হয় লোকটার উপর?"

অপরিচিত ভদ্রলোক বললেন—"এই আপনার গ্রেট ম্যানের গল্প?"

"নামটা চেপে রেখেছি বলে মনে হচ্ছে না, নামটা আগে বললে প্রতি পদে গ্রেটনেস দেখতে পেতে! I hate you, I hate you all."

"নামটা কি শুনিই না।"

"হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও।"

## ডিরোজিওর বাড়ি

"বর্তমান ১৫৫ লোয়ার সার্কুলার রোডে যে বাড়ি আছে সেই বাড়ি নয়, সেই বাড়িব জায়গায় ডিরোজিওর বাসভবন ছিল। তখন ঐ বাড়ির কি নম্বর ছিল জানি না। ১৮২৫ সালের মেজব জে. এ. সকের (Schalch) 'কলকাতা ও উপকণ্ঠেব নক্সা' নামে ম্যাপে পরিষ্কার দেখানো আছে 'মিঃ ডিরোজিও-র বাড়ি' বলে। এ বাড়ির মালিক ছিলেন কবি ডিরোজিওর র পিতা ফ্রান্সিস ডিবোজিও। ডিবোজিওর এই বাড়ি ছেড়ে দেবার পর এই বাড়ির মালিক হন মিঃ অ্যানড ডিক্রুজ—ভারত গভর্নমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের রেজিষ্টার এবং তাঁর পুত্র। পুত্রের নামও অ্যানড ডিক্রুজ। তিনি বাংলাদেশে ফ্রি-মেসনদের ইতিহাস রচনা করেন। পিতাপুত্রে এই বাড়িতে বহু বছব বাস কবেছিলেন।

তারপর সেই বাড়ি কিনে নেন মেজর রাজচন্দ্র নামে একজন বাঙালি। তিনি ছিলেন কলকাতার একজন বিখ্যাত শল্য-চিকিৎসক। তিনি তদানীন্তন ইংলণ্ডের লর্ড হ্যাল্‌সবেরির বৈমাত্রেয় ভগিনী কুমারী গিফার্ডকে বিবাহ করেন। মেজর রাজচন্দ্র চন্দ্র কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপনার কালে সস্ত্রীক এই বাড়িতে থাকতেন। তখন এই বাড়ির নম্বর ছিল ৯৩ লোয়ার সার্কুলার রোড।

তারপর এই বাড়ি ভাড়া নেয় পি. ডবলুই. ফ্লিউরি কোম্পানি নামে এক এনজিনিয়ারিং ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান। এদের 'পরীর ফোয়ারা' এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক প্রদর্শনী এই বাড়ির মাঠে প্রায়ই হতো ১৮৮৪ সাল নাগাদ। ১৯০৪ সালে এই বাড়ির নম্বর হয় ১৫৫। ঐ সময় কলকাতার ছোট আদালতের জজ মিঃ এহাসান এই বাড়িতে বাস করতেন।

পার্সিবাগানের বাড়ি ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকায় পাথুরেঘাটার কালীকৃষ্ণ ঠাকুরকে বিক্রি ক'রে দিয়ে ১৩-৭-১৮৯৪ থেকে নগেন্দ্রনাথ বসু-মল্লিক সপরিবারে ৩৫ ওয়েলিংটন স্ট্রিটের বাড়িতে বাস করতে লাগলেন। ১২/১৩ বছর সেই বাড়িতে বাস ক'রে ১৯০৭ সালে ১৫৫ লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়িটি কিনে নিয়ে সেটা ভেঙে ফেলে তার জায়গায় মার্টিন কোম্পানিকে দিয়ে প্রায় ২ লক্ষ টাকা খরচ ক'রে একটি বড় বাগান-সমেত অট্টালিকা তৈরী করিয়ে সেখানে গিয়ে বাস করেন। অট্টালিকার

নাম দেন 'মিনার'। সেই অট্টালিকা এখন পর্যন্ত রয়েছে। এই বাড়ি থেকেই তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মনোজেন্দ্রের অনেক টাকা খরচ ক'রে খুব ঘটা ক'রে বিয়ে দেন। ১৯১৭ সালে ঋণের দায়ে ঐ বাড়ি ছেড়ে ৯১ ইলিয়ট রোডের একটি বাড়িতে বাস করতে আরম্ভ করেন। নতুন বাড়িতে প্রায় ৩ মাস রোগে ভুগে ২৩-২ ১৯১৭ তারিখে ইনি জোর ক'রে তাঁকে গঙ্গার তীরে নিয়ে যেতে বলেন। আহিরিটোলার ঘাটে গঙ্গার জলে পা ডুবিয়ে তিনি তিনদিন হরিনাম শুনে ২৬-২-১৯১৭ তারিখে মারা যান।

১৯১৬ সালের শেষে কি ১৯১৭ সালের গোড়ায় বাগবাজারের গোকুল মিত্রের প্রপৌত্র বিহারীলাল মিত্র নগেন বসুমল্লিকের ১৫৫ লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়ি নিলামে কিনে নেন। তিনি ৭-২-১৯৩৩ তারিখে ৭৩ বছর বয়সে এই বাড়িতেই মারা যান। মৃত্যুর একবছর বা দু'বছর আগে তিনি উইল ক'রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির আয় থেকে বছরে ৪৮ হাজার টাকা বা মাসে ৪ হাজার টাকা বাঙালি মেয়েদের শিক্ষার জন্য দিয়ে যান। আর তাঁর সমস্ত সম্পত্তির দেখাশোনার ভার অ্যাডমিনিস্ট্রেটার-জেনারেলের হাতে দিয়ে যান। চাঁদনী বাজারের প্রায় সবটাই তাঁর সম্পত্তি ছিল। তাঁর কোন পুত্র ছিল না, একটি মাত্র কন্যা ছিল। তাই তিনি নিজের ভাইপোকে দত্তক নেন। এই দত্তক পুত্রের নাম অনিরুদ্ধ মিত্র। তিনি ১৯৫৭ সালের মে মাসে ৫৩ বছর বয়সে এই বাড়িতেই মারা গেছেন। তাঁর পুত্রকন্যা কিছুই ছিল না। তাই তিনি দর্জিপাড়ার রাজকৃষ্ণ মিত্রের বংশের অরবিন্দ মিত্রকে দত্তক নেন। অরবিন্দ মিত্রের বয়স এখন ৫০-এর কাছাকাছি। তিনি শ্যামবাজার স্ট্রীটের পল্টু করের পরিবারে বিয়ে করেছেন। তাঁর দুই পুত্র ও দুই কন্যা। তাঁর শ্যামবাজারে নিজের ব্যবসা আছে। তিনি ১৫৫ লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়িতে বাস করছেন।"

[ শারদীয় 'এক্ষণ' ১৩৮৭-তে প্রকাশিত রাধারমণ মিত্রের 'কলকাতার বাড়ি, বাগান, বাগান বাড়ি' থেকে উদ্ধৃত ]

## ডিরোজিওর ঐতিহাসিক চিঠি

*26th April, 1831.*

H. H. WILSON, ESQ.,

My dear Sir,--Your letter, which I received last evening, should have been answered earlier but for the interference of other matters which required my attention. I beg your acceptance of this apology for the delay, and thank you for the interest which your communication proves that you continue to take in me. I am sorry, however, that the questions you have put to me will impose upon you the disagreeable necessity of reading this long justification of my conduct and opinions. But I must congratulate myself that this opportunity is afforded me of addressing so influential and distinguished an individual as yourself upon matter which if true, might seriously affect my character. My friends need not, however, be under any apprehension for me; for myself the consciousness of right is my safeguard and my consolation.

(I) I have never denied the existence of a God in the hearing of any human being. If it be wrong to speak at all upon such a subject, I am guilty, but I am neither afraid, nor ashamed to confess having stated the doubts of philosophers upon this head, because I have also stated the solution of these doubts. Is it forbidden anywhere to argue upon such a question? If so, it must be equally wrong to adduce an argument upon either side. Or is it consistent with an enlightened notion of truth to wed ourselves to only one view of so important a subject, resolving to close our eyes and ears against all impressions that oppose themselves to it?

How is any opinion to be strengthened but by completely comprehending the objections that are offered to it, and exposing their futility? And what have I done more than

this? Entrusted as I was for some time with the education of youth peculiarly circumstanced, was it for me to have made them pert and ignorant dogmatists, by permitting them to know what could be said upon only one side of grave questions? Setting aside the narrowness of mind which such a course might have evinced it would have been injurious to the mental energies and acquirements of the young men themselves. And (whatever may be said to the contrary), I can vindicate my procedure by quoting no less orthodox authority than Lord Bacon:—"If a man," says this philosopher (and no one ever had a better right to pronounce an opinion upon such matters than Lord Bacon), "will begin with certainties, he shall end in doubt." This, I need scarcely observe, is always the case with contented ignorance when it is roused too late to thought. One doubt suggests another, and universal scepticism is the consequence. I therefore thought it my duty to acquaint several of the College students with the substance of Hume's celebrated dialogue between Cleanthes and Philo, in which the most subtle and refined arguments against Theism are adduced. But I have also furnished them with Dr. Reid's and Dugald Stewart's more acute replies to Humes—replies which to this day continue unrefuted. This is the head and front of my offending. If the religious opinions of the students have become unhinged in consequence of the course I have pursued, the fault is not mine. To produce convictions was not within my power; and if I am to be condemned for the Atheism of some, let me receive credit for the Theism of others. Believe me, my dear Sir, I am too thoroughly imbued with a deep sense of human ignorance, and of the perpetual vicissitudes of opinion, to speak with confidence even of the most unimportant matters. Doubt and uncertainty besiege us too closely to admit the boldness of dogmatism to enter an enquiring mind; and far be it from me to say "this is" and "that is not", when after the most extensive acquaintence with the researches of science, and

after the most daring flights of genius, we must confess with sorrow and disappointment that humility becomes the highest wisdom, for the highest wisdom assures man of his ignorance.

(II) Your next question is, "Do you think respect and obedience to parents no part of moral duty ?" For the first time in my life did I learn from your letter that I am charged with inculcating so hideous, so unnatural, so abominable a principle. The authors of such infamous fabrications are too degraded for my contempt. Had my father been alive, he would have repelled the slander by telling my calumniators, that a son who had endeavoured to discharge every filial duty as I have done, could never have entertained such a sentiment ; but my mother can testify how utterly inconsistent it is with my conduct, and upon her testimony I might risk my vindication. However, I will not stop there ; so far from having ever maintained or taught such an opinion, I have always insisted upon respect and obedience to parents. I have indeed condemned that feigned respect which some children evince, as being hypocritical and injurious to the moral character ; but I have always endeavoured to cherish the sentient feelings of the heart, and to direct them into proper channels. Instances, however in which I have insisted upon respect and obedience to parents, are not wanting. I shall quote two important ones for your satisfaction : and as the parties are always at hand, you may at any time substantiate what I say. About two or three months ago Dakhinarunjun Mookherjee ( who has made so great a noise lately ) informed me that his father's treatment of him had become utterly insupportable, and that his only chance of escaping it was by leaving his father's home. Although I was aware of the truth of what he had said, I dissuaded him from taking such a course, telling him that much should be endured from a parent, and that the world would not justify

his conduct if he left his home without being actually turned out of it. He took my advice, though I regret to say only for a short time. A few weeks ago he left his father's house, and to my great surprise engaged another in my neighbourhood. After he had completed his arrangements with his landlord, he informed me for the first time of what he had done, and when I asked him why he had not consulted me before he took such a step :— "because," replied he, "I knew you would have prevented it."

The other instance relates to Mohesh Chunder Sing. Having recently behaved rudely to his father and offended some of his other relatives, he called upon me at my house with his uncle Umacharun Bose and his cousin Nondolal Sing. I reproached him severely for his contumacious behaviour, and told him that, until he sought forgiveness from his father, I would not speak to him. I might mention other cases, but these may suffice.

(III) "Do you think marriages of brothers and sisters innocent and allowable ?" This is your third question. "No," is my distinct reply ; and I never taught such an absurdity. But I am at a loss to find out how such misrepresentations as those to which I have been exposed have become current. No person who has ever heard me speak upon such subjects could have circulated these untruths ; at least, I can hardly bring myself to think that one of the College students with whom I have been connected could be either such a fool as to mistake everything I ever said, or such a knave, as wilfully to mis-state my opinions. I am rather disposed to believe that weak people who are deter-

mined upon being alarmed, finding nothing to be frightened at, have imputed these follies to me. That I should be called a sceptic and an infidel is not surprising, as these names are always given to persons who think for themselves in religion ; but I assure you, that the imputations which you say are alleged against me, I have learned for the first time from your letter, never having dreamed that sentiments so opposed to my own could have been ascribed to me. I must trust, therefore, to your generosity to give the most unqualified contradiction to these ridiculous stories. I am not a greater monster than most people, though I certainly should not know myself were I to credit all that is said of me. I am aware that for some weeks some busy-bodies have been manufacturing the most absured and groundless stories about me, and even about my family. Some fools went so far as to say my sister, while others said my daughter, ( though I have not one ), was to have been married to a Hindu young man. I traced the report to a person called Brindabone Ghosal, a poor Brahmin, who lives by going from house to house to entertain the inmates with the news of the day, which he invariably invents. However, it is a satisfaction to reflect that scandal, though often noisy, is not everlasting.

Now that I have replied to your questions, allow me to ask you, my dear Sir, whether the ex ediency of yielding to popular clamour can be offered in justification of the measures adopted by the Native Managers of the College towards me ? Their proceedings certainly do not record any condemnation of me, but does it not look very like

condemnation of a man's conduct and character to dismiss him from office when popular clamour is against him? Vague reports and unfounded rumours went abroad concerning me: the Native Managers confirm them by acting towards me as they have done. Excuse my saying it, but I believe there was determination on their part to get rid of me, not to satisfy popular clamour, but their own bigotry. Had my religion and morals been investigated by them, they could have had no grounds to proceed against me. They therefore thought it most expedient to make no enquiry, but with anger and precipitation to remove me from the institution. The slovenly manner in which they have done so, is a sufficient indication of the spirit by which they were moved; for in their rage they have forgotten what was due even to common decency. Every person who has heard of the way in which they have acted is indignant; but to complain of their injustice would be paying them a greater compliment than they deserve.

In concluding this letter allow me to apologise for its inordinate length, and to repeat my thanks for all that you have done for me in the unpleasant affair by which it has been occasioned.

I remain, etc.,
H. L. V. DEROZIO.

## ইউরেশিয় আন্দোলন ও ডিরোজিও

অধিকারবঞ্চিত ইউরেশিয়দের আন্দোলনে অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন ডিরোজিও। ৯ মার্চ ১৮৩১ টাউন হলে সমবেত ইউরেশিয়দের মধ্যে তিনি যে ভাষণ দেন, এখানে তার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হল। এডোয়ার্ডস্ সংকলিত এই ভাষণে আমরা ডিরোজিওর কণ্ঠস্বর শুনতে পাই।

...Why are we assembled here this day? Are we to confine ourselves to a particular routine and exclude all matters which do not come exactly within it?...

It is not required of the committee to prepare a petition this moment, nor is it supposed that any individual present has such a document ready in his pocket which he has only to lay upon the table for instant signature. Such speed is not contemplated by us. We only call upon our friends to request the committee to draft another petition, and, that no haste may do mischief, to take care that it shall be fully approved of before it is signed and despatched. Suppose this resolution is adopted, and that it afterwards becomes unnecessary, what harm will be done? We shall only have to change our minds—a matter of no inconvenience. Were there no other consideration, the fact that one House of Commons rarely takes cognizance of petitions addressed to its predecessor, should be alone sufficient to convince us of the imperative necessity of appealing to the Legislature of Great Britain again. What have we hitherto done? What have we yet obtained? Where are our spoils? Have our rights been restored? Have our claims been conceded? No, sir, we have but just taken the field, and now, shall we rest upon our arms? The spirit of exclusion has only been startled upon his throne; but there sits the demon still mocking our efforts, and grinning over his triumphs. Our hearts must not faint, our nerves must not slacken. Let us not trust our cause to men who have nothing for us but empty profession. Our friend Mr. Ricketts has told us, that Lord Ashley sympathises with us, and that Sir

Alexander Johnston is deeply interested for us. But their sympathy and their interest, however likely to call forth our gratitude, should never claim our confidence. Do you suppose, that any Member of the Legislature, touched by so much tenderness, will address either House of Parliament in some such way as this ? Gentlemen, here am I overflowing with the milk of human kindness, anxious to restore to that long-neglected and unjustly treated race, the East Indians, those rights *which they do not demand*. No, sir, such will never be the language of legislators ; the benevolence of statesmen seldom incommodes them to such an alarming degree. But the very facts which Mr. Ricketts' report communicates to us should lead us to distrust noble Lords and honourable gentlemen. What are those facts ? Lord Ashley felt for us ! We thank his Lordship. He promised to present our petition. This was generous. But when the time came for his Lordship's hand to follow up the benevolent suggestions of his heart, that hand became suddenly paralyzed. Weighty matters of State pressed upon his heart, and the petition was left to make its own way into the House of Commons. I am apprehensive, (though I only suggest the possibility of the thing) that matters of State may be as burdensome to our other sympathising friends in Parliament, and that such paralytic attacks as, we see, do sometimes afflict Lord Ashley, may be common to others who are deeply interested in our welfare. To protect ourselves against such mischances, it would not perhaps be the most unwise course to petition the Legislature. Gentlemen, you have nothing to fear from firm and respectful remonstrance. Your calls for justice must be as incessant as your grievances are heavy. Complain again and again, complain till you are heard. Aye, and until you are answered. The ocean leaves traces of every inroad it makes upon the shore ; but it must repeat those inroads with unabated strength, and follow *them up with rapidity, before it washes away the strand.*"

## ডিরোজিওর একটি কবিতা

ডিরোজিও সম্পর্কে The Oriental Magazine ( 1843 )-এ লেখা হয়েছিল :

"One phase of his character is remarkable. He never loved a woman. His feelings were cold in this respect. To him who is not a superficial reader of his poems, the characteristic of Nuleenee love, the heroine of his poem, *The Fakeer of Jungheerah* will appear to possess neither the warmth, nor the confidence, nor the tenderness of woman's love. He was often asked by his sister, to whom he was most affectionately attached to give her a sister-in-law. One morning she found under her plate, on the breakfast table, a few stanzas, entitled 'A sister-in-law for thee.' "

কবিতাটি অনুবাদ করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। "তীর্থরেণু" থেকে সত্যেন্দ্রনাথের সেই অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত হল :—

### বৌ-দিদি

বৌ-দিদি চাস্ ? বোন্‌টি আমার,
বৌ-দিদি তোর চাই ?
তারার হাটে খুঁজবো এবার
দেখবো যদি পাই !
তুই যে মোদের পুণ্যপ্রভা,—
ঠাকুর ঘরের দীপ ;
তোর মতোটিই আন্‌তে হ'বে
পুণ্য হোমের টিপ্।

স্বপ্ন-দেবীর পাখা দু-খান্
ধার ক'রে-না-নিয়ে,
ঝড়ের রাতে বেরিয়ে যাব
কারেও না জানিয়ে ;
ধর্‌ব গিয়ে ঝড়ের বেগে
রামধনুকের ডোর,
রামধনুকের একটি রেখা
বৌ-দি' হ'বে তোর !

ডুবব সোজা সাগর জলে
সূর্যালোকের মত,
প্রবাল-গুহায় অপ্সরীরা
নাইতে যেথায় রত,
পরীরাণীর মুকুটখানি
আন্‌ব সাথে মোর ;
সেই মুকুটের মধ্য-মণি
বৌদি' হবে তোর !

পক্ষীরাজের পিঠেতে সাজ
মুখে লাগাম দিয়ে,
জাদু জানা পাগল-পানা
কল্পনাকে নিয়ে,
সটান্ গিয়ে কল্প-লোকের
আন্‌ব সে মন্দার,
বৌদি' তোমার সেই তো হ'বে ;
বোন্‌টি গো আমার ।

## ডিরোজিও স্মরণ সংবাদ

### Monument to Mr. Derozio

"At a meeting held on Thursday evening, the 5th January, 1832, at the Parental Academy (now Doveton College), to cosider the propriety of erecting a monument to the memory of the late Mr. H. L. V. Derozio, J. W. Ricketts, Esq., in the chair, the following resolutions were unanimously passed :

1st.—Moved by Mr. W. Kirkpatrick, and seconded by Mr. M. Crowe—

That this meeting is desirous of recording its sense of the loss which our community has recently sustained by the death of Mr. H. L. V. Derozio, whose short but brilliant career of public usefulness has left a chasm in our ranks not easily to be filled up.

2nd. –Moved by Baboo Mohesh Chunder Ghosh, and seconded by Mr. Wale Byrn

That a stone monument, bearing an appropriate inscription, be erected by public subscription to the late Mr. Derozio, as a testimony of our esteem for the memory of one whose loss we have so much reason to deplore.

3rd.—Moved by Mr. J. A. Lorimer, and seconded by Baboo Krishna Mohun Banerjea.

That a committee consisting of the following gentlemen : —Messrs Wale Byrn, A. DeSouza, W. R. Fenwick, D. Hare, D. M. King, W. Kirkpatrick, J. W. Ricketts, J. Welsh, and Baboos Duckinarunjun Mookerjea, and Krishna Mohun Banerjee, be appointed to carry the foregoing resolutions into effect ; and that Mr. W. R. Fenwick be requested to officiate as Secretary to the committee.

4th.—Moved by Mr. L. Frazer, and seconded by Mr. J. A. Lorimer—

That any surplus that may be left from the subscriptions raised on account of the monument, be tendered to the family of the late Mr. Derozio.

Subscription books were handed round, and donations to the amount of Rs. 900 were entered.

On a letter being read by Mr. Byrn from Mr. Stapleton, offering to Publish a lithographic miniature of Mr. Derozio without any remuneration for his labours—

5th.—Moved by Baboo Krishna Mohun Banerjee, and seconded by Mr. R. Dias -

That Mr. Stapleton's proposals be accepted, and a miniature of Mr. Derozio be published with the consent of his family ; and that the thanks of the meeting be presented to Mr. Stapleton for his disinterested offer. Votes of thanks for the use of the Hall and to the chair closed the meeting."

India Gazette,

January 7th, 1832

"গত ৫ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে মৃত ড্রজু সাহেবের স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপনকরণ বিষয়ে পারেন্তাল আকাদেমিতে অনেকের সমাগম হয়। তাহাতে শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষ এই প্রস্তাব করিলেন যে, সরকারী চাঁদার দ্বারা যে মৃত ড্রজু সাহেবের বিষয়ে আমরা সকলেই এইক্ষণে খেদার্ণবে মগ্ন তাহার চিরস্মরণার্থ চিহ্নস্বরূপ এক প্রস্তরময় কবর নির্মাণ করা যায় এবং তদুপরি তদ্‌প্রযুক্ত কথা-প্রবন্ধ ক্ষোদিত থাকে, তাহাতে শ্রীযুত উঐল বর্ণ সাহেব পৌষ্টিকতা করিলেন এবং আরও সকলে সম্মত হইলেন। তৎপর এই প্রস্তাব হইল যে, কবরের খরচ করিয়া যদি চাঁদার টাকা কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তবে তাহা ড্রজু সাহেবের পরিজনেরদিগকে প্রদানার্থ প্রস্তাব করা যায়। তদনন্তর চাঁদা বহী সকলকে দর্শান গেল এবং সেই স্থানেই ৯০০ টাকার স্বাক্ষর হইল।"

সমাচার দর্পণ

১১ জানুয়ারী ১৮৩২

"The sum of money collected for a monument over his grave was about 800 rupees This amount was misappropriated, and Derozio's grave is now undistinguished among the crowded tombs of the Park Street Cemetery."

The Oriental Magazine,

Oct, 1843.

"After he was dead it was written of him : 'There disappeared from the great river of this moral life one of the most brilliant morning lights that ever sailed adown its stream.'

Had Derozio only lived to a mature age, there is no saying what an ascendency he might not have exercised over the life and thought of India."

The Statesman

February 10, 1906

"We have received a copy of the lecture delivered at the YMCA Hall, Chowringhee, on the 10th December 1904, by Mr. E. W. Madge of the Imperial Library, on "Henry Derozio , the Eurasian Poet and Reformer." The lecture has been reprinted in a Pamphlet form by Professor Hari Nath De. It gives a short life history of the celebrated poet whose memory Bengal cherishes with fond affection and unfeigned regard."

The Hindu Patriot

13th February, 1906

"To the present generation the name of Derozio, the Eurasian Poet, philosopher and teacher, is but a faint echo of a fast receding and well nigh forgotten past, but no name stands higher in the history of the Introduction of English Education into Bengal."

The Bengali

6th May, 1906

## বঙ্গজননীর এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সাধক
## কবি ডিরোজিও স্মৃতিসভা

"গতকল্য ওয়াই, এম, সি, এ,-তে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কবি ডিরোজিওর একটি স্মৃতিসভা হয়। কর্ণেল সিডনী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক বি. বি. রায় কবির জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বক্তা বলেন, ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং ভারতবাসীদের সম্পর্কের যে ঘনিষ্ঠতা দেখা যাইতেছে, কবি ডিরোজিও ইহার পূর্বাভাস দিয়া গিয়াছেন। কর্ণেল সিডনী বলেন, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের প্রতি কবি ডিরোজিওর বাণী হইল ইহাই—"ভারতবাসীদের সহিত ঐক্যবদ্ধ হও।"

আনন্দবাজার পত্রিকা

১৪ আগষ্ট ১৯২৬

"যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালযের অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র মৈত্রের উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় গতকাল সকালে পার্কষ্ট্রীট সমাধিস্থলে প্রখ্যাত কবি ও শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর জন্মবার্ষিকী প্রতিপালিত হয়। ডক্টর মৈত্র ডিরোজিওর জন্মবার্ষিকী পালনের আবশ্যকতা বর্ণনা করে বলেন, ডিরোজিও বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনের অগ্রদূত এবং যৌবনের দীক্ষাগুরু। তাঁর আরব্ধ কাজ আজও অসমাপ্ত পড়ে রয়েছে। অধ্যাপক ডঃ জীবনকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ডঃ বিশ্বজীবন মজুমদার, অধ্যাপক নিখিলচন্দ্র সরকার, শিক্ষিকা সুপ্রিয়া মৈত্র, অধ্যাপিকা প্রতিমা মজুমদার ডিরোজিওর কবিতা পাঠ করেন। সভায় বহু ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা ডিরোজিওর সমাধিস্থলে সরকারের তরফ থেকে মাল্যদান করেন। এই সমাধিস্থলের রক্ষকের মতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে এই স্মরণ অনুষ্ঠান উদযাপিত হল।"

বসুমতী

১৯ এপ্রিল ১৯৭৬

### De-Rozario's eyard to be renovated

"......Mr. Jatin Chakraborty, the PWD Minister, said that the renovated graveyard with three new plaques would

be inaugurated on April 18 this year, on his birthday, when Dr. Ramesh Chandra Mazunder, Dr. Nihar Ranjan Roy and other historians would be present."

Amrita Bazar Patrika
18 March, 1978



ডিরোজিওর সমাধি

"ডিরোজিও ছিলেন মহান বাঙালী, মহান ভারতীয়। তিনি ছিলেন মহান কবি, যুক্তিবাদী দার্শনিক ও জন্মবিপ্লবী। তাঁর কাছে শুধু বাঙালী নয়, সারা ভারত ঋণী। কিন্তু খুবই দুঃখের কথা যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর এই কালান্তরের পথিক ডিরোজিওর স্মৃতি ও কর্মজীবন নিয়ে সরকারী তরফে এতদিন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। আমাদের সরকার সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করে এই প্রথম তাঁর সমাধিভূমি সংস্কার ও তাঁর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করেছে। এ জন্য আমরা নিজেরাই ধন্য হয়েছি।

১৮ই এপ্রিল, ১৯৭৮ কলকাতার দক্ষিণ পার্ক স্ট্রীটের সমাধিক্ষেত্রে এক বৃষ্টিভেজা বিকেলে ডিরোজিওর ১৭০তম জন্ম দিবসের অনুষ্ঠানে রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী উপরোক্ত মন্তব্য করেন। ……প্রধান অতিথি ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ করা হয়। তিনি ডিরোজিওর জন্ম তারিখ সম্পর্কে সঠিক ঐতিহাসিক তথ্য দেন এবং হিন্দুকলেজে তাঁর অধ্যাপনার সময়সীমাও নির্ধারণ করেন। এই দুটি বিষয়েই কিছু তথ্যগত ভুল চলে আসছিল।…

শ্রী উইনসন ডিরোজা বলেন, সত্যকার বাঙালী ও ভারতীয় ছিলেন বলেই ডিরোজিও অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। মানুষকে মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধা করতে তিনি শিখিয়ে গিয়েছেন।

বর্তমান রাজ্য সরকার যে ডিরোজিওর স্মৃতি রক্ষায় আগ্রহী হয়েছেন সেই উদ্যোগকে অভিনন্দন জানিয়ে সভাপতি অধ্যাপক ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন, ডিরোজিওকে ভুলে যাওয়া বা উপেক্ষা করা জাতীয় জীবনে আত্মহত্যার সামিল। তিনি প্রথম আমাদের যুব সমাজের চোখে নতুন উষার স্বর্ণদ্বার খুলে দিয়েছিলেন। তাঁর ভাবনার উত্তরসূরী হয়েই আজ আমরা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছি। এই যুক্তিবাদী দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদী কবি আমাদের জড়-জীবনকে নতুন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করতে প্রাণপাত করেছেন।…… বাঙালী জাতির দুর্ভাগ্য যে, তাঁর মতো মানুষকে তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ডিরোজিও সম্ভবত প্রথম ব্যক্তি যিনি স্বাধীনতা কী বস্তু তা বাঙালী জাতিকে শিখিয়ে গিয়েছেন।"

পশ্চিমবঙ্গ
২৮ এপ্রিল ১৯৭৮

## Derozio Remembered

"Derozio Smriti Vidyalaya organized a meeting at Sampa Mirza Nagar, 24-Parganas, on Monday in memory of the 19th century social reformer. Mr. Jatin Chakraborty, Minister for Public Works Department, was present."

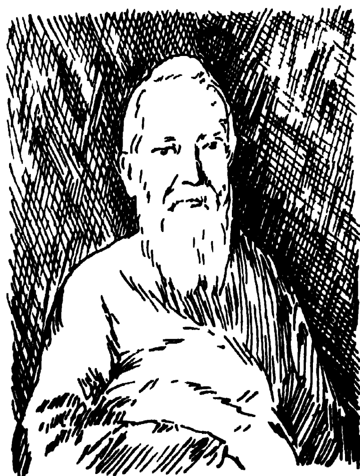
The Statesman
25 November, 1980



[illegible]



[illegible]



রামতনু লাহিড়ী
( ১৮১৩ ১৮৯৮ )



রামগোপাল ঘোষ
( ১৮১৫-১৮৬৮ )



ডিরোজিওর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন
প্রবীণ গবেষক রাধারমণ মিত্র



ডিরোজিওর একটি কাব্যগ্রন্থের উদ্বোধন করছেন
ডিরোজিও স্মরণ সমিতির মকর সর্বাধিকারী

ডিরোজিও স্মৃতি বিদ্যালয়ে ডিরোজিও প্রদর্শনীর উদ্বোধন করছেন পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী।
পাশে অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দে।

"ডিরোজিও ছিলেন বিপ্লবী কবি। তিনি পুরাতন সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। চেয়েছিলেন অচলায়তনকে দূর করতে। এই শপথ নিয়েই একদিন ডিরোজিও তাঁর জীবনকে পরিচালিত করে-ছিলেন। রাজ্যের পূর্ত ও গৃহ দপ্তরের মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী গত বৃহস্পতি-বার বজবজ রোডে অবস্থিত সরকারী আবাসন শম্পা মির্জা নগরে ডিরোজিও স্মৃতি বিদ্যালয় এবং সমাজ-কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে ঐ কথা বলেন।...

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দে। বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের সম্পাদক নির্মল চ্যাটার্জি, বিদ্যালয়ের সভাপতি গোপেশ্বর ব্যানার্জী এবং আবাসিক সমিতির সভাপতি অরবিন্দ বসু।"

সত্যযুগ
২২শে জানুয়ারী ১৯৮১

"গত ২৬শে ডিসেম্বর শনিবার ১৫৫ নং জগদীশ বসু রোডে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর ১৫০তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে একটি স্মারক প্রস্তর ফলকের আবরণ উন্মোচন করে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য ডিরোজিওর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন। ডঃ ভট্টাচার্য বলেন, ডিরোজিও ছিলেন উনিশ শতকের মহত্তম শিক্ষক, যুক্তিবাদের পথিকৃৎ, দেশপ্রেমের আদি কবি, ক্রীতদাসত্ব-বিরোধী নির্ভীক যোদ্ধা, সতীদাহ প্রথা বিরোধী প্রবল কবিকণ্ঠ, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপোষহীন নেতা।...

সভায় একটি বিবৃতি প্রচার করা হয়। হিন্দুকলেজে অর্থাৎ বর্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজে ডিরোজিওর একটি মর্যাদাপূর্ণ স্মরণসভা, তার উপর সেমিনারের আয়োজন করা, তাঁর সমগ্র রচনাকে প্রকাশ করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা, মৌলালিস্থিত নবগঠিত যুবকেন্দ্রটিকে 'ডিরোজিও ভবন' নামে আখ্যাত করা ইত্যাদি বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করার জন্য বিবৃতিটিতে বলা হয়। এ ছাড়া সারা দেশে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে, সংস্কৃতিকেন্দ্রে ডিরোজিওর অসাধারণ জীবন ও কর্ম

সম্পর্কে আলোচনা সভা আহ্বান করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আহ্বান করার কথাও ঐ বিবৃতিতে বলা হয়।

এই সভায় প্রখ্যাত গবেষক রাধারমণ মিত্র বলেন, মূঢ়তা যাকে স্পর্শ করতে পারেনি, মিথ্যাচার যাকে বিচ্যুত করতে পারে নি, অত্যাচার অপবাদ কর্তব্যভ্রষ্ট করতে পারে নি—সেই অসাধারণ মানবদরদী অনন্য শিক্ষক, যুক্তিবাদের পথিকৃৎ, দেশপ্রেমের উদ্গাতা কবি ছিলেন হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও।...শ্রীমিত্র পৌরসংস্থাকে ধন্যবাদ দেন ডিরোজিও স্মারক প্রস্তর ফলকটি দেয়ার জন্য। স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন পৌরসংস্থার কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি শ্রীবারীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মহাউপাধ্যক্ষ শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সরকার।"

কলকাতা পুরশ্রী
ডিসেম্বর ২৬, ১৯৮১।

৫ই এপ্রিল ১৯৮২, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে ডিরোজিও ও তাঁর কর্মময় জীবনের উপর একটি আলোচনা-চক্রের উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষ ডঃ রমেশ দাশ। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন প্রথম যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্য। আমন্ত্রিত বক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক সুকুমার মিত্র, অধ্যাপক সুধীরচন্দ্র রায় এবং অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দে। আচার্য সুকুমার সেন আলোচনাচক্রের সাফল্য কামনা করে একটি বাণীতে বলেন, 'আমাদের দেশে আধুনিক আমলে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর পরে নবীনতার প্রথম কবি হলেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। তিনিই প্রথম ভারতীয় কবি যিনি ভারতবর্ষকে মাতৃ সম্বোধন করেছেন এবং তার উপস্থিত দুর্দশার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন।—এ কথা আমাদের ভোলবার নয়।' আচার্য সেন তাঁর অসুস্থতার কারণে উপস্থিত হতে পারেন নি। সভায় To India—my native land অবলম্বনে বাংলায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমলয় রায়। অধ্যাপক অরুণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই দিন ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ এ্যালমনি এ্যাসোসিয়েশন একটি স্মারক পুস্তিকা ডিরোজিও স্মরণ সংখ্যা প্রকাশ করেন। ডিরোজিও সম্পর্কিত গ্রন্থের প্রদর্শনীতে শ্রীগৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত Bengal : Early Nineteenth Century বইটি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ

করে। বইটিতে ক্যালেইডোস্কোপ পত্রিকার ফাইল থেকে কিছু রচনা সংকলিত হয়েছে। পত্রিকাটি ডিরোজিওর সম্পাদিত বলে সম্পাদক দাবী করেছেন। পত্রিকার ফাইল ব্রিটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে।

BRITISH MUSEUM

DEPARTMENT PRINTED BOOKS

CATALOGUE PP. 3800 bf ORDER 84/12118

AUTHOR —

TITLE THE KALEIDOSCOPE (VOLS 1-2)

PLACE & DATE OF ORIGIN AUG 1829 – JULY 1830

INCHES 1 2 | 1 2 3 4 5 CENTIMETRES

British Museum Photographic Service, London

ডিরোজিও স্মরণে

"ডিরোজিওকে স্মরণ করার ব্যাপারে সবচেয়ে সংহত উদ্যোগ নিয়েছেন ডিরোজিও স্মরণ সমিতি। ছাত্র-শিক্ষক-বিদ্বজ্জনকে এই সমিতির উদ্যোক্তারা কাছে টেনেছেন। সমিতির ইস্তাহারে শ্রীরাধারমণ মিত্র, অধ্যাপক সুকুমার সেন, অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্যের নাম দেখলাম। ডিরোজিও স্মরণ সমিতি সংগঠিতভাবে ডিরোজিওকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা দিতে চান। এর জন্য তাঁরা যে সব প্রস্তাব নিয়েছেন, সেগুলির মধ্যে কয়েকটি হল—

(১) ডিরোজিওর স্মৃতিযুক্ত বাড়ির ( ১৫৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড ) সামনে প্রস্তর ফলক লাগিয়ে এই স্থানটিকে চিহ্নিত করা ;

(২) মৌলালির নবগঠিত যুবকেন্দ্রটিকে 'ডিরোজিও ভবন' বলে আখ্যাত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করা ;

(৩) সত্বর যাতে তাঁর নামে কোন রাস্তার নামকরণ হয়, তার জন্য পুরসভাকে অনুরোধ করা ;

(৪) পার্ক স্ট্রীটের সমাধিস্থলের কাছে একটি স্মৃতিতোরণ করার জন্য কলকাতা পুরসভাকে অনুরোধ করা ;

(৬) বিভিন্ন স্থানে ডিরোজিও সম্পর্কে আলোচনা সভার আয়োজন করা ইত্যাদি।

সুখের বিষয় এই প্রস্তাবগুলি এখন কার্যকর হওয়াব পথে। ডিরোজিওর বাড়ির সামনে একটি স্মৃতিফলক ইতিমধ্যে লাগান হয়েছে। কলকাতা পুরসভা পদ্মপুকুর থেকে মৌলালির মোড় পর্যন্ত রাস্তার সঙ্গে ডিরোজিওর নাম যুক্ত করতে রাজি হয়েছেন। পার্ক স্ট্রীটের সমাধিস্থলে কলকাতা পুরসভা ডিরোজিওর নামে একটি স্মৃতিস্তম্ভও নির্মাণ করেছেন।"

তবুও কিছু দুঃখের জায়গা থেকেই যায়। আমাদের স্মরণ-প্রচেষ্টাতেই বা তেমন যত্ন কই? ডিরোজিওর জীবনের যে চলচ্চিত্রায়ণ হয়েছে, তা কতটা ঐতিহাসিক? কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ডিরোজিও সম্পর্কিত আলোচনা সভা বসাতে কতটা আগ্রহী? পার্ক স্ট্রীট গোরস্থানেব বাইরে যে সেনোটাফটি বসান হয়েছে, সেটি কি দৃষ্টিনন্দন? সেনোটাফটির ভাষা ব্যবহারে আর একটু যত্ন কি আশা করা যেত না? ডিরোজিও স্মরণ সমিতি তাঁদের ইস্তাহারে 'ডিরোজিওর ১৫০তম প্রয়াণ'-এর কথা বলেছেন। শব্দ ব্যবহারে আমরা আরও যত্ন আশা করেছিলাম।"

[ ডিরোজিও স্মরণ সমিতির ঠিকানা—১৩/সি, ফর্ডাইস লেন, কলকাতা-১৪ ]।

আজকাল

১০ এপ্রিল ১৯৮২

### নয়ে তারিখ সন

"সম্প্রতি কলকাতা পুরসভার তরফে একটি অভিনব বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। বক্তব্য : ডিরোজিওর বাসভবনে এবং তাঁর সমাধিক্ষেত্রের সামনে স্থাপিত স্মারকস্তম্ভে ও'রা যে প্রস্তর ফলক দুটি বসিয়েছেন তাতে তাঁর জন্মসন খোদাই করা আছে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু সম্প্রতি একজন

গবেষক পুরসভার কাগজেই প্রমাণ করেছেন ১৮০৮ নয়, ডিরোজিও জন্মে ছিলেন ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে। পুর কর্তৃপক্ষ অতএব ফলক দুটি সংশোধন করতে চান। তাঁরা সাধারণের কাছে জানতে চেয়েছেন কোন্‌টি ঠিক? প্রমাণ দিয়ে নাকচ করতে না পারলে তাঁরা অতঃপর পাথরের ওপর ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দই খোদাই করে দেবেন। সংশোধিত তারিখের স্বপক্ষে নতুন প্রমাণ নিয়ে হাজির হয়েছেন দুই ডিরোজিও প্রেমিক রমাপ্রসাদ দে ও মঞ্জুষ দাশগুপ্ত। ডিরোজিওর কুড়িটি কবিতার বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন ওঁরা ('বিংশতি কবিতা')। ১৮০৮-এর বদলে ১৮০৯ এর সন্ধান মিলেছিল চার্চের খাতায়। এঁরা জানাচ্ছেন সন তারিখ লেখা আছে খবরের কাগজের পাতায়ও। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ এপ্রিল ক্যালকাটা গেজেটের একান্ন নম্বর ভাল্যুমের ষষ্টম পৃষ্ঠায় পরিষ্কার লেখা রয়েছে—'অন দি এইটটিনথ ইনসট্যান্ট মিসেস ফ্রানসিস ডিরোজিও, অফ এ সন।' নতুন করে তারিখ খোদাই করতে বোধহয় এর পর আর কোন অসুবিধা রইল না।" [উল্লেখযোগ্য, এখানে ভুলক্রমে মঞ্জুষ দাশগুপ্তের নাম যুক্ত হয়েছে। 'বিংশতি কবিতায়' মঞ্জুষবাবু ডিরোজিওর কিছু কবিতার প্রশংসনীয় অনুবাদ করেছেন, ডিরোজিওর জন্মসনের প্রমাণ সংগ্রহে ওঁর কোন ভূমিকা ছিল না। এ বিষয়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৭।৬।৮৩) একটি চিঠিও প্রকাশিত হয়। – স.]

আনন্দবাজার পত্রিকা
১০ মে, ১৯৮৩

## ডিরোজিও পরিবারের বংশলতিকা*

মাইকেল ডিরোজিও ( ১৭৪২-১৮০৯ )

পত্নী বিজেট ডিরোজিও ( ১৭৫৬-১৮৩২ )

মারিয়া ( মৃত্যু—১৮১৮ )

ব্রিজেট ( মৃত্যু—১৮৪১ )

স্বামী আরথার জনসন

আরথার ডিরোজিও জনসন ( অ্যামেলিয়ার স্বামী )

ফ্রানসিস (১৭৭৯ ১৮৩০?)

প্রথম বিবাহ—১৮০৬, সোফিয়া জনসনের (মৃত্যু—১৮১৫) সঙ্গে।
দ্বিতীয় বিবাহ—১৮১৬, অ্যানা মারিয়া রিভারসের ( ১৭৭৬?-১৮৫১ ) সঙ্গে।

ফ্র্যাংক
কুড়ি বছর বয়সে আত্মহত্যা করেন।

হেনরী লুই ভিভিয়ান
( ১৮০৯-১৮৩১ )

সোফিয়া
১৮২৭ সালে সতেরো বছর বয়সে মৃত্যু।

আমেলিয়া
বিবাহ—২৫ আগস্ট, ১৮৩৩,
মৃত্যু—১২ এপ্রিল, ১৮৩৫,
বাইশ বছর বয়সে।

ক্লডিয়াস গিলবার্ট অ্যাশমোর
মৃত্যু—১৮৩৬, বাইশ বছর বয়সে।

* দেবাশিস বসুর প্রবন্ধ ( ২৬।১২।৮১-র কলকাতা পুরশ্রী ) থেকে গৃহীত।